জেল হত্যা মামলা

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত নাম। তিনি ১৯৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারি বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি, ঢাকা কলেজ হতে এইচ,এস.সি, জগন্নাথ কলেজ হতে বি,এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম,এ এবং এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম কারাবরণ। দেশ ও মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি বহু কারাবরণ করেন। বন্ধুরা তাঁকে 'কারাগারের পাখি' বলে ডাকেন। বাংলাদেশের জীবিত রাজনৈতিকদের মধ্যে তাঁর চাইতে কেউ বেশি কারাবরণ করেননি।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৯ সালে উক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন তিন বার তিনি সে পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন মহানায়ক। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের এক

www.pathagar.com

জেল হত্যা মামলা

www.pathagar.com

জেল হত্যা মামলা

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন

মিজান পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল : ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল ❑ ২১শে বইমেলা ২০০৬

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ফেরদৌস খান

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১২৩৯৫

মূল্য
২৫০ টাকা মাত্র

ISBN
984-8685-77-4

Jail Hatta Mamla Written By : Shah Moyazzem Hossain
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka 1100
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka 1100.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বাধীনতার চার মহান স্থপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান জেলখানার বন্দীদশায় ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত হলে জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়। প্রয়াত সেই নেতৃবৃন্দের পূণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে

এবং

সেই নিষ্ঠুরতম নৃশংসতার সূত্র ধরে দুই যুগ পর সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে নব্য আওয়ামী গোষ্ঠী ক্ষমতার অন্ধ দাপটে হীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করণার্থে কতিপয় নিরাপরাধ রাজনীতিককে কারাগারে নিক্ষেপ করে সরকারী নির্যাতন-নিপীড়নের ইতিহাসে এক নজির বিহীন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করে। সেই তিক্ত স্মৃতি চারনার্থে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

না বললেই নয়

ইতিহাসের নগ্নতম এক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের উম্মত্ত লালসার শিকার হয়ে এবং অসহিষ্ণু ক্ষমতাধরদের প্রতিশোধের কোপানলে পতিত হযে ১৯৯৮ সনের শেষভাগে যখন জেলহত্যা মামলার মত একটি বর্বরোচিত, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহে আর এক ষড়যন্ত্রের বলি রূপে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই তখন উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে এই রচনায় হাত দিই। বিনা কারণে প্রায় চার বৎসর হাজত বাসের পর হাইকোর্ট হতে জামীনে মুক্ত হয়ে এবং পরবর্তীতে মামলার রায়ে সসম্মানে খালাস পেয়ে এটি সমাপ্ত করি। জীবনে জেল-জুলুম কম ভোগ করিনি। কিন্তু জেল হত্যা মামলার মত পৈশাচিক, ঘৃণ্য এবং নিষ্ঠুরতম ঘটনায় যখন একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষকে জড়ানো হয় তখন তার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এত লজ্জা, এত দুঃখ, এত গ্লানি অতীতে আর কোনদিন উপলব্ধি করি নি। তাই এই রচনার কোথাও যদি আবেগ ও মর্মযাতনার আধিক্য ঘটে থাকে তাকে সময়ের বিক্ষুব্ধ চিন্তা-চেতনার বহির্প্রকাশ রূপে গ্রহণ করা বিধেয়। সূক্ষ্ম আইনের মার-প্যাচ বা আইনজীবীগণের সুতীক্ষ্ণ বাক্-বিতণ্ডা সুখপাঠ্য হবে কি না সন্দেহে দুর্বল কলমে একে নিজের মত করে প্রকাশের চেষ্টা করেছি কিছু অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ও বিদগ্ধ মানুষের অনুরোধে।

তাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, যে নেতাদের সাথে প্রায় সারাজীবন রাজনীতি করলেন, কতবার জীবনের ঝুকি নিলেন, যাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করলেন, জেলখানার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় চিহ্নিত ব্যক্তিদের দ্বারা সেই নেতাদের হত্যার পর আপনাদের মত নিরপরাধীদের অভিযুক্ত করা হল। স্বাধীনতার পর দু'বার চীফ হুইপ, বেশ কয়েকবার মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মামলায় অভিযুক্ত হয়ে শেষে নিজের ওকালতিও করলেন, আসামী হিসাবে চার বৎসর হাজতবাসসহ মোট ছয় বৎসর মামলার ভোগান্তি সহ্য করলেন। এই বিষয়টি আপনার চাইতে কারো বেশী জানার কথা নয়। দুনিয়ার মানুষকে সত্য ঘটনা জানাবার দায়িত্ব এড়ালে ঘটনার তথ্য সমূহের বিভ্রান্তি থেকেই যাবে। মানুষ সত্য কথা জানতে পারবে না।

প্রকাশ ভঙ্গীর ব্যত্যয় এবং ত্রুটি নিসন্দেহে আমার অক্ষমতাই বহন করে। বলতে গিয়ে সত্য বলারই চেষ্টা করেছি। জানি, শেষ পর্যন্ত সত্যের মার নেই। নিজের জীবনে বহুবার তা প্রত্যক্ষ করেছি। বিষয়টি সহৃদয়তায় বিবেচনা করলে বাধিত হব।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিগত শতাব্দীর '৭৫ সালের অক্টোবরের শেষ ভাগের কথা। সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি তাদের এয়ারপোর্টটিকে আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে এবং লন্ডনের ফ্লাইট অবতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও কাজ শুরু করার জন্য আপাতত দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়ে আসার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দেন।

সেমতে অক্টোবর মাসের শেষ লগ্নে সিলেটের অধিবাসী তদানীন্তন বাণিজ্য-প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজীকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট যাই। আমি তখন ভূমি-মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী।

১৫ই অগাস্টের পট পরিবর্তনের পর আমাদেরকে যখন সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমাকে একজন প্রতিমন্ত্রীরূপে শপথ নিতে বলে তখন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেও করণীয় কিছুই ছিল না। ইতিপূর্বে আমি দু'-দু'বার এদেশের চীফ হুইপ ছিলাম। পূর্ণমন্ত্রীদের সঙ্গে আমার প্রটোকল নির্ধারিত ছিল। আমার পক্ষে এই পদাবনতি সহজ মনে গ্রহণ করা ছিল দুরূহ। কিন্তু তখনকার বাস্তবতা ভিন্ন। কথা বলা বা প্রতিবাদ করার প্রশ্নই আসে না। চারদিকে থমথমে ভাব বিরাজমান। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সিঁড়িতে তাঁর মরদেহ পড়ে আছে। বঙ্গভবনে সামরিক বাহিনীর লোকজনে ভরপুর। শপথ গ্রহণ করতে হয়। শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভার প্রায় সকলেই শপথ নেয়। অবশ্য আমার মতো কারো পদাবনতি ঘটেনি। পূর্বের পদ বা আরও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়।

এটা অবশ্য সত্য কথা, যেটুকু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করেছি। সকলেই করেছে। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করব না সেটা বাঞ্ছিত নয়। মালেক ভাই, মানে সাবেক স্পীকার আবদুল মালেক উকিলের ভাষায়, রেসপনসিভ কো-অপারেশন দিতে হইব। ওটা বুইঝলা না? কাতলা মাছের লাহান লগে হুতি থাকলে হইব না। নড়ন-চড়ন লাগব।

www.pathagar.com

নোয়াখালীর মানুষ তিনি। নিজস্ব ভাষা ও স্টাইলে মাঝে মাঝেই তিনি এমন সব কথা বলতেন যা গুরুতর পরিস্থিতির মাঝেও হাসির খোরাক যোগাত। পাকিস্তান আমলের একটি রাজনৈতিক ফর্মুলা বয়ান করতে গিয়ে তিনি এ কথাটির অবতারণা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে মহিলাদের আধিক্য পরিলক্ষিত হলে এ ধরনের সরস বক্তব্যে তার উৎসাহের মাত্রা বৃদ্ধি পেত।

আমরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিলাম। নেতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে এটা সব সময় মনের মধ্যে তীব্র যাতনার সৃষ্টি করত। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কিছু বলারও প্রশ্ন আসে না।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট পট পরিবর্তন হয়েছে। সকলেই তা মেনে নিয়েছে। তিন বাহিনীর প্রধান, বিডিআর প্রধান, আইজি-পুলিশ সকলেই নতুন সরকারের প্রতি সেদিন আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অন্য চিন্তার প্রশ্নই আসেনি।

কার্যব্যাপদেশে যখন বঙ্গভবনে যেতে হত তখন সামরিক বাহিনীর লোকজনের সেখানে অবস্থান ও খবরদারি সহজ মানসিকতায় গ্রহণ করতে কষ্ট হত। তাদের সাথে কথা হত না। এড়িয়ে চলতাম। জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল। একদিন বঙ্গভবনের লবীতে তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা। প্রশ্ন করেন, কেমন আছেন স্যার?

আল্লাহ্ যেমন রেখেছেন। কিন্তু এখানে আপনাদের লোকজনের অতিরিক্ত আনাগোনায় অস্বস্তি বোধ করি। সৈন্যদের ব্যারাকে থাকাই কী বাঞ্ছনীয় নয়?

অবশ্যই। সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি! দেখি কী করা যায়।

কিছুক্ষণ পরই শুনতে পাই, সে সময়ে সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি ডেপুটি চীফ অব আর্মী স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর লোকজনদেরকে রাগত স্বরে ধমকাচ্ছেন এবং তারা যদি অবিলম্বে স্ব স্ব দায়িত্বে প্রত্যাবর্তন না করে তা হলে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ভয় দেখাচ্ছেন। শুনতে পাই দু'-একজন সামরিক অফিসার মন্তব্য করে, কিছু কিছু মন্ত্রী আমাদেরকে সহ্য করতে পারছে না। তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছে।

কিছু সামরিক কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ বিরাগভাজনে পরিণত হই। কিছুই করার ছিল না। প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত

www.pathagar.com

তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ১৫ই অগাস্টের সকাল থেকেই রাষ্ট্রপতির সাথে আছে। তার একটি অফিসও হয়েছে বঙ্গভবনে। তার অভিজ্ঞতার কথা জানি না। তার সাথে আমাদের তেমন সখ্যতা ছিল না। ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও আমি সেই ছাত্রজীবন থেকেই একসঙ্গে কাজ করছি। আমাদের সম্পর্ক নিবিড়। এ সময় আমরা প্রায়ই একত্রে চলাফেরা করতাম। সিদ্ধান্ত নিই, সুযোগ পেলেই আমরা একযোগে সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যারাকে প্রত্যাবর্তনের জন্য স্বোচ্চার হব। নেতা নেই, কিন্তু দেশটা আছে। সে দেশে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উর্দীওয়ালাদের দৌরাত্ম আমাদের পছন্দনীয় ছিল না। আমরা একযোগে এই লক্ষ্যে কাজ করার চেষ্টা করে তাদের অধিকতর বিরাগভাজন হই।

এ সময় দুটি কাজ করতে হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কাজের সঙ্গে অসম্পৃক্ত। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁর নিজ বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক মুক্তির ব্যবস্থা করা। টাঙ্গাইলের মন্ত্রী আবদুল মান্নান সাহেবকে মওলানা সাহেব অপছন্দ করতেন কিনা জানি না! মান্নান সাহেব অসুস্থতার অজুহাতে সে কাজে বিরত থাকেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ও মান্নান সাহেবের অনুরোধে আমি গিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি। কাজটিতে দোষের কিছু ছিল বলে কোনদিন ভাবিনি। বরং মওলানা সাহেবের মুক্তির সাথে জড়িত থাকতে পেরে শ্লাঘা বোধ করি।

দ্বিতীয় কাজটি পরবর্তীতে প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এটা বলাই বাহুল্য। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল অতীব মধুর। ১৫ই অগাস্টের ঘটনার পর তিনি অন্যত্র আত্মগোপন করেন। মনসুর ভাইয়ের বিশেষ আস্থাভাজন এক লোক এসে জানায় তিনি আমাদেরকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি আমাদেরকে স্বচ্ছন্দে দেখা করতে বলেন। আরও বলেন, মনসুর ভাই যদি ক্যাবিনেটে যোগ দেন তা হলে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে এলে আমি খুশি হব।

আমরা নিবেদন করেছিলাম, আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী একথা আমরা তাঁকে জানাব। অন্য প্রস্তাব আপনিই দেবেন।

www.pathagar.com

আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। মতিঝিল এলাকার এক স্টাফ-কোয়ার্টারে তাঁকে যেভাবে দেখতে পাই তাতে আমাদের মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। তিনি নেতার জন্য অনেক দুঃখ করেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ?

তিনি বলেন, এই মুহূর্তে অন্য চিন্তা সঠিক হবে না। যে অবস্থায় আছ, সেখানেই অবস্থান কর।

আপনি কি করবেন মনসুর ভাই? রাষ্ট্রপতি হয়ত আপনাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দেবেন!

আমার পক্ষে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাকে তোমরা আমার সরকারি বাসভবনে রেখে আস।

তাই করি। এরপর আমাদের আর কিছু জানা নেই। একদিন পর কাগজে রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ হয়। শুনতে পাই, তিনি রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, সে খবরও আমরা কাগজের মাধ্যমেই অবগত হই। এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতসারে কোথাও কোন আলোচনা উত্থাপিত হয়নি। কোন সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। আমাদের মতামতের প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু যেহেতু আমরা তিন জন একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, আজ এতদিন পর সেই সূত্র ধরে আমাদের বিরুদ্ধে অহেতুক অপপ্রচারের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। তিনি ছিলেন আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন নেতা এবং মুরব্বী। তিনি ডেকে পাঠালে আমরা যাব না এটা কি করে সম্ভব!

আজকের অসহিষ্ণু আওয়ামী বিরূপতা যা-ই চিত্রিত করার প্রয়াস পাক না কেন, আমরা সেদিন কেবলমাত্র তাঁর প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানেই সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করিনি।

তিরাশি দিনের সেই স্বল্পস্থায়ী শাসনের সময়ে যেখানেই কথা বলেছি, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, একথা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করেছি, সামরিক বাহিনীর লোকদের হাতে নেতা নিহত হয়েছেন। তাদের হাতে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। শত মাথা কুটেও নেতাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু দেশটা আছে, সে দেশের মানুষ আছে। এবং নেতার অবর্তমানে সেই মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। কাজেই শত শোকের মাঝেও আমাদেরকে যার যার ক্ষেত্রে কাজ করে

www.pathagar.com

যেতে হবে। এ দেশকে স্বাধীন করার পশ্চাতে কার কতটুকু অবদান রয়েছে তার বিচারে না বসেও নির্দ্বিধায় একথা বলা চলে, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে যে লক্ষ্যে এযাবৎ কাজে করে এসেছি, সে লক্ষ্য অর্জনের পর একজন মানুষের তিরোধানের কারণে সবকিছু জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে না। ব্যক্তির চেয়ে দেশ বড়। ঝড়ে নৌকার প্রধান মাঝি নিহত হয়েছে বলে নৌকাটি উল্টে দিয়ে অন্যসব মাঝিমাল্লাসহ সকল যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দিতে হবে এটা বিবেচনা-প্রসূত হতে পারে না। বরং চেষ্টা করতে হবে যাতে নির্বিঘ্নে তরণীটিকে পারে নিয়ে গিয়ে সকলের নিরাপত্তা বিধান করা যায়।

যাক সে কথা। সিলেটের কথায় ফিরে আসা যাক। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমরা পুণ্যাত্মা হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) সাহেবের মাজারে গমন করি। দু'মন্ত্রীর একত্রে আগমনের ফলে সিলেট শহরে সেদিন সাজ সাজ রব। প্রশাসন খুবই তৎপর। ঢাকা থেকে সফরসঙ্গী হয়েছিল আমার বন্ধু অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন সিলেটের জেলা জজ। ভদ্রলোক পরহেজগার ব্যক্তি। আমাদের মাযার যেয়ারতের বিষয়টি তিনি নিজেই তদারক করেন। আমরা যেয়ারত শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দেখি অজস্র পুলিশ সমস্ত এলাকাটি ঘিরে রেখেছে। কাউকে ভিতরে আসতে দিচ্ছে না। সিকিউরিটির খুবই কড়াকড়ি।

পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে এক অপ্রকৃতিস্থ টাইপের ব্যক্তি আমাদের সন্নিকটে আসতে চাচ্ছে। পুলিশ তাকে ছাড়ছে না। দেখেই প্রতীয়মান হয়, লোকটি অস্বাভাবিক প্রকৃতির। হয়তবা মজযুব ধরনের। শুধু একখণ্ড ছালার চট সে পরিধান করে আছে। মাথার চুলে জট পড়েছে। অযত্নে-অবহেলায় তার শরীরের যে দশা, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে পাগল বলে অনুমান করা ভুল হবে না। সে আমাদের কাছে আসতে চাচ্ছে। পুলিশ তাকে ঠেকিয়ে রাখছে।

আমার কী মনে হল, আদেশ করলাম, ওকে আসতে দিন।

সে এক লাফে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। এসপি, ডিসি এবং আমাদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা তৎপর হয়ে ওঠে। সকলকে নিষেধ করি, ওকে কিছু বলবেন না। শুনি, সে কী বলতে চায়!

লোকটি আমাদের সামনে এসে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, হাত-পা নেড়ে

www.pathagar.com

সিলেটি উচ্চারণে চিৎকার করে বলে ওঠে, খুব মন্ত্রী! যাও, ঢাকা গিয়ে দেখ গদি নাই।

সে এ ধরনেরই কিছু বলেছিল। পাগলের কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। আমরাও সেদিকে বিশেষ মন দেই না। কথাগুলো বলেই সে কখন ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না।

সিলেটের কাজ সম্পন্ন করে পরদিন ঢাকা এসে বিমানবন্দরে নেমেই শুনতে পাই, ঘটি উল্টে গেছে। পাল্টা অভ্যুত্থান হয়েছে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে। তার মা শোভাযাত্রা সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়েছে। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ বঙ্গভবনের কর্তৃত্ব আয়ত্বে নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমেদ কার্যত তাদের হাতে গৃহবন্দি। সেনা-সদরেও পদোন্নত প্রধান সেনাপতি জিয়াউর রহমান তাদের হাতে বন্দি।

বিমানবন্দরে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু মানিকগঞ্জের রেজাউল করিম মন্টু অপেক্ষা করছিল। সে বলে, অবস্থা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোর আর বাসায় গিয়ে কাজ নেই। আমার সঙ্গে চল।

তাকে বলি, এভাবে বিমানবন্দর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া ঠিক হবে না। চল, আগে বাসায় যাই। তারপর সব খোঁজখবর নিয়ে অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বাসায় এলে সালেহা এবং অন্যরা একই কথা বলে, অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত সহকারীগণও একই পরামর্শ দেয়। একসময় মন্টুর সঙ্গে বের হয়ে পড়ি।

রেজাউল করিম মন্টু ছিল মানিকগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। সে ছিল আমার অত্যন্ত ভালো বন্ধু। তার ছোট ভাই রফিকুল করিম বিল্টুও আমার বিশেষ অনুগত কর্মী ছিল। আজ দু'ভাইয়ের একজনও বেঁচে নেই। পরম করুণাময়ের ডাকে অল্প বয়সে তারা পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

সে সময় মন্টু পুরানা পল্টনে একাকী বসবাস করত। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা নরসিংদীতে। মিসেস মন্টু সেখানে কর্মরতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার লগ্নে এই মন্টু আমার সঙ্গেই ভারত থেকে দেশে ফিরে আসে। ঢাকা কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় মন্টু আমাদের ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রমোদ সম্পাদকের মনোনয়ন চেয়েছিল। আমার

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ফ্রন্ট গঠিত এবং সে আমার বিশেষ বন্ধু। তবুও তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। আবৃত্তি, অভিনয়, উপস্থাপনা এবং দেহগত উৎকর্ষতায় মন্টু ছিল অনবদ্য। কিন্তু সে সময় সিদ্দিক বাজারে অবস্থিত কলেজের সন্নিকটে ফ্রন্টের জন্য একটি অস্থায়ী কার্যালয়ের অতীব প্রয়োজন পড়ায় এবং মওদুদ আহমেদের পৈত্রিক বাসা নিকটেই কায়েতটুলিতে অবস্থিত হওয়ায় তার দাবিই অগ্রাধিকার পায়। তার বাসাতে কার্যালয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। মওদুদকেই প্রমোদ সম্পাদকের পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। আমি সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদকের পদ দুটি ব্যতীত ষোলটি পদের চৌদ্দটিতেই আমরা বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করি। আমাদের সুসাহিত্যিক ও সচিব হাসনাত আবদুল হাই সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল।

মন্টু কিন্তু অভিমান করে বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করেনি। আমাদের অভিষেক অনুষ্ঠানে সে তরুণী সেজে যে অভিনয় করেছিল আজও তা স্মরণে ভাসে। মন্টু ছিল সংস্কৃতিমনা রাজনৈতিক সচেতন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি। তার বাসায় গিয়ে দেখি, দ্বিতলে তিন রুমের সুন্দর একটি ফ্ল্যাট নিয়ে সে বসবাস করছে। একটি কমবাইন্ড হ্যান্ড তার ঘরদোর সামলায়। মন্টু তার কাজের লোকটিকে ঢালাও হুকুম করে, এই মজিদ, আমার এই বন্ধু বিরাট মানুষ, মন্ত্রী। ভালো করে সেবাযত্ন কর।

মজিদ বড় বড় চোখ করে বলে, স্যার, আমি কোনদিন মন্ত্রী-মিনিস্টার দেখি নাই।

এখন দেখ। সাহেবকে চা করে দে। পরে আমি বাইরে গিয়ে খাবার নিয়ে আসব।

মন্টু শেরাটন থেকে খাবার আনতে চলে যায়। বঙ্গভবনের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হই। একদিন মন্টুর বাসায় অবস্থান করে মিন্টু রোডে ফিরে আসি। যতটুকু খোঁজখবর পাই তাতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন সংশয় জাগে না। টেলিফোনে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ ভিন্ন সব কর্মকাণ্ড স্থগিত।

নভেম্বরের তিন তারিখ সকালে মিন্টু রোডের বাসায় বসেই চরম দুঃসংবাদ পাই, জেলখানার অভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। শোকে-দুঃখে মূহ্যমান হয়ে পড়ি। প্রাথমিক স্তব্ধতা কেটে যেতেই সিনিয়ার মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে টেলিফোন করি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার একান্ত সুহৃদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। সেই

www.pathagar.com

মুহূর্তে ক্যাবিনেটে তার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি ছিলেন অঘোষিত মুখপাত্র এবং কার্যত তিনি মন্ত্রিসভায় নেতৃত্ব দান করছিলেন। রাষ্ট্রপতি অনেক বিষয়েই তার মতামতের মূল্য দিতেন। ইউসুফ ভাইও ভগ্নকণ্ঠে সেই নিদারুণ সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেন। বলি, ইউসুফ ভাই, আর আমাদের চুপ করে বসে থাকার সুযোগ নেই। একটা কিছু করতেই হবে। আমি এক্ষুণি আপনার বাসায় আসছি। এর প্রতিবাদে কী করা যায় ভাবুন।

টেলিফোন রেখেই সঙ্গে সঙ্গে তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। সামান্য দূরত্বে তিনি বাস করতেন। দেখতে দেখতে অন্যান্য সহকর্মীরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সব মন্ত্রীরা মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই, সেই মুহূর্তেই আমরা একযোগে সকলে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করব। জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পরে আমাদের আর সরকারে থাকার প্রশ্ন আসে না।

ইউসুফ ভাই পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন। আমরা সকলে তাতে স্বাক্ষর করি।

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির নিকট আমাদের এই দরখাস্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সিদ্ধান্ত হয়, আমরা পদত্যাগ-পত্রটি উপ-রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেবের নিকট দিয়ে আসব। তিনি সেটা বঙ্গভবনে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি ছিলেন সরকারের দু'নম্বর ব্যক্তি। এক নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ না থাকায় আমাদের সেই পদত্যাগপত্র দু'নম্বরের কাছে জমা দিয়ে আসি। পরদিনের পত্রপত্রিকায় তার সবিশেষে উল্লেখ আসে।

হযরত শাহ্ জালালের (রহঃ) মাযারে পাগলটি যে কথা বলেছিল তা সত্যে পরিণত হয়। পরে তার অনেক খোঁজ করেছি। জেলা জজ সাহেবের সাহায্যে সে লোকটির হদিস পেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন সংবাদ পাইনি। শুনেছি, একসময় সে উচ্চপদে সমাসীন ছিল। সেনাবাহিনীর মেজর ছিল। পরে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

এ ধরনের মানুষের দেখা সহজে পাওয়া যায় না। ভাগ্যিস সেদিন তার উপর কোন দুর্ব্যবহারের সুযোগ দিইনি। অন্যথায় আরও বিপর্যয় নেমে আসা অসম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে আমার বিয়ের দু'দিন পরে এ ধরনের এক লোকের সাক্ষাৎ মিলেছিল। সর্বদা কালো কাপড় পরিহিত একমাথা চুল নিয়ে তাকে

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে ঢাকা কোর্ট প্রাঙ্গণে দেখা যেত। আমার ঢাকার বন্ধু অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন তাকে খুব খাতির করত। সে বলত, ইনি একজন কাজের পাগল।

তাই দেখা গেল। বৌ-ভাতের পরদিন ফিরানিতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। সঙ্গে শালা-শালীরা রয়েছে। মরণচাঁদের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে মিষ্টি কিনছি। হঠাৎ সেই পাগল কোথা থেকে গাড়ির কাছে এসে উপস্থিত। সালেহাকে এক নজর দেখে হাসিমুখে মন্তব্য করে, দারুণ সোন্দর বউ। ছেলে হবে। বছর ঘুরবে না।

সালেহা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। আমি জোরে হেসে উঠি। তার কথাই ঠিক হয়। আমরা আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী পালন করি আমাদের ছেলে রানাকে কোলে নিয়ে।

আমাদের পদত্যাগ পত্র যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছে। মোশতাক সাহেব নাকি মন্তব্য করেছেন, আমিই যেখানে নেই, সেখানে আমার কাছে পদত্যাগ পাঠিয়ে কি হবে!

সেটা তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তরিত করে দেন। চার তারিখ সন্ধ্যায় সামরিক কর্তাদের নির্দেশে বঙ্গভবনে ক্যাবিনেটের সভা ডাকা হয়। ইউসুফ ভাইকে বলি, পদত্যাগ করার পর আমাদের সভায় যাওয়া কি বিধেয়?

তিনি বলেন, আমাদের পদত্যাগ এখনও গৃহীত হয়নি। তাছাড়া সভায় গিয়ে আমরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাব। ওরা শেখ সাহেবকে হত্যা করল, এখন আবার চার নেতাকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করেছে। কবে আমাদেরকেও সাবাড় করে দেবে। চলেন, জোর প্রতিবাদ করে আসি।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা সে সভাতে যাই। আজ সামরিক কর্মকর্তারা আমাদের উপস্থিতি রেকর্ড করছে। বঙ্গভবনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরাও মরীয়া। ওদের একের পর এক অবিমৃশ্যকারীতার আজ তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে। অদৃষ্টে যা-ই ঘটুক না কেন। এ সভার দীর্ঘ বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। অন্যত্র তার উল্লেখ এসেছে। সেটা 'বলেছি বলছি বলব' নামে গ্রন্থে বিস্তারিত স্থান পেয়েছে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আমি, ওবায়েদ, মঞ্জু এবং আরও কেউ কেউ তীব্র ভাষায় সামরিক ক্যু, কাউন্টার-ক্যু এবং তার ফলশ্রুতিতে

www.pathagar.com

জাতীয় ভিত্তিতে যা হারিয়েছি তা বিবৃত করে এসব কর্মকাণ্ডের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠি। এ সমস্ত নারকীয় কর্মকাণ্ডের পরে সরকারের সাথে কোন অবস্থাতেই আমরা আর সম্পৃক্ত থাকতে পারি না সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই।

ক্লান্ত ও শ্রান্ত মোশতাক সাহেব মলিন বদনে তাঁর চেয়ারে বসে আমাদের বক্তব্য শুনছিলেন। দেখেই বুঝা যায়, ক'দিন ধরে তাঁর উপর দিয়ে প্রচণ্ড মানসিক চাপ গেছে। ক্যাবিনেট কক্ষে সভা হচ্ছিল। বাইরে সশস্ত্র ব্যক্তিগণ সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন। খালেদ মোশাররফের সাথে মোশতাক সাহেবের বাত-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে তারা ভিতরে ঢুকে পড়ে। হাতে অস্ত্র, মুখে অকথ্য গালাগালি। কেউ কেউ বোধগম্য কারণে বেসামাল।

প্রতিমন্ত্রী ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র মণ্ডল আমার পাশে বসা। তিনি আমার হাত চেপে ধরেন। তার মধ্যে মৃত্যু ভয় ঢুকেছে। খুলনার নতুন প্রতিমন্ত্রী মমিন উদ্দীন আহমেদ অস্ফুটে বলেন, ডেথ হ্যাজ কাম!

বস্তুত সেই মুহূর্তে সভাকক্ষের একদিকে আজরাইল ফেরেশতার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলাম, অন্যদিকে সামরিক কর্মকর্তাদের মুখনিঃসৃত অশ্রাব্য গালাগাল কর্ণে প্রবেশ করছিল। যে কোন মুহূর্তে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ট্রিগারে রাখা ওদের হাতগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

কথায় আছে, রাখে আল্লা, মারে কে!

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় সে যাত্রা রক্ষা পেলাম এম.এ.জি ওসমানী সাহেবের সময়োচিত হস্তক্ষেপে। তিনি সামরিক বাহিনীরই জেনারেল এবং তখন রাষ্ট্রপতির দেশরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানী সাহেবের প্রভূত প্রভাব ছিল বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর উপর। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এক-একজনের অস্ত্র দু'হাতে চেপে ধরেন এবং ক্রমাগত স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকেন যাতে তারা গুলি না চালায়, বার্মার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বার্মাতে নাকি সৈনিকেরা এমনি করে ক্যাবিনেটের সভায় প্রবেশ করে সকলকে হত্যা করেছিল।

তিনি রাষ্ট্রপতিকেও বলেন, স্যার, ওরা যা চায় তাই করুন। সব কাগজে সই করে দিন। আপনি নিজেই শুধু বিপন্ন নন, এতগুলো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীও এই মুহূর্তে জীবন সংশয়ে পতিত। স্যার, আমার কথা রাখুন। ওদের দাবি মেনে নিন।

www.pathagar.com

মোশতাক সাহেব সম্মত হন। কাগজপত্র তৈরি হয়ে আসে। তিনি স্বাক্ষর করে দেন। রক্তপাত এড়িয়ে সভা সমাপ্ত হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেলে উন্নীত হয়। সে সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে।

সকল মন্ত্রীদের চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়, চার জন প্রতিমন্ত্রী ব্যতিরেকে। ওবায়েদ, মঞ্জু, ঠাকুর ও আমাকে থেকে যেতে বলা হয়। আমাদেরকে দিয়ে দ্বিতীয়বার পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেয়। রাষ্ট্রপতিকে তারা উপরে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই, পুলিশকে বলা হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে এদের চার জনকে গ্রেপ্তার দেখান যাক। আমাদেরকে পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয় এবং রাত্রি শেষে খালেদ মোশাররফের নির্দেশে ওবায়েদ ও মঞ্জুকে তাদের বাড়িতে গৃহবন্দি করে আমাদের দু'জনকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়।

সকালে যখন বহুবার আসা এই কারাগারে আবার প্রবেশ করি তখন দু'গেটের অভ্যন্তরে নিহত নেতাদের লাশ কফিনে দেখতে পাই—বাইরে নেওয়ার অপেক্ষায়।

নিয়ম আছে, পরিচিত বা স্বজনদের কেউ সনাক্ত করার পর লাশ বাইরে যাবে। সেই মুহূর্তে সেখানে তেমন কেউ ছিল না। আমার চাইতে বড় পরিচিত এবং স্বজন তাদের কে আছে জানি না! তাদের হত্যার বিচার চাইতে গিয়ে সেই মুহূর্তে মন্ত্রিসভা থেকে সরাসরি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। আমি তাঁদের লাশ সনাক্ত করি।

তাঁরা বাইরে গেলেন মৃতাবস্থায়।

আমরা ভিতরে ঢুকলাম জীবন্মৃতাবস্থায়।

সে যাত্রা মাত্র দু'দিন কারাভোগ করতে হয়। জেল জীবনের ইতিহাসে সেটাই ছিল স্বল্পস্থায়ী। সে সময়ের মর্মযাতনা, অসহায়-নিরাপত্তাহীনতার কথা ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। চার-চার জন দিকপাল তথা এদেশের ইতিহাসের খ্যাতিমান জাতীয় নেতাকে ওরা নির্বিচারে জেলখানার অভ্যন্তরে হত্যা করে গেছে। আমরা কোন্ ছাড়! অনেক অসহিষ্ণু সামরিক কর্মকর্তার বিদ্বেষ কুড়িয়েছি। জানি না ভাগ্যে কি আছে!

www.pathagar.com

কিন্তু মানুষ কতটুকুই বা জানে! সেটাই হয়, যেটা পালনকর্তার নির্দেশিত হয়। পরপর অনেক ঘটনা জাতীয় জীবনে দ্রুত ঘটে যায়। দু'দিন পরই ৭ই নভেম্বর সিপাহ-জনতার রুদ্ররোষে খালেদ মোশাররফের ক্ষমতার মসনদ ভেঙ্গে পড়ে। বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তারা খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। আমাদেরকেও কারাগার থেকে বের করে নিয়ে যায়।

বেতার ভবনে নিয়ে গেলে দেখি ভীত-বিহ্বল মোশতাক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন। সুযোগ পেয়েও দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের ঝুঁকি নিতে সাহস পান না। উচ্চাভিলাষী প্রধান সেনাপতি জিয়াউর রহমান একসময় ক্ষমতা দখল করে নেন।

রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের পদক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হয়ে জীবনের একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে তাঁর কোন হাত ছিল না—পবিত্র কোরান নিয়ে এই শপথের প্রেক্ষিতে আমরা খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করি। ডেমোক্রেটিক লীগ দানা বাঁধতে শুরু করলে ঈর্ষাকাতর জিয়াউর রহমান তাঁর পথের কাঁটা অপসারণের লক্ষ্যে আমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মোশতাকের কারাদণ্ড হয়। তাঁর মুক্তির পর ১৫ই অগাস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসাবে পালনের উদ্যোগ নিলে দলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়। আমি তখন দলের সেক্রেটারি জেনারেল। 'নাজাত দিবস' পালনে আমি ঘোরতর বিরোধী। অধিকাংশ কর্মী জোটবদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে নতুন করে দলের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার প্রয়াস পায়।

ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান তাঁর রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করেছেন। অনেকে সেখানে যোগদান করে। আমাকেও তারা অনেক সাধ্যসাধনা করে। খোদ কর্তাও বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গজনিত কারণে তাঁর উপর আস্থা আনতে পারি না। একসময় জিয়াউর রহমান সাহেবও সামরিক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বৃদ্ধ ব্যক্তিটির দুর্বলতার সুযোগে দেশে নিদারুণ কুশাসন ও অনিয়ম-অনাচার চালু হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পুনরায় প্রধান সেনাপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করে নেন। আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন যেমন সম্ভব নয়, দ্বিধাবিভক্ত দলও দীর্ঘকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বিধায় একসময়

www.pathagar.com

এরশাদ সাহেবের রাজনৈতির উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ডেমোক্রেটিক লীগ জাতীয় পার্টিতে একীভূত হয়ে যায়। আমি তার ক্যাবিনেটে যোগ দিই। পরে পার্টির মহাসচিব হই। একসময় দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী হই। অনেক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে আজ সে দলের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য।

এরশাদ সাহেব সুদীর্ঘ নয় বছর দেশ শাসন করেন। '৯০ সালে সম্মিলিত আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তাকেসহ আমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী উত্তরাধিকারের রাজনীতির সুবাদে ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট হন। জাতীয় পার্টির উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার নেমে আসে। হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পেয়ে '৯১-তে রংপুরের পীরগঞ্জ থেকে উপ-নির্বাচনে জয়লাভ করে আসি। কারাগারে থেকেও এরশাদ সাহেব দু'বার সেখান থেকে পাঁচ আসনে নির্বাচিত হন। অনেক সংগ্রামের শেষে ছয় বছর কারাভোগের পর তিনি আদালতের নির্দেশে জামিনে মুক্তি পান। একসময় বেগম জিয়াকেও আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে হয়। এক মহিলার পতনে উত্তরাধিকারের রাজনীতির সূত্রে ক্ষমতার মসনদে আর এক মহিলার আবির্ভাব ঘটে। উত্তপ্ত কড়াই থেকে দেশের মানুষ জ্বলন্ত চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থের নিমিত্তে প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ত লালসায় এই সরকার মামলা ও হামলার আশ্রয় নেয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার এখন সেই জাতীয় পার্টির উপরই সর্বাধিক খড়্গ হস্ত। এমনই হয়। কথায় বলে, উপকারীকে বাঘে খায়।

তাই আজ এরশাদের দলের উপর সবচাইতে বড় আক্রমণ। তাঁর জামিন কাটার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর পাসপোর্ট আটক করে বারবার তাঁকে বিদেশ ভ্রমণে বাধা দিচ্ছে। হাইকোর্টের আদেশকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাঁর দলকে ভাঙ্গা হয়েছে। তাঁর নাবালক ছেলেকে বানোয়াট মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের অন্যতম নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফরকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমাকে অন্য কোনভাবে পর্যদুস্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এই কুখ্যাত জেল হত্যা মামলায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে ওবায়েদ ও মঞ্জুরসহ গ্রেপ্তার করে দীর্ঘকাল ধরে কারা নির্যাতন ভোগ করাচ্ছে। আজ আমরা জীবন-সায়াহ্নে উপনীত।

www.pathagar.com

'৭৫ পরবর্তী প্রতিটি সংশ্লিষ্ট সভা-সমাবেশে জেল হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এসেছি এবং স্বোচ্চারে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়ে এসেছি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ আমরাই সে মামলায় অভিযুক্ত! এ যাতনা রাখার কোন স্থান নেই!

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা যখন শুরু হয়, আমি তখন আমেরিকাতে দলীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। দেশের পত্র-পত্রিকায় যেসব আজগুবি খবরাখবর প্রকাশিত হয়, তাতে দলীয় লোকজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে দেশে প্রত্যাবর্তনে বারণ করে। কিন্তু কেন? আমি দেশে ফিরব না কেন? আমার কি কোন দুর্বলতা আছে? মোশতাক সাহেবের সঙ্গে একত্রে দল গঠন অপরাধ হলে নিশ্চয়ই অপরাধী। সে দলও পনেরই আগাষ্ট 'নাজাত দিবস' পালনের প্রশ্নে আমারই নেতৃত্বে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। নিজের ত্রুটি নিজেই সংশোধনের প্রয়াস পাই। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু চিহ্নিত সংবাদপত্রের কল্পকাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন না করার কোন অর্থ হয় না। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে দেশে ফিরে আসি।

আবদুল কাহার আখন্দ, সিআইডির এএসপি, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। সে আমাকে চিঠি পাঠিয়ে তার অফিসে ডেকে নেয়। প্রশ্ন করে, ১৫ই অগাস্ট মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন কেন?

জবাব দিই, সেটাই কি আপনার তদন্তের বিষয়বস্তু? তা হলে আওয়ামী লীগের পুরো ক্যাবিনেট তলব করুন। আমি একজন প্রতিমন্ত্রী ছিলাম। রাঘব-বোয়ালদের আগে ডাকুন, উপ-রাষ্ট্রপতি, উপদেষ্টামণ্ডলী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী সকলকে এনে প্রথমে জিজ্ঞেসাবাদ করুন।

সে বলে, শপথে না গেলেও পারতেন।

বলি, সেদিনের পরিস্থিতি ভুলে যাবেন না। বঙ্গবন্ধুর লাশ সিঁড়িতে পড়ে আছে। তাদের নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস ছিল না। আজ, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। তবুও আপনার মতো একজন পুলিশ অফিসারের নির্দেশে আমাকে সিআইডি অফিসে আসতে হয়েছে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না।

কাহারের টেবিলে রাখা ফোন বেজে উঠে। রিসিভার ধরে সসম্ভ্রমে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ে। 'ম্যাডাম, ম্যাডাম' বলে অতি বিনয়ে বিগলিত তার উত্তর শুনে বুঝতে অসুবিধা হয় না টেলিফোনটি কোথা থেকে এসেছে।

www.pathagar.com

পরে অন্য এক অফিসার সত্যতা স্বীকার করে। টেলিফোন সর্বোচ্চ মহল থেকেই এসেছে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার।

কিছু পেলে?

না ম্যাডাম, কোনভাবেই জড়ানো যাচ্ছে না।

চেষ্টা করে যাও।

নিশ্চয়ই ম্যাডাম। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে ম্যাডাম, কোন সুবিধা করা যাবে না।

অন্যদিক থেকে কি বলে বুঝা যায় না। কাহারের উত্তর শুনে মনে হয় এখানে সম্ভব না হলেও অন্য কোথাও অন্য কোন অভিযোগে গেঁথে তুলতেই হবে। শুনেছি, মহিলাদের জাতক্রোধ বড়ই ভয়ঙ্কর। কিছুতেই নির্বাপিত হয় না। যেখানে সুই ঢুকানো অসম্ভব সেখানে মুগুড় ঢুকিয়ে দেয়।

আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হল। অন্য কোনভাবে কাবু করতে না পেরে শেষ অবধি জেল হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এই অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হল। আমরা তার নেতৃত্ব মানিনি। আমরা উত্তরাধিকারের রাজনীতির বিরোধী। আমরা তার পদযুগলে নৈবেদ্য অর্পণে সম্মত নই। ক্রোধে উন্মত্ত মহিলার সেকি নর্তন-কুর্দন। ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেন, ওদের জিহ্বা আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

আনোয়ার আমার দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন কর্মী। বিক্রমপুরের লোক, আমার অনুজপ্রতীম। সে ছিল আমার সহকারী একান্ত সচিব। সুদিনে-দুর্দিনে সর্বদা সে আমার সাথী। ছাত্রলীগের এক সময়ের কর্মকর্তা আনোয়ার একদিন অন্য বন্ধুদের সঙ্গে এই মহিলার দফতরে গিয়ে তার যে ভয়াল সংকল্পের আভাস পায়, চুপি চুপি এসে আমাকে তা জানায়। আনোয়ারকে বলি, জিয়ার আমলে বায়তুল মোকারমে ডেমোক্রেটিক লীগের জনসভায় বোমার আঘাতে নয় জন মৃত্যু বরণ করল। কিন্তু সেদিন গুরুতর আহত হয়েও তুই আজও বেঁচে আছিস! সেটাই হবে যেটা আল্লাহ্ করবেন। তাঁর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ব্যতীত আমাদের কিছুই করার নেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের বিরুদ্ধে কেবল এতটা প্রতিহিংসার অনল কেন? অন্যদের বিরুদ্ধে নয় কেন?

উত্তরও সহজবোধ্য। একমাত্র আমরাই তার সাথে নেই। দলের মধ্যে সর্ব বিবেচনায় যে ক'জনকে ধর্তব্যের মধ্যে গোণা যায় তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে আমরা ক'জন ব্যতীত সকলেই মহাজনী-পন্থা অবলম্বন করে দেহি পদবল্লভম্ করেছে। পিতার আয়ুষ্কালে, 'তুমিই জীবন, তুমিই মরণ। তুমিই স্বর্গ, তুমিই নরক' জপ করেছে। এক্ষণে তাঁর অবর্তমানে কন্যার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে তারা মোক্ষ লাভের প্রচেষ্টা করছে। আমরা ব্যতিক্রম সাজার চেষ্টা করি কেন!

আওয়ামী লীগের সে সময়ের মন্ত্রিসভার তালিকাটি পর্যালোচনা করলেই যে কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বিবেকের নিকট বিষয়টি দিবালোকের মতো প্রতিভাত হবে। প্রধান নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিলে, ছাত্রলীগ এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে জাতীয় ভিত্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে এ ধরনের হাতে গোণা ক'জনের মধ্যে আমরা ছিলাম শীর্ষে।

ছাত্রলীগে আমার অবস্থান ও অবদান আজ ওরা যত খাটো করেই দেখুক না কেন, সেদিন সকলে একবাক্যে স্বীকার করত আয়ুব খাঁর সামরিক আইনের পরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে নতুন করে দাঁড় করাবার মূলে আমার অবদান ছিল প্রশ্নাতীত। শুধু ছাত্রলীগকে পুনর্গঠনেই নয়, সেদিনের ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মূলেও আমার সিংহভাগ অবদান ছিল একথা সর্বজন বিদিত। অতি বড় নিন্দুকও একান্তে এসব কথা অস্বীকার করতে পারে না। সেই ক্রান্তিকালে আমি ছিলাম সে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং তিন তিন বার সভাপতি। ওবায়েদের অবদানও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তাকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক করা হয় এবং আমার পরে ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বও তার স্কন্ধেই নিপতিত হয়। মঞ্জুরও তার নিজ জেলাতে পরপর দুটি প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেয়। মন্ত্রিসভায় আমাদের সম পর্যায়ের একজনও ছিল না।

এটা কেবল মুখের কথাই নয়, সে সময়ের মন্ত্রিসভার তালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলেই এই বক্তব্য প্রণিধান করা যাবে।

দ্বিতীয় কারণটিও প্রথম কারণেরই সম্পূরক। বয়সের কারণেই ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্বের প্রশ্নে যে দাবি উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাকে অচিরেই নস্যাৎ করে দেওয়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কথায় আছে, কাউকে বধ করতে হলে পূর্বাহ্নে বদনাম দেওয়াটাই সহজ পন্থা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজ ত্যাগ-তিতীক্ষা ও যোগ্যতার বলেই নেতৃত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর কন্যা? তার কী যোগ্যতা? কতটুকু ত্যাগ রয়েছে এদেশের মানুষ বা তাদের মুক্তির সংগ্রামে? আজ উড়ে এসে জুড়ে বসলে

www.pathagar.com

স্বার্থের কারণে সকলে তার শ্রীচরণে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও আমরা তা পারিনি। তার পিতার সময়েই চাকরি বাঁচিয়ে যথাসম্ভব উচিত বলার চেষ্টা করে অনুচিত বঞ্চনা ও অবমূল্যায়নে নিপতিত হয়েছি। যথোপযোগ্য এবং স্বোপার্জিত পদ ও মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়েছি। সেক্ষেত্রে বাঁশের চাইতে কঞ্চির প্রকোপ বেশি হওয়ার দরুণ আরও বিপরীত ফল লাভের সম্ভাবনা ছিল প্রকট। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'—কথাটা সকলেই জানে। তাই অনস্বীকার্য ও অভূতপূর্ব অবদান থাকার পরও সামান্য প্রতিদানেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। বোধগম্য কারণেই আমাকে চীফ হুইপ করা হয়। মঞ্জুরকে প্রতিমন্ত্রী করা হলেও পরে ভগ্নিপতিকে খুশি করতে গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। ওবায়েদের বাড়ি আবার ফরিদপুরে। এক ঘরে দু'পীরের অবস্থান মোটেই বাঞ্চনীয় নয়। অরাজনৈতিক এই মহিলার উত্তরাধিকারের রাজনীতি মেনে নিয়ে তার নেতৃত্বের কাছে মাথা নোয়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটা কম-বেশি সকলেরই জানা ছিল। তাই সেদিন দলকে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে সযত্নে পরিহার করা হয়। সম্ভাবনাময় প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে প্রারম্ভিক সূচনা দৌড়ে বাতিল করতে পারলে মূল প্রতিযোগিতায় সহজেই সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা। বয়সটাই আমাদের অন্যতম কাল। দ্বিতীয় সারির আগ্রহী প্রার্থীরা ল্যাং মেরে মেরে তাদের পথ পরিষ্কারে তৎপর ছিল।

তৃতীয়ত, আমরা তিন জন ছিলাম বিঘোষিত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট প্রবক্তা। অনেকের মূল্যায়নে আমরা ছিলাম দক্ষিণপন্থি। দলের বামপন্থিরা আমাদের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখত না। এরাই একসময় স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসিরকে পাঠিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝিয়ে মুজিব বাহিনী তৈরি করে প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসামানী বলেছিলেন, তাদেরকে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে কোথাও যুদ্ধ করতে দেখিনি।

তারাই শেখ সাহেবের প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ভাগ্নের নেতৃত্বে তাঁকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করে আমাদেরকে কোনঠাসা ও অবমূল্যায়ন করে। সেই পথ ধরেই বাম ঘেঁষা নব্য আওয়ামী লীগাররা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এবং আজ শেখ তনয়াকে হাত করে আমাদের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।

শুধু তাই নয়। সকলেই জানে, আমরা সমাজতন্ত্রকে এ দেশের

www.pathagar.com

জন্য অনুপযোগী মনে করি। কেউ কেউ এটাকে ফকিরতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে। তদুপরি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মাহীনতাও আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। নিজেরা তেমন ধর্ম-কর্মের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও জাতিগত ও ঐতিহ্যগতভাবে মন-মানসিকতার দিক থেকে আমরা ছিলাম ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন। স্বাধীনতার পরপর সীমান্তের ওপারের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে এই দলের একাংশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতার নামে ধর্মহীনতার যে বীজ রোপিত হয়, সেটা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলশ্রুতিতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক বলয়, তার আন্তর্জাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দেশের অভ্যন্তরে তার শিখণ্ডীদের কোপ আমাদের উপর খাড়া হয়েই ছিল।

চতুর্থত, আমরা সত্যিকার অর্থেই স্বাধীনতার উদ্‌গাতা ছিলাম। পিণ্ডির পরিবর্তে দিল্লীর স্তব করা আমাদের স্বভাবের পরিপন্থি ছিল। নিঃসন্দেহে ভারত এ দেশকে স্বাধীন করার পশ্চাতে প্রভূত অবদান রেখেছে। উপমহাদেশে তাদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত রাখার স্বার্থে শক্তিশালী পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার তাদের পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার সুদীর্ঘ সংগ্রাম ছিল পরিপূরক। প্রত্যেকেই তাদের অন্তর্নিহিত কার্যকারণে নিজেদের ব্লু-প্রিন্ট মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তাই বলে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা কোন অবস্থাতেই নতজানু পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটাক এটাই ছিল আমাদের কাম্য। কিন্তু তাদের প্রয়োজন ছিল এ দেশে কিছু বশংবদের সৃষ্টি করা এবং তাদের পন্যের একটি বাজার সৃষ্টি করা। সে পরিকল্পনার সাথে আমাদের একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। সকল কথায় তাদের অগ্রজসুলভ ব্যবহার মেনে নিয়ে এই ভূখণ্ডে তাদের আধিপত্য প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে একটা অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে আমাদের আপত্তি ছিল আন্তরিক। মাত্র সেদিন এক বন্ধুর বাসায় ভিনদেশী দু'জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা পরিষ্কার বলে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় পার্লামেন্টে আপনার সেই অগ্নিঝরা বক্তৃতার পর আমরা আপনাকে অনেক উচ্চ প্রায়োরিটিতে রেখেছিলাম। কিন্তু আপনার পরবর্তী রাজনীতি আমাদের হতাশ করে। আমরা আপনার এবং আপনাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করি।

তারা আমাকে আরও নিবেদন করে, আর কী আওয়ামী লীগে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়? আপনার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল।

উত্তর করেছিলাম, না, তা আর সম্ভব নয়। যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, মানুষ এবং দেশের কল্যাণেই রাজনীতি করি। ভিনদেশের কারো সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাজনীতি করা এবং তার ফলশ্রুতিতে অনুকম্পা লাভ অন্য কারো মোক্ষ হলেও সেটা আমার কাম্য নয়।

তারা নিরাশ হয়ে বিদায় নিয়েছিল। এদেশের রাজনীতিতে তাদের স্বার্থ যে কত সুদূরে বিস্তৃত সেদিন তা কিছুটা অনুধাবন করি।

পরপদানত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার পূর্বে এই সুন্দর পৃথিবীর দেনা-পাওনা মিটিয়ে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোই শ্রেয়।

পঞ্চম কারণটি প্রকাশ না করাই উত্তম। একান্তই ব্যক্তিগত। তার বাইরেও একটি বিষয় রয়েছে। নারী নেতৃত্ব আমার কখনওই কাম্য নয়। শুধু আমি কেন, অনেকেরই তা কাম্য নয়। কেউ মুখ ফুটে বলে, কেউ তা বলতে সাহস পায় না। আমার সতীর্থ দু'জনও নারী নেতৃত্বের বিরোধী। একজন তো একসময় বিদ্রোহ করে ভিন্ন দল গঠন করেছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পুনরায় সুন্দর মুখের অসুন্দর অভিব্যক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার কি ইচ্ছা জানি না। মূলত মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশটির দুটি প্রধান দলেই নারী নেতৃত্ব বিরাজমান। উত্তরাধিকারের দাবিতে পরম্পরায় প্রমিলা শাসন। কোথায় যাই! কী করি! আল্লাহ্ তা'আলা নারী সৃষ্টি করেছেন পুরুষ যেন তার মাঝে শান্তি ও সুখ খুঁজে পায়। এই নম্রসহচরী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কারোই অবিদিত নয়। দেশ, জাতি বা সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া যে তাদের স্বাভাবিক কর্ম পরিধিতে বর্তায় না এটা ধর্মের বিধানেই স্থিরিকৃত। নারীর অবস্থান সম্পর্কে মহাগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত আছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরিত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে একজনও মহিলা নেই। এটাতেই কি সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে না! এ দেশে বিধাতার সেই আমোঘ বিধানের পরিপন্থি ব্যবস্থা অবলম্বন করে সহজ স্বার্থসিদ্ধির মানসে অনেকেই আজ বগল বাজাচ্ছে। কিন্তু একদিন সুদে-আসলে এর জবাবদিহিতা করতে হবে। নারীনেতৃত্বের বিঘোষিত বিরোধী হিসাবে ওরা আমাকে চিহ্নিত করেছে। আমাদের উপরে জাতক্রোধ মিটাবার সেটাও একটা বড় কারণ বৈকি!

www.pathagar.com

২৯ শে সেপ্টেম্বর, '৯৮ সনে আমাদের গ্রেপ্তারের পর প্রধানমন্ত্রী অক্টোবরের প্রথম ভাগে নবাবগঞ্জের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে তার সমস্ত রাগ প্রকাশ করে বলতে দ্বিধা করেন না, ওরা আওয়ামী লীগ ছেড়েছে কেন? ওরা নিশ্চয়ই অপরাধী!

কী চমৎকার যুক্তি! রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কি সুন্দর ব্যাখ্যা! বিচারাধীন বিষয়ে সরকার প্রধান স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বিষয়টিকে যে নাজুক পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করছেন সে বোধ তার আছে কিনা সন্দেহ। অন্য কোন সভ্য দেশ হলে তার বিরুদ্ধেই বিচারের হস্ত প্রসারিত হতে পারত।

কর্ত্রীর সঙ্গে সমান তাল রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই বোলচাল ছাড়ছে। তার পিতাও একসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল। সে সময় আমরা অবাক হয়ে শুনতাম প্রায়ই তিনি বলছেন, ফিনিস্ করে দাও, শেষ করে দাও, গুলি করে খুলি উড়িয়ে দাও। এমনি কত সব হুঙ্কার। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের কি পরিণতি হল একবার বিবেচনার দাবি রাখে। আজ আবার পুত্র সেই গদিতে সমাসীন হয়ে তীব্রতর ভাষায় আক্রমণাত্মক কথা বলে যাচ্ছে। একে শেষ করতে হবে, ওকে সহ্য করা হবে না, তাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে হবে—এমনি হম্বি-তম্বী যত্রতত্র অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর যত চড়া হচ্ছে, দেশে খুন-রাহাজানি, নারী নির্যাতনসহ সংখ্যাতীত অপরাধের ঘটনা জ্যামিতিক হারে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকে বলে, কুফা এই মন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে খবরের কাগজে দৃষ্টি দেওয়া যায় না। প্রতিদিন লোমহর্ষক খুন। যত্রতত্র মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা লাশ হয়ে যাচ্ছে। তাদের আত্মীয়-পরিজনদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস মথিত। অধিকাংশ হত্যা ও অপরাধের সঙ্গে সরকারি দলের কারো না কারো যোগসাজস বা অনুকম্পা জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কীর্তিমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লম্ফ-ঝম্ফ বাড়ছে বৈ কমছে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাইতে সন্ত্রাসীদের বড় পৃষ্ঠপোষক কেউ নেই। তাদের সমর্থক সংবাদপত্রের লিখ্য মতে খুনের মামলার চার্জশিটপ্রাপ্ত আসামির সভাপতিত্বেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেয়। যে সে খুনী নয়! পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা নিতে সাহস পায় না, মন্ত্রীর আদেশে

www.pathagar.com

মামলা নিয়ে চার্জশিট দিলেও তাকে ধরা হয় না। স্বরাষ্টমন্ত্রীর সভায় সে হয় সভাপতি!

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য নাকি এদিক-সেদিক প্রায়ই বোমা পুতে রাখা হচ্ছে। সেই 'রাখাল বালকের কেচ্ছা'ই আবার মনে পড়ে। অন্য কোন ইস্যু না পেয়ে, হত্যার ষড়যন্ত্র ও বোমা আবিষ্কার করে বিরোধী দলকে নাস্তানাবুদ করার ব্লু-প্রিন্ট মতোই কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রীর নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে পঞ্চাশ গজ দূরে দুই মন ওজনের বোমা পানের দোকানদার কর্তৃক খুঁজে পাওয়া যে কতটা হাস্যকর, এদেরকে যারা চেনে তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ।

যাক সে কথা। প্রধানমন্ত্রীর এক ভাইকে করা হয়েছে চীফ হুইপ। তার সুনাম-সুযশে বরিশালের আবহাওয়া মৌ মৌ করছে। যত কম বলা যায়, ততই উত্তম। জেলা শহরের বিতর্কিত লোকটিকে এনে জাতির প্রধান সচেতক করা হয়েছে। তার লম্ফ-ঝম্ফও কম নয়। ১৫ই অগাস্ট তাঁর পিতাকেও হত্যা করা হয়েছিল। সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ এসেছে। এ সুযোগে চিরদিনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। আগামী দিনের জন্য পারিবারিক প্রতিপত্তি নিরঙ্কুশ করতে হবে। তাই চিহ্নিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে। ন্যায়-নীতি, বিধি-বিধান চুলোয় যাক। ডাণ্ডা মেরে সব ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে।

সকলেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চায়। খুবই সাধু সংকল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত খুনীদের ডকে না এনে রাজনৈতিক কারণে নিরপরাধ মানুষকে জড়িয়ে বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টি করে যে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হচ্ছে তার বিচার কবে হবে? কখন হবে? আমরা দিন গুণছি। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা অপেক্ষা কর।

আমরা অপেক্ষা করছি।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার জট খোলার উদ্যোগ নেয়। আমাদের দলের পক্ষ থেকেও সবরকম সহযোগিতা প্রদান করা হয়। পার্লামেন্টে ইনডেমনিটির আইনটি রদ হয়ে গেলে এরশাদ সাহেব নিজে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং তার পিতৃহত্যার বিচারের পথ সুগম হওয়ায় আনন্দিত স্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। সে মামলায় উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টায় সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রতিমন্ত্রী

www.pathagar.com

তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে বলে, মানসিক চাপ ও নির্যাতনের মাধ্যমে কাহার আখন্দ এবং তার দলবল ছলে-বলে ও কৌশলে তার কাছ থেকে এক ধরনের স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয়। পরে অবশ্য কোর্টে সে তা প্রত্যাহার করে নেয়। এ সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। হত্যাকারীরা দুনিয়ার সর্বত্র সদম্ভে বলে বেড়িয়েছে তারা শেখ সাহেবকে হত্যা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবরের কাগজে, রেডিও ও টেলিভিশনে তারা সাক্ষাৎকার দিয়ে এর দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের কথার মাঝে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। অহেতুক অন্য নিরপরাধ মানুষকে জড়াবার হীন প্রচেষ্টায় সরকারের তরফ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ায় এবং পত্র-পত্রিকার ভূয়া প্রচারণার ফলে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলাম। দীর্ঘ তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল হয়ে বিচার শুরু হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অহেতুক বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল!

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি ওরা ভিতরে ভিতরে আর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। এই মামলায় সুবিধা করা গেল না। কুছ্ পরোয়া নেই। অন্য মামলা হাতে আছে। আখন্দের সঙ্গে কর্ত্রীর টেলিফোন আলাপ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

ওরা মোশতাকের মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিল। বঙ্গভবনে সে সময় ওদের দেখা গিয়েছে এটা বলানো অসম্ভব হবে না। জেল হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এই মর্মে ওদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দাও। মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হোক বা না হোক, কিছু আসে-যায় না। ওদের শায়েস্তা করার এমন মোক্ষম সুযোগ হেলায় নষ্ট করা যাবে না। অতিশয় আগ্রহী কাহার আখন্দের বিক্রম আরও বেড়ে যায়। অন্ধকারে কমাণ্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে আমাদের গ্রেপ্তার করে তার রিমাণ্ডে নিয়ে আসে।

প্রথম দিনেই কোর্টে শত শত আইনজীবীর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে নিবেদন করেছিলাম, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ওরা যে ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ নিয়েছে, একসময় নিশ্চয়ই তার বিচার হবে। সকল কোর্টের বড় কোর্ট আল্লাহ্‌র দরবারে এর বিচার একদিন অবশ্যই হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাদের দোহারেরা বিচারাধীন বিষয়ে যেভাবে ঢালাও রায় দিয়ে যাচ্ছে, তার বিহিত কী? এদের বিচার করে কে? প্রধানমন্ত্রী এবং তার তল্পীবাহকদের রাগ-বিরাগেই কি কোর্ট-কাচারি পরিচালিত হবে? কিন্তু কে দেবে এই অভিযোগের জবাব?

www.pathagar.com

মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের আবেদন নিবেদনে কান দেন না। সকল আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি রিমান্ডের আদেশ দেন।

সিআইডি অফিসের সর্বোচ্চ তলায় আমাদেরকে রাখা হয়। বিছানা নেই, মশারি নেই, বালিশ নেই। একটি কাঠের চৌকিতে পুরনো চাদর বিছিয়ে থাকতে দেওয়া হয়। সর্বক্ষণ ঘরে জোরাল আলো জ্বলে থাকে। বাইরের রাস্তার দোকান থেকে খাবার এনে খেতে দেওয়া হয়। অফিসের লোকজন আমাদের অবস্থা দেখে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এএসপির সজাগ দৃষ্টি, কেউ যেন আমাদের কোনভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে না পারে।

খাই-খরচায় বাবদ যে অর্থ নেওয়া হচ্ছে তারও মোটা অংশ আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে শুনা যায়। ওদের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

সারাদিন কোন খোঁজখবর নেই। অনেক রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন ওরা এসে ডেকে তোলে। জিজ্ঞেসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। মনে করে, আচমকা ঘুম ভেঙ্গে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করে দেব। কিন্তু আমাদের কাছে যে এ সম্বন্ধে কোন তথ্যই নেই! ওরাও হয়ত তা অনুধাবন করে। অনেক লোকজন জুটিয়ে বিরাট করে জিজ্ঞেসাবাদ করতে গিয়ে ওরা খেই হারিয়ে ফেলে।

এক রাতে উষ্মার সঙ্গে বলি, কাহার সাহেব, সারা দিন আপনি সময় পান না। রাত্রি গভীরে আপনার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। শুনেছি নিশি কুটুম্বরাই রজনীর নিভৃত প্রহরে দক্ষতা দেখিয়ে থাকে। আপনারা কী তাদেরই আর এক প্রজাতি!

সে আবোল-তাবোল অনেক প্রশ্ন রাখারই চেষ্টা করে। একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বলি, আজ বঙ্গবন্ধুর জন্য আপনাদের মায়াকান্নার বিরাম নেই। তাঁর কন্যা দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে, তাই আজ সূর্যের চেয়ে বালুর উত্তাপ প্রখরতর। আমরা সেদিন শপথ নিতে বাধ্য হয়েছিলাম তা ভালো করেই জানেন। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমাদেরকে বঙ্গভবনে নিয়ে শপথ দেওয়া হয়েছিল। আমরা ওদের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের সম্মুখে সেদিন প্রাণের মায়ায় বা অন্য যে কোন কারণেই উচ্চবাচ্য করিনি। অবস্থার শিকার ছিলাম। কিন্তু আপনারা? এতদিন পর তার এত বড় দরদী বান্ধবেরা সেদিন কি করেছিলেন? চাকরি করেননি? অনুগত কর্মচারীগণ, সেদিন আপনারা যার যার অফিসে দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন না? আপনাদের বড় কর্তা কী

www.pathagar.com

সেদিন পরিবর্তন মেনে নিয়ে আনুগত্য প্রদান করেননি? কেউ কী প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন? কেউ কী শোকে-দুঃখে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে অরণ্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন? প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সহোদররা কী সেদিন পিতৃশোকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

নায়ক সালমান শাহ্ নিহত হলে বেশ কয়েকজন ভক্ত নর-নারী তাঁর মৃত্যুতে আত্মহত্যা করে। এমন কোন দৃষ্টান্ত কী দেশের অভ্যন্তরে এত বড় নেতার তিরোধানে ঘটেছিল? কাউকে কী ইন্নালিল্লাহে পড়তে শুনেছিলেন? তার দু'কন্যাই কি কোন সবর প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন? তারা তো বিদেশেই ছিলেন! সবই করতে পারতেন! তা না করে স্বামীর সঙ্গে দিব্যি সংসার করেছেন। আজ, এতদিন পরে ধরে-বেঁধে এনে আমাদেরকে হয়রানি করছেন! মনে রাখবেন, একদিন এর প্রতিবিধান ঠিকই হবে!

আমার উত্তেজিত ও দীর্ঘ বক্তব্যে তারা কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সে রাতের মতো ক্ষান্ত দেয়।

আর একদিন জিজ্ঞেস করে, তারপর তাহের উদ্দীন ঠাকুরের বাসায় গিয়ে কি করলেন?

হাসি পেল। ঠাকুরের বাসা কোথায় চিনতাম না। তার বাসায় জীবনে যাইনি। কোনদিনই তার সাথে আমাদের মিল খেত না। অনুষ্ঠানাদিতে দেখা-সাক্ষাতে সৌজন্য বিনিময় ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না। তাকে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী নিয়োগ করায় আমরা অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু করার কিছু ছিল না।

বলি, কেন? আপনি তো সেখানেই ছিলেন! একসাথে এত খানাপিনা, সলা-পরামর্শ হল, সব ভুলে গেছেন? লিখুন, সব লিখে নিন।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে বলি, দেখুন কাহার সাহেব! বিনা দুধে দৈ বানাতে পারবেন না। ভেজাল হলেও, খানিকটা দুধ অবশ্যই চাই। এসব অভিযোগে আমাদের জড়াবার বৃথা চেষ্টা করে পণ্ডশ্রম করছেন।

সে তার সহকারিকে বলে, ওনার ড্রাইভারের ফাইলটা দাও।

বুঝি, একথা বলে সে আমাকে প্রচ্ছন্ন ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। আমিও বলি, হ্যাঁ, সেটা বের করুন। দেখি সে কি বলেছে?

কিন্তু সহকারি ফাইল খুঁজে পায় না। জানি তা পাবে না। এ ধরনের কোন ফাইল বা জবানবন্দির অস্তিত্ব নেই। আমাকে ধমকি দিয়ে কথা

www.pathagar.com

আদায়ের প্রচেষ্টা। বলি, কাহার সাহেব! আপনি যে দেশের সরকারের একজন কর্মচারী, সেই দেশের সরকারের আমি উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আমার সঙ্গে ইঁদুর-বিড়ালের খেলা খেলে লাভ নেই!

কিন্তু আপনি ১৫ই অগাস্টের পট পরিবর্তনের একজন সুবিধাভোগী ছিলেন এটা কী অস্বীকার করতে পারেন?

অবশ্যই অস্বীকার করি। সুবিধাভোগ দূরের কথা, আমার পদাবনতি হয়েছিল। পূর্বে দু'-দু'বার আমি চীফ হুইপ ছিলাম। মন্ত্রীদের সঙ্গে ছিল আমার প্রটোকল। রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া ছিল একজন হুইপ, আমার অন্যতম সহকারি। বঙ্গবন্ধু তাকে প্রতিমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আর মোশতাকের ক্যাবিনেটে চীফ হুইপের আসন থেকে সরিয়ে আমাকে আর দশ জনের সাথে একজন প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

তখন কেন প্রতিবাদ করেননি?

আবার পুরনো কথায় আসতে হয়। বলি, প্রতিবাদ করার জন্য সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। প্রাণে বাঁচলে পিতার নাম—কথাটা ভুলে যাবেন না। তখন অবস্থা তেমনই ছিল।

তারপর রাগে শরীর জর্জরিত হলে বলি, বেনিফিশিয়ারী আমি বা আমরা নই। আপনি এবং আপনারা। আপনাদের প্রমোশন হয়েছে। আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। সুবিধা হয়েছে হাসিনার। বঙ্গবন্ধু নিহত না হলে প্রধানমন্ত্রী হবার চিন্তা কল্পনায়ও কোনদিন আসত না। নাসিমের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হত না। হাসনাতকেও চীফ হুইফ হবার স্বপ্ন দেখতে হত না। বেনিফিশিয়ারী এরা, আমরা নই। লিখে নিন। সাহস থাকলে আমার প্রতিটি কথা কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করুন। আরও বলি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরপরই পুলিশের আইজিসহ তিন বাহিনী প্রধান এবং অন্যান্য যারা সকাল বেলাতেই সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের ডাকছেন না কেন? সন্ধ্যায় যারা শপথ নিল তাদের মধ্যেও সব বড়দের বাদ দিয়ে ছোট তিন জনকে নিয়ে এত কামড়া-কামড়ি কেন? উপ-রাষ্ট্রপতি হয়েছিল মোহাম্মদউল্লাহ। মোশতাকের পরই তার অবস্থান। সুবিধাভোগী তিনি, না আমরা? আবু সাঈদ চৌধুরীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছিল। সুবিধা হলে তাঁর হয়েছে। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে নতুন পদ সৃষ্টি করে চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ করা হয়েছিল, বেনিফিশিয়ারী তিনি। জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানীকে প্রেসিডেন্টের দেশরক্ষা উপদেষ্টা বানানো হল,

www.pathagar.com

তাঁর কথা বলছেন না কেন? নতুন দু'জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হল, তাদের কথাও বেমালুম ভুলে গেলেন! পক্ষান্তরে পদাবনতি হল আমার। সেই আমাকেই সুবিধাভোগীরূপে চালাবার চেষ্টা করছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত!

সে লজ্জা পেল কিনা জানি না। আমাকে আর কখনও ঘাঁটাবার চেষ্টা করেনি।

দ্বিতীয় দফা কোর্টে নেবার প্রাক্কালে চুপি চুপি আমার কক্ষে এসে বলে, স্যার, ভালো অ্যাডভোকেট দিয়ে মুভ করান, জামিন হয়ে যাবে।

বলি, ভালো করেই জানেন এখানে জামিনের কোন সম্ভাবনা নেই। এটা ওকালতির বিষয় নয়। আপনি জানেন সুপ্রীমকোর্ট বারের সভাপতি, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এবং এককালীন বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূইয়া এ পর্যায়ে আমার অ্যাডভোকেট। খন্দকার মাহাবুব উদ্দীনের মতো প্রথিতযশা আইনজ্ঞও আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আরও রয়েছে অসংখ্য প্রবীণ আইনজীবী। কিন্তু ঘটনা অন্যত্র। ক্ষমতাসীনদের রাগ বা বিরাগকে কেন্দ্র করে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান। তারা যতদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবে আমাদের রেহাই পাবার সুযোগ নেই।

আমার সেদিনের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। সকলেই মনের অভ্যন্তরে জানে আমরা নির্দোষ। জামিন প্রার্থনা করে আমাদের আইনজীবীগণ যখন সব অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করে তখন তারা বাকহীন হয়ে পড়ে। উচ্চতম আদালতের প্রধান বিচারপতি যেসব মন্তব্য করেন শুনলে আশান্বিত হয়ে উঠতে হয়। তিনি কটাক্ষ করেন, এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সাক্ষী কেবল জনা দুই খেদমতগার! তাও তারা শুধু বলে এদেরকে বঙ্গভবনে দেখেছে।

সরকারি কৌশুলিকে জিজ্ঞেস করেন, এই সাক্ষীর বলে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে?

আমাদের আত্মীয়স্বজন আশান্বিত হয়ে ওঠে। আইনজীবীরা উৎসাহিত। কিন্তু পরে দেখা যায় বিলম্বিত একটি গতানুগতিক রায়ে আমাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়েছে।

তাহের ঠাকুরের তথাকথিত স্বীকারোক্তিকে ভিত্তি করেই ওরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়াস পেয়েছে। তাকে তিনটি মামলায় অভিযুক্ত করে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হলে আমরা মনের ভাব প্রকাশ

www.pathagar.com

করতে দ্বিধা করি না। সে বলে, ভাই, আপনারা ভাবতে পারবেন না কী অকথ্য মানসিক যাতনার মধ্যে ওরা আমাকে রেখেছিল। বছরের পর বছর একটি সেলের মধ্যে অন্তরীণ রেখে ওরা আমার উপর যে নিপীড়ন চালায় তার ফলে আমি সে সময় কোন্ কোন্ কাগজে স্বাক্ষর করেছি ভালো করে উপলব্ধিতে আসেনি।

বলি, অন্তত আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে আমাদেরকে একটি খবর পাঠাতে পারতেন। আপনার স্বীকারোক্তি নিয়ে ওরা যে বসে নেই জানাতে পারতেন। আমরা যথাসময়ে আইনের আশ্রয় নিতে পারতাম।

এ কথার উপরে সে নিশ্চুপ হয়ে যায়। আমাদেরকে সামান্যতম সংবাদ না দেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাই না। কেউ কেউ সন্দেহ করে সরকারের সাহায্যকারীরূপেই সে এসব করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মতো অন্যান্য মামলায় তাকে রেহাই দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় সে এসব করতে সম্মত হয়েছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না। সে বলে, তার উপরে নির্যাতন-নিপীড়ন সর্বাধিক প্রয়োগ হয়েছে। আল্লাহ্ সব জানেন।

আমরা গ্রেপ্তার হবার পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা নিষ্পত্তি হয়। ঠাকুর রেহাই পায়। অন্য আসামিদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অতি উৎসাহী জজ সাহেব এই দেশের আইনের বিধানে না থাকার পরও দণ্ডপ্রাপ্তদেরকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যার আদেশ দেন। মামলাটি এখন উচ্চতর আদালতে বিবেচনাধীন রয়েছে।

এখানেও এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় হাইকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিদের পক্ষ থেকে আপিলও দায়ের করা হয়েছে। কোন না কোন বিচারপতি বিষয়টির শুনানিতে বিব্রত বোধ করছেন। বোধগম্য কারণেই সময় ক্ষেপণ হচ্ছে। সরকার আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তাদের শাসনকাল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা। আওয়ামী দুঃশাসনের রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। চারটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। বলা যায় না আগামী নির্বাচনের ফলাফল কী হবে! সেক্ষেত্রে সময়ে কাজটি সেরে নেওয়া প্রয়োজন। ওদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে না ঝুলান পর্যন্ত সরকার স্বস্তি পাচ্ছে না।

সরকারের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে আওয়ামী জোট সর্বত্র অবিলম্বে ফাঁসি কার্যকর করার জন্য আন্দোলনে নেমেছে। মিটিং, মিছিল, মানব বন্ধন,

www.pathagar.com

ফাঁসির মহড়া, অনশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালু হয়েছে। সবচাইতে অবাক কাণ্ড, সেদিন সরকারের বড় নেতারাও সদম্ভে লাঠি নিয়ে পল্টনে একত্রিত হয়েছে। লাঠি-মিছিল করে তারা সকল বিচারকদেরকে ভয় দেখাবার প্রচেষ্টা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রীও বিচারকদের বিরুদ্ধে এহেন ন্যক্কারজনক পদক্ষেপ গ্রহণে বিমুখ নয়। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে না।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসেও এ ধরনের নিম্নমানের হঠকারী আচরণ আর কোনদিন লক্ষ্য করা যায়নি। আইন তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাবে। দ্রুত ফললাভ করতে হলে তারও বিহিত আছে। কিন্তু বিচারকদেরকে লাঠির ভয় দেখান এবং তাও সরকারের উচ্চমহল থেকে! এটা কল্পনাও করা যায় না। অন্য কোন সভ্য দেশ হলে হয়ত সমগ্র বিচারকমণ্ডলী একযোগে পদত্যাগ করে এই হীন অবমাননার প্রতিবাদ করতেন। অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় ছাপোষা এইসব অসহায় মানুষেরা অব্যক্ত ক্রোধ দমন করে নিশ্চুপে সকল অপমান হজম করে যাওয়াই সুবিবেচনা প্রসূত বলে মনে করেন। সরকারের রুদ্ররূপকে তারা ভয় না করে পারেন না।

বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ আদালতে জেল হত্যা মামলার কার্যক্রম চালু হয়েছে। সেন্ট্রাল জেল সংলগ্ন লাল দালানটি একদিন রিজার্ভ কারারক্ষীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। তার দ্বিতলে ঢাকার মেট্রোপলিটন জজ সাহেব এখন এই মামলায় পৌরহিত্য করছেন। সরকার পক্ষে প্রায় আধ ডজন আইনজীবী। সিরাজুল হক সাহেব প্রধান প্রসিকিউটার। এই মামলার অন্যতম প্রসিকিউশন ল'ইয়ার রমজান আলী সেদিন ইন্তেকাল করেছে। অন্যতম সাক্ষী মোহাম্মদউল্লাহও পরলোক গমন করেছেন। বার দু'য়েক জজ বদল হয়েছে। কিন্তু মামলার অগ্রগতি সেভাবে সাধিত হতে পারছে না।

ট্রায়ালকোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টে আমার আজীবন সহকর্মী এবং বন্ধু প্রবীণ আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেনকে দায়িত্ব অর্পণ করেছি। একসময় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব হোসেন একজন ঝানু আইনজ্ঞ। সে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির পক্ষে। সহকারী হিসাবে নিয়েছে আমাদেরই এককালীন কর্মী তরুণ এডভোকেট হুমায়ুন কবির মঞ্জুকে।

www.pathagar.com

তার বক্তব্য, এর মধ্যে আপনাদের বিরুদ্ধে কিছুই নেই। শীঘ্র বিচারের মাধ্যমে শেষ হওয়াই শ্রেয়। এরা কোন অবস্থাতেই আপনাদের জামিন দেবে না। সেক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতায় না গিয়ে বিচারকার্য সমাপনই বিবেচনা প্রসূত।

তার উপর আমার আস্থা দৃঢ়। দ্বিমত পোষণের প্রশ্ন ওঠে না। ট্রায়ালকোর্টে মঞ্জুর ও ওবায়েদের আইনজীবী বরিশালের আবদুল মজিদ মুন্সী বিভিন্ন পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশ্নে উচ্চতর আদালতের আশ্রয় নেওয়ার পক্ষপাতী হলেও খন্দকার মাহবুব হোসেন সম্মত হয় না। তার দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। তার মতে এসবে অনেক সময় ক্ষেপণ হবে। জামিনে থেকে এসব পদক্ষেপ নেওয়া সুবিধাজনক। অন্তরীণাবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা নিদারুণ দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দু'দিকের বক্তব্যেই যথেষ্ট সারবত্তা আছে। একজন আইনজীবী হিসাবে উপলব্ধি করি যেসব বিচ্যুতি এই মামলায় ধরা পরেছে তা নিয়ে বিচারের প্রহসন চলে, সত্যিকারের ন্যায়বিচার হয়ত সম্ভব নয়।

মামলা একটা করতে হবে এবং সেই মামলায় আমাদেরকে জড়াতে হবে এই দুটি স্থির সিদ্ধান্ত থেকেই সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। দু'যুগের ঊর্ধ্বকাল অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এমন একটি মোক্ষম সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় তদন্তকার্য সমাধা করে কাহার আখন্দ হাত পাকিয়েছে। সে সরকারের অতীব বিশ্বস্ত এবং প্রিয়ভাজন। ব্লু আইড্ বয়। যখন তখন খোদ প্রধানমন্ত্রী তার সাথে বাতচিত করে। তাকে আর পায় কে! অহমিকায় মাটিতে পা পড়ে না। ভাবটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ্ দি প্রাইস্ অব দিস্ ড্যাম ওরালর্ড্? আই শ্যাল পারচেজ ইট। দুনিয়াটার মূল্য কত? আমি এটা ক্রয় করব। ধরাকে সরা জ্ঞান করা তার কাছে কিছুই নয়।

জেল হত্যার বিচার আমরাও চাই। চিরদিন চেয়ে এসেছি। এর চাইতে নিষ্ঠুর, নারকীয় ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড আর হতে পারে না। সভ্যতার ইতিহাস এ ধরনের নির্মমতার নজির নেই। মানুষ মানুষকে চিরদিনই হত্যা করে আসছে। সৃষ্টির আদি থেকে তার সূত্রপাত। আদি পিতা আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র হাবিল-কাবিলের ঘটনা অবিদিত নয়। সেই মুহূর্তে বিশ্বে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ছ' জন। আদম (আঃ), তার স্ত্রী, দু'পুত্র ও দু'কন্যা। সুন্দরী ভগিনীকে করায়ত্ব করার প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সেই প্রথম রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

একটি কাক এসে ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখিয়ে দিয়ে যায় কি করে কাবিল তার সহোদরের লাশ সমাহিত করবে। কবর দেওয়ার পদ্ধতি সেই থেকে চালু হয়।

কিন্তু জেলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারাগার প্রস্তুতই হয়েছে মানুষকে নিরাপদে আটক রাখার জন্য। কাউকে অন্তরীণ করা হয় অন্য অপরাধ থেকে বিরত রাখার অভিপ্রায়ে। এবং কখনও কৃত অপরাধের সুষ্ঠ বিচারের প্রত্যাশায়। সেখানে যদি অস্ত্রধারীরা প্রবেশ করে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার সুযোগ পায় তা হলে মানুষ নিরাপত্তা কোথায় খুঁজে পাবে!

জেলখানার অভ্যন্তরেও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সকলকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় একই উদ্দেশ্যে। সেই কারা অভ্যন্তরের নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে আততায়ীরা ভিতরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড সমাধা করে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করবে এটা কোন সুস্থ মানুষই মেনে নিতে পারে না।

শুনেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যারা জেলখানা কখনও একবারও পরিদর্শন করেছে তারা সাক্ষ্য দেবে কি কঠোর বিধি-বিধান সেখানে পালিত হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও অনুগ্রহ ব্যতীত একটি প্রাণীও সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। চারদিকে চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান। ভিতরে প্রবেশের একমাত্র ফটকটি ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে কারো ঢোকার উপায় নেই। সেখানে স্তরে স্তরে তল্লাসী, সাবধানতা ও বিধি নিষেধের বেড়াজাল। সশস্ত্র প্রহরীদের অনুক্ষণ সজাগ দৃষ্টি। গেটের বাইরে কয়েক শত অস্ত্রধারী রিজার্ভ ফোর্সের সার্বক্ষণিক অবস্থান। যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে পারে। জেলখানার পাগলা ঘণ্টির কথা কারো অজানা নয়। মাত্র একটি বোতাম টিপে দিলে মুহূর্তের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়। কেউ পালাবার পথ পায় না। কারাগার সংলগ্ন লালবাগ থানা থেকেও অবিলম্বে সাহায্য চলে আসে।

এমনি সতর্ক প্রহরা এবং শত বিধি যেখানে বিদ্যমান সেখানে জনা চারেক সামরিক ব্যক্তি এসে নির্বিবাদে ভিতরে প্রবেশ করে চার জন জাতীয় নেতাকে হত্যা করে চলে গেল এটা কল্পনা করলেও দুঃখ-কষ্টে মন ছেয়ে ওঠে। রাগ ও ঘৃণায় অন্তর জ্বলে ওঠে। বিষয়টা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। জেলের সমস্ত কর্তৃপক্ষ, প্রতিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও

www.pathagar.com

কর্মচারী এবং প্রহরারত রক্ষীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সহায়তা ব্যতিরেকে এটা একেবারেই অসম্ভব।

ঘাতকরা শুধু ভিতরেই প্রবেশ করে না, কারারক্ষী ও কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট হয়ে তারা অকুস্থলে গিয়ে ওয়ার্ডের তালা খুলিয়ে, সেলের লকআপ খুলিয়ে নেতাদের একত্র করে ওদের চোখের সামনেই নির্দয়ভাবে ব্রাশ ফায়ার করে এবং পরে দ্বিতীয় দফায় বেয়ানট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। যারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, দরজা খুলে দিয়েছে, লকআপ খুলে তাদেরকে একঘরে জড়ো করেছে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পাশবিক হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছে তারা কোন অবস্থাতেই কম দোষী হতে পারে না। তাদের রেহাই পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যরা এদেশের বহু মহিলার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু যারা তাদের পথ দেখিয়ে মা-বোনদের বিছানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তারা কোনক্রমেই কম দোষী নয়। রাজাকার, আলবদর, কোলাবরেটার এবং শান্তি কমিটির সেইসব নরপশুদের শাস্তি ওই হানাদারদের চাইতে কম হওয়ার কোন কারণ নেই।

কাজেই, বাইরের ওই ক'টি লোকই কেবল ঘাতক হতে পারে না। সেই সময়ের সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সকল পর্যায়ের প্রহরী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই অভিযুক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। জেল হত্যার বিচার ওদের কাম্য নয়। উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে ন্যস্ত করে জাতক্রোধ নিবারণই ওদের উদ্দেশ্য। তা না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কমন আসামিদেরকে বাদ দিলে আমরা তিন জন ব্যতিরেকে আর কেউ এই মামলায় অভিযুক্ত নয় কেন?

আইজি, ডিআইজি, জেলর, ডেপুটি জেলর, সার্জেন্ট, সুবেদার, জমাদার, দাররক্ষী এবং প্রহরী যারাই সে সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা সরাসরি অভিযুক্ত হবে না কেন?

পত্রপত্রিকা পড়ে, দেশ-বিদেশের লেখকদের গবেষণামূলক রচনা পাঠ করে এবং বিভিন্ন স্বীকৃত জনশ্রুতি বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত তথ্য গোচরে আসে তাতে এ কথা বলা চলে, ট্যাঙ্কবাহিনী তথা ১৫ই অগাস্টের ঘটনার নায়কদের সঙ্গে বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের দলের সংঘাতের কালে অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের ডামাডোলে কোথাও

www.pathagar.com

একটি জরুরি পরিকল্পনা করা ছিল, আকস্মিকভাবে জেলখানায় প্রবেশ করে জাতীয় নেতাদের খতম করে ফেলতে হবে। এতে খন্দকার মোশতাকের সম্মতি ছিল কিনা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সবকিছুই যে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও দৃষ্টিতে এনে করতে হবে এমন পরিস্থিতিও তখন বিরাজ করছিল না। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অ্যান্থনী ম্যাসকার্ণেহাস তাঁর রচিত 'লিগেসি অব ব্লাড' পুস্তকে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, সে সময়ের সরকার প্রধানের অনুমোদন ব্যতিরেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনা পড়ে এটাও প্রতীয়মান হয়, দু'যুদ্ধমান গ্রুপের টানাপোড়েনে সে সময় প্রকৃতার্থে তেমন কোন শক্তিশালী সরকারের কাঠামো কাজ করছিল না। ক্ষমতা দখল বা তাতে বহাল থাকার প্রতিযোগিতায়, ট্যাঙ্ক-কামান আর বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় ছিল না। নামকা ওয়াস্তে সিভিলিয়ন প্রেসিডেন্ট থাকলেও চারদিকে উর্দীওয়ালাদেরই দৌরাত্ম চলছিল।

তবুও বলব, আজ আমরাও নিঃসন্দেহ নই এই ঘটনায় সেদিন মোশতাকের সম্মতি ছিল কিনা। কোন নরাধম অর্বাচীনের তাৎক্ষণিক পরিকল্পনায় তার অনুমতি থাকা বিচিত্র নয়। মানুষ অনেক সময় এমন কাণ্ড করে বসে, সুস্থ মস্তিষ্কে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যেটা কল্পনাও করা যায় না। অবশ্য হার্ডকোর ক্রিমিন্যালরা সুপরিকল্পিতভাবেও অনেক হীনতম অপরাধ ঘটাতে পারে। মোশতাকের তখন মরিয়া অবস্থা। পাল্টা অভ্যুত্থানে আসন্ন পরাজয়ের মুখে তিনি নাকি খালেদ মোশাররফকে অনুরোধ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁকেও বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু খালেদ মোশাররফের সেই মুহূর্তের ব্লুপ্রিন্টে মোশতাক প্রেসিডেন্ট থেকে তাকে সেনা প্রধান করলে তার অভিষ্ট সিদ্ধ হয় বলে সে সম্মত হয়নি। ওরা বিদেশে প্রেরিত হয়। সহায়হীন মোশতাক ভঙ্গভবনে খালেদের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কুচক্রীদের ফর্মূলা অনুযায়ীই যদি রিসালাদার মোসলেম কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি নিয়ে জেল গেটে প্রবেশের চেষ্টা করে তা হলেও কী জেল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে অস্ত্রসহ রাতের শেষ প্রহরে হত্যা করার সুযোগ দানের জন্য সেখানে প্রবেশ করতে দেবে! সুস্পষ্ট আইন রয়েছে অস্ত্র নিয়ে কেউ ভিতরে যেতে পারে না। রাতের বেলা কখনওই নয়। তারপরও কেউ অনুমতি দিলেই কি অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায়!

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি যদি আগুন লাগিয়ে পুরো জেলখানা পুড়িয়ে দিতে বলে ডিআইজি আউয়াল সাহেব কী সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করে ধন্য হবেন! তার উপরে কি এ কাজের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না?

সে কোন অবস্থাতেই রাত্রির সেই প্রহরে জেলগেটে আসতে পারে না, যদি না সে ঘাতকদের একজন সাহায্যকারী হয়। তাকে নিশ্চয়ই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তার দায়িত্ব ছিল প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করা। প্রয়োজনে আইজিকে নিয়ে যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

প্রেসিডেন্ট অনেক দূরের ব্যক্তি, সে হোম মিনিস্টার বা হোম সেক্রেটারিকেও ফোন করতে পারে না। প্রয়োজনে আইজি স্বরাষ্ট্র সচিবকে যোগাযোগ করবে এবং বিহিত ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু চিত্রনাট্যের এই অংশে আমরা দেখতে পাই রিসালাদার মোসলেমের সঙ্গে প্রথম দফায় আরও চার জন সশস্ত্র সৈনিক জেল গেটে এসে ভিতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। তাদেরকে প্রথমে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। খবর পেয়ে আইজি ও ডিআইজি জেল গেটে চলে আসে।

তারা সরাসরি বঙ্গভবনে টেলিফোন করে। কথাটা কোন বিচারেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। কিছু ঘাতককে অস্ত্রসহ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন এটা যেমন হাস্যাস্পদ ব্যাপার, তেমনি কষ্টকল্পিত। কোনও বেআইনি আদেশ পালন করতে কেউ বাধ্য নয়। তেমনি একটি চরম বেআইনি অনুমতি সংগ্রহের জন্য তাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অবাক করার মতো। পুরো প্রচেষ্টাই নিদারুণ বেআইনি ও বিধি বহির্ভূত। দায়িত্ব এড়াবার কোন উপায় নেই।

কোন দিনই, কোন উপলক্ষেই জেলখানার একজন আইজি বা ডিআইজি কখনও রাষ্ট্রপতিকে ফোন করতে পারে না। সে তার সঙ্গে ফোনে অহরহ আলোচনা করে অভ্যস্ত নয়। তার কণ্ঠস্বর চেনার কথা নয়। সেই নাজুক পরিস্থিতির মাঝে কে টেলিফোন ধরল বা কে নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে কথা বলল সেসব সুনির্দিষ্ট করে বলার কোন সুযোগ নেই।

টেলিফোন নাকি মেজর রশীদ ধরে। সে-ই নাকি প্রথম কথা বলে। তবুও যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি ফোন রিসিভ করে এবং তার প্রার্থনার জবাবে একটা জঘন্যতম অবৈধ আদেশ প্রদান করে তারা সেটা পালন করতে বাধ্য নয়।

www.pathagar.com

ঘটনার বিবরণে এ পর্যায়ে দেখা যায় তারা কারাগারের দ্বার-রক্ষীদের দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। মাত্র পাঁচ জন লোক। যতই অস্ত্র সজ্জিত হোক না কেন, কারাগারের দু'গেটের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে তাদের নিজস্ব বাহিনী বা প্রয়োজনে রিজার্ভ বাহিনী তলব করে ওদেরকে নিরস্ত্র করা মোটেই অসাধ্য ছিল না। অথবা প্রবেশের পূর্বেই ওদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যেত। তা না করে তারা দলবল নিয়ে ওদেরকে অকুস্থলে নিয়ে যায় এবং এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। কেউ হয়ত ওদেরকে কার্য সমাধা করার জন্য প্রেরণ করে কার্যালয়ে অপেক্ষা করে। যেটাই করা হয়ে থাকুক, এর চাইতে বড় অপরাধ আর হতে পারে না। নিজ হাতে খুন করার চাইতে সেটা কম গুরুতর নয়। দুনিয়ার কোন আইন বা যুক্তির অজুহাতেই আইজি, ডিআইজি এবং অন্যান্য জেল কর্মকর্তাকে রেহাই দেয়া যায় না।

কিন্তু কাহার আখন্দ দিয়েছে! আওয়ামী সরকার দিয়েছে! কারাগারের উল্লেখিত কর্মীদের সহায়তা ব্যতীত বাইরের ঘাতকরা কোন অবস্থাতেই নতুন জেলের সে স্থানটিতে পৌঁছতে পারত না যেখানে নেতৃবৃন্দকে রাখা হয়েছিল। তারাই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ওয়ার্ডের ফটকের তালা খুলে ওদেরকে সেখানে প্রবেশ করায়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন সাহেব যে কক্ষে ছিলেন তার তালা খুলে ঘাতকরা সেখানে প্রবেশ করে। মনসুর আলী সাহেব এবং জনাব কামরুজ্জামান অন্য ঘরে ছিলেন। তাদের দু'জনকে প্রথম কক্ষে আনা হয়। দ্বিতীয় কক্ষটি খুলে দেওয়ার কাজটিও কারাগারের কর্মীরাই করেছে। দু'নেতাকে অন্য ঘরে তারাই নিয়ে এসেছে।

গ্রেপ্তার করে যখন মনসুর ভাইকে এখানে আনা হয়েছিল তিনি নাকি সেগুলোর নির্মাণ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে এ ধরনের সেল বানাবার আদেশ দিয়েছিল?

জেলের কর্মচারীরা জানিয়েছিল, স্যার, আপনার আদেশ এবং অনুমত্যানুসারেই এসব নির্মিত হয়েছে।

মনসুর ভাই আর মুখ খোলেননি।

সেই সেলের অভ্যন্তরেই আজ তাঁকে সব ঋণ শোধ করে চলে যেতে হয়। শোনা যায়, ঘাতকদের প্রথম ব্রাশ ফায়ারেই চার নেতা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিন জন তাৎক্ষণিক প্রাণ হারায়। কিন্তু তাজউদ্দীন সাহেব নাকি তখনও বেঁচে ছিলেন। গুলি খেয়ে তখনও এক ফোঁটা পানির জন্য

www.pathagar.com

আর্তনাদ করছিলেন। পানি দেওয়া তো দূরের কথা, ঘাতকের দল নিরাপদে চলে যাওয়ার পর জেলের লোকেরা রুমটিকে ভালো করে তালাবদ্ধ করে রেখে চাবি বগলদাবা করে গেটে প্রত্যাবর্তন করে। তালাবদ্ধ করার কাজটিতে কারাগারের কর্মীরা সব সময়ই অনাবিল আনন্দ লাভ করে থাকে।

তাজউদ্দীন সাহেব কী পরিস্থিতি পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পেরেছিলেন! তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। ঘটনার অব্যাবহিত পূর্বে স্ত্রীর নিকট নাকি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেন কিনা! স্বাধীনতার প্রধান স্থপতিগণ তাদের স্বাধীন করা দেশের কারাগারে তাদেরই গড়া সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের বাস্তবতায় প্রবেশ না করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্রোধ চরিতার্থ করার মানসে প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত না করে নিরপরাধীদের হয়রানির অপরাধে ওদের বিচার হবে কবে?

শোনা যায় প্রথম বার মোসলেম ও অন্য চার জন এসে এ কাজ সমাধা করে যায়। বাইরে গিয়ে হয়ত তাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়, কেউ আহতাবস্থায় বেঁচেও যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এ. আলীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফায় আরও তিন জন সশস্ত্র লোক পুনরায় জেলে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিতীয় দফায় ঘাতকদের ভিতরে প্রবেশ করতে কোনই বেগ পেতে হয় না। এবার আর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য টেলিফোন করার প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করে না। প্রথম দল কাজ করে গেছে, কিছু অবশিষ্ট থাকলে দ্বিতীয় দল তা সম্পূর্ণ করবে। স্বাগত জানিয়ে আইজি, ডিআইজির দল তাদেরকে ভেতরে নিয়ে যায়। পূর্বের মতো তাদেরকে অকুস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘর খুলে দিলে তারা বেয়নেট দ্বারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নেতাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। কাজ শেষে তারা আবার বীরদর্পে প্রত্যাবর্তন করে। সকলেই তাদেরকে সহযোগিতা করে। দ্বিতীয়বার কাজ আরও সহজসাধ্য হয়। আজ জানার উপায় নেই, তারা চার জনই সেদিন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন নাকি পরে বেয়নেটের খোঁচায় তাদের প্রাণত্যাগ ঘটে। সঠিক বিচার হলে একদিন এসব সূর্যালোকের মতো পরিস্ফুট হবে। তাদের হিসাব মতেই প্রথম পাঁচ জন এবং দ্বিতীয়বারে চার জন—এই মোট নয় জন সশস্ত্র ব্যক্তি কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে।

কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, এই নয় জন ঘাতকের মধ্যে মাত্র

www.pathagar.com

একজন আজ এই মামলায় আসামি। বাকি আট জনের সম্বন্ধে সরকার নিশ্চুপ! এই মারাত্মক বিচ্যুতির বিচার করবে কে? কবে সত্যিকারের সত্য উদ্ঘাটিত হবে? তথ্য প্রতিমন্ত্রী বই লিখে বলেছেন, জিয়াউর রহমানের আমলে অভিযুক্ত মোসলেমের ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু এই মামলায় সে একজন চার্জশীট প্রাপ্ত আসামি। এটা কি তদন্ত কর্মকর্তার গোঁজামিল, না বিভ্রান্ত আওয়ামী তথ্য প্রতিমন্ত্রী পরিবেশিত তথ্যেই গড়মিল!

জেলখানায় প্রবেশদ্বারে যে কেউ প্রবেশ করুক তার নাম-ধাম লিখে রাখা হয়। বহুল পরিচিত কাজের লোকজনও ভিতরে প্রবেশ করতে হলে দুই গেটের অভ্যন্তরে তাদের নাম লিখিয়ে যেতে হয়। হাতে ছাপ দেওয়া হয়। রিসালাদার মোসলেম যেক্ষেত্রে স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে সেক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে অন্যরাও তাদের পরিচয় গোপন করেনি। তারা সকলে এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত হবে এটাই বাস্তবতা। কিন্তু তা হয় না। এজাহারে তাদের নাম নেই! কে দেবে এর জবাব?

আজ এজাহারের মূল দলিলটি নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। ঘটনার একদিন পর ৪ঠা নভেম্বর ডিআইজি কে এ. আউয়াল লালবাগ থানায় যে লিখিত এজাহার করে তাতে অন্য কারো নাম উল্লেখ করে না। কেন? কেন?

নিজেদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করবে না এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মোসলেম ও এ. আলী সহ তাদের সহযাত্রী ঘাতকদের নাম গোপন করে যাওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কারোই বোধগম্য হয় না।

দায়রা জজ জনাব রেজোয়ান আলীর চোখেও বিষয়টি বিসদৃশ্য ঠেকে। তিনি প্রসিকিউশনের কাছে জানতে চান, এ. আলীর উল্লেখ পুলিশ ডাইরী ও চার্জশিটে রয়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চুপ কেন?

তারা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে না। কেউ বলে ওটা এ. আলী হবে না, এম. আলী হবে। এবং এই এম. আলী বা মারফত আলীরও নাকি পরে জিয়ার আমলে ফাঁসি হয়েছে। সত্য-মিথ্যা কিছুই জানার উপায় নেই। কাহার আখন্দ এ বিষয়ে কোন তদন্ত করেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। জজ সাহেব সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি এ সম্বন্ধে পুনঃতদন্তের আদেশ দেন।

www.pathagar.com

বিষয়টি গোড়াতেই ভ্রান্ত হয়ে গেল বলে আমাদের ধারণা জন্মে। জজ সাহেব এ পর্যায়ে প্রয়োজনে কেসটি নিম্ন কোর্টে ফেরত অর্থাৎ 'সেন্ট ডাউন' করতে পারেন। কিন্তু পুনঃতদন্তের আদেশ তার এখতিয়ার বহির্ভূত। স্বভাবতই বিষয়টি হাইকোর্টে উত্থাপিত হলে হাইকোর্ট প্রথম শুনানির দিনই এই পুনঃতদন্তের আদেশ রহিত করে দেয়। এক্ষেত্রে মামলায় এ. আলী বিষয়ক জটিলতা এখনও সেভাবেই রহস্যাবৃত। এসব বিষয়ে সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের একমাত্র চিন্তা কি করে, কত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়!

কাগজে পড়লাম, এই মামলার জন্য স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠনের পায়তারা চলছে। ইত্যবসরে অসহিষ্ণু সরকার জনাব রেজোয়ান আলীকে বদলি করে জনাব আহমেদ জামিল চৌধুরীকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদলতে দু'বার জামিনের আবেদনে হাবিবুল ইসলাম ভূইয়া, খন্দকার মাহবুব উদ্দীন প্রমুখেরা অনেক অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই দেশ গঠনে আমাদের অবদান, সমাজে আমাদের অবস্থান, বয়সজনিত রোগাবলীর উল্লেখ করে যে কোন শর্তে জামিনের প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করা হয় না। রিমান্ডের পর্ব শেষ হলে আমাদেরকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়। আদালত আমাদেরকে প্রথম শ্রেণী প্রদানের নির্দেশ দিলেও সই-সিলমোহরযুক্ত আদেশ না পৌছান পর্যন্ত চার দিন আমাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর মতো সাত সেলে তিন কম্বল-সম্বল করে ফেলে রাখা হয়। সাধারণ হাজতীদের খাবার পরিবেশন করা হয়। ছাত্রজীবনের কলেজের গণ্ডি থেকে যখনই জেলে এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু আওয়ামী শাসনামলে সাবেক প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রীকেও চার দিন পর্যন্ত মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই একদিন ঘটবে। সে দিনটি দেখার প্রত্যাশায় আছি।

জজ সাহেবের আদালতে অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন জামিন মুভ করে। আমার জীবনভর সংগ্রাম ও অবদানের উল্লেখ করে এই মামলার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তীক্ষ্ণ যুক্তির বেড়াজালে তার আবেদন পেশ করে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আমার দু'সতীর্থেরও জামিন বার বার মুভ করা হয়। কিন্তু ফলাফল একই। অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান, এম,পি, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের জামিনের পক্ষে ওকালতি করে। ছাত্রজীবন থেকে তার সাথে বন্ধুত্ব। একসঙ্গে মন্ত্রিত্ব করেছি। সেও অনেক আবেদন-নিবেদন করে।

www.pathagar.com

শ্রেণীপ্রাপ্ত হওয়ার পর সাত সেল থেকে আমাদেরকে ছাব্বিশ সেলে আনা হয়। সেদিনের ছাব্বিশ সেল আর নেই। অবস্থার অনেক অধোগতি হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে সেলে টিকা দায়। সেলের পিছন দিয়ে সারা জেলের ময়লা নিষ্কাসণের খোলা ড্রেন। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। সেলের চাপা পরিবেশের মধ্যে গ্রীষ্মের প্রখরতা সহ্য করতে না পেরে রাতে পানির কল ছেড়ে তার নিচে দাঁড়িয়ে থাকি।

অসহ্য হওয়াতে একদিন কোর্টে নিজেই উঠে দাঁড়ালাম। জজ সাহেবের অনুমতি নিয়ে টেবিল ফ্যান ব্যবহারের অনুমতি চাইলাম। বললাম, কোরবানীর পশুটিকেও গলায় মালা পড়িয়ে ঘরে আনা হয়। খাইয়ে-দাইয়ে তাকে কোরবানীর জন্যই বাঁচিয়ে রাখা হয়। আমাদেরকে জেল-ফাঁসি দিতে হলে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জেলখানায় ফ্যান দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। জজ সাহেব অনুমতি দিলেও কারাকর্তৃপক্ষ সরকারের সহায়তায় বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখে। পরবর্তী গ্রীষ্মে আমাদের আইনজীবী আদালতের আদেশ অমান্যের প্রশ্ন উত্থাপন করায় জজ সাহেবের টনক নড়ে। সিনিয়ার পিপির মাধ্যমে তিনি বিষয়টি সুরাহা করেন। আমরা বছরান্তে ফ্যান পাই।

ট্রায়ালকোর্টে সুবিধা করতে না পেরে আমাদের আইনজীবীরা হাইকোর্টের স্মরণাপন্ন হয়। তাদের ধারণা, যদি সামান্যতম বিচার-বিবেচনার সুযোগ থাকে তা হলে এক্ষেত্রে জামিন না হয়ে পারে না। আমাদের আইনজীবীদের যুক্তি-তর্কের কাছে সরকার পক্ষ দাঁড়াতে পারে না। তারা কেবল জেল হত্যার নির্মম কাহিনীই বার বার জোর দিয়ে বয়ান করে। আমাদের পক্ষ থেকে সে কাহিনী সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করা হয় না। কিন্তু আমাদের তিন জনকে যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে। তাদের যুক্তি-তর্ক শুনে যে কেউ অনুধাবন করবে আমাদের জামিন না হয়ে পারে না।

কিন্তু দেখা গেল সাত-পাঁচ গেয়ে শেষ পর্যন্ত জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। কোর্ট আমাদেরকে চিকিৎসার জন্য পিজি হাসপাতালের প্রিজন সেলে প্রেরণের আদেশ দিয়েছে। সেই যে কথায় আছে, 'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল, আনিয়া দিল আধখানা বেল।' ঘটনা প্রায় সে রকম।

www.pathagar.com

ছাব্বিশ সেলে কিছুটা হাঁটা-চলাফেরার স্থান আছে। কাজের ফালতু আছে। এই বয়সে নিজেদের কাজ নিজেরা করা আর সম্ভব নয়। তবুও হাসপাতালের স্বল্প পরিসরে বহুধা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদেরকে পাঁচটি মাস সেখানে কাটিয়ে আসতে হয়। তারপর সরকারের সন্তুষ্টিমতে আমরা একদিন সুস্থ হয়ে উঠি এবং পুনরায় জেলের অভ্যন্তরে ছাব্বিশ সেলে ফিরে আসি।

আমাদের অসুখ-বিসুখও দারুণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। একসাথে তিন জন অসুস্থ হলাম। আবার এক সুপ্রভাতে তিন জনই একসাথে সুস্থ হয়ে উঠলাম। 'কত রঙ্গ জান রে যাদু! কত রঙ্গ জান!'

আমার আইনজিবী জামিনের বিষয়টি নিয়ে সুপ্রীমকোর্টে আর যায় না। কিন্তু এদের দু'জনের আইনজীবীগণ যায় এবং যথাসময়ে একই ফল লাভ করে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে। এদের পক্ষ থেকে মামলার বহুধা ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করে রিভিশনের দরখাস্ত করা হয়। হাইকোর্ট কিছু মন্তব্য করে দরখাস্ত বাতিল করে। উচ্চতম আদালতেও ফল লাভ হয় না। সর্বত্র একটা জুজুর ভয় বিরাজ করছে।

এই একটি বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাফল্য লাভ করেছে। দলীয়করণের পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থাকে প্রায় নস্যাৎ করে এনেছে বলে অভিযোগ শুনা যায়। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ম্যাজিস্ট্রেট, জজ বা বিচারপতিদেরকে সাপের পাঁচ পা দেখিয়েছে। দেশের কোন কোর্ট-কাচারিই আর সেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়-নীতির সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছে না। একসময় শেখ সাহেবের আমলেও এ ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল। কোর্ট-কাচারিতে চিহ্নিত অপরাধীদের জামিন হওয়াকে কেন্দ্র করে তিনিও অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠতেন, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের বাড়িতে ডাকাতি হলে বা তাদের পরিবারের সদস্যরা ছিনতাইয়ের কবলে পড়লে ওদের বোধোদয় হবে। কিছু দুষ্কৃতিকারী লেলিয়ে দিলে কেমন হয়?

আমরা মন্তব্য করতাম না। জানি, এটা তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় নয়।

কিন্তু কন্যার রাজত্বে ওরা তা করে দেখিয়ে দেয়। বিকল্প ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদের অভিযান নেওয়া হলে ছিন্নমূল মানুষেরা সংঘবদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে আইনের আশ্রয় নেয়। হাইকোর্ট বস্তি উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ দেয়। উন্নাসিক-অসহিষ্ণু সরকার কিছু বস্তিবাসীকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বাসভবনে পাঠিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হাইকোর্ট কেন আদেশ দিল এটা তার অপরাধ। অ্যাডভোকেট কেন তাদের হয়ে আবেদন পেশ করল এটা তার অপরাধ।

জাতীয় পার্টির আমলে উপজেলায় কোর্ট-কাচারি প্রবর্তনের ফলে এবং ঢাকার বাইরে কয়েকটি হাইকোর্ট স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় উপস্থিত করার যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল তার ফলে ঢাকা ভিত্তিক আইনজীবী এবং বিচারপতিগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আইনজীবীগণ সরাসরি আন্দোলনে নামে। বিচারকগণ পরোক্ষভাবে সরকার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে গভর্নমেন্টকে নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিলেন। বিএনপি'র সময়েও কোর্ট-কাচারিতে হস্তক্ষেপ করা হত। তবুও জনসাধারণ কিছু কিছু অধিকার ভোগ করত। কিন্তু এই আমলে বিচার ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। নিজেদের পছন্দ মতো বিচারপতি নিয়োগ, দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিরও এই সম্মানিত পদলাভ, দলীয় আনুগত্য ও বিশেষ সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়াটা যোগ্যতার মাপকাঠি প্রভৃত পদক্ষেপে বিচার ব্যবস্থায় অনেকটাই আওয়ামীকরণ করা হয়েছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের চিন্তা-ভাবনা যাতে পরিত্যাগ করে সেজন্য তাদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে খোদ মন্ত্রীরা লাঠি-মিছিলে শরিক হচ্ছে। কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করে নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা বিচারাধীন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার পূর্বেই অনতিবিলম্বে রায় কার্যকরী করার জোর দাবি জানিয়ে চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিদিন নানা বেআইনি কর্মসূচী পালন করছে। বলার কেউ নেই, তারাই অভিযোগকারী, তারাই চূড়ান্ত রায়ের মালিক এবং তারাই রায় কার্যকরী করার অধিকর্তা। এদিক-সেদিক করার পথ নেই। শক্ত লাঠিই শক্তি।

ওরা দমে দমে বলে যাচ্ছে বিরোধী দলগুলো বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাঁচাবার জন্য আন্দোলনে নেমেছে। তারা সরকারে রয়েছে। শত ব্যর্থতা, দেশময় অরাজকতা আর সীমাহীন দুর্নীতির ফলে সমাজ ব্যবস্থা যেখানে ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বাঁচাবার প্রচেষ্টা আবিষ্কার করে ওরা ধূম্রজাল সৃষ্টি

www.pathagar.com

করছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা শুরু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন দলনেতা দূরের কথা, একটি মানুষকেও শুনিনি এই বিচার কার্যের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করতে। একটি মানুষও মুখ ফুটে বলেনি, এই খুনীদের মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারিত হলেই তার মধ্যে হত্যাকারীদের বাঁচাবার প্রয়াস দেখতে পাচ্ছে। তাদের এই কাল্পনিক ভীতি মাত্র একটি কারণেই অনুমান করা যায়। নাজুক পরিস্থিতির আড়ালে ওরা আত্মগোপনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছে।

কথায় কথায় ঢালাওভাবে এই অভিযোগ অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে। বিরোধী দল থেকে এর সমুচিত জবাব দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা উচিত। তারা দেখিয়ে দিক, কোন্ দল বা কোন নেতা কবে কোন্ সভায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বাঁচাবার কথা বলেছে বা কোথায় কোন্ সমাবেশে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মিথ্যা এই অভিযোগের বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। তবুও ওদের ছোট-বড় সকলের মুখে একইভাবে খৈ ফুটছে। ওরা ভাবে, বার বার উচ্চারিত মিথ্যা, এক সময় সত্য বলে ভ্রম হবে। উপায় কী! নিজেদের সংখ্যাতীত ব্যর্থতার মুখে আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা, এই ফর্মূলায় ওরা আগ বাড়িয়ে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে গাত্রদাহ উপশমের প্রয়াস পাচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দেশে চরম হতাশা ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজমান। সর্বত্র দলীয়করণ নগ্নভাবে প্রতিফলিত। সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে আওয়ামী পাদুর্ভাব সমভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থাসমূহে সমমনা লোকদের স্থাপনা করার হিড়িক পড়েছে। পূর্বের সরকারগুলো অন্তত বিচারবিভাগে এ ধরনের হস্তক্ষেপ করেনি। এরা সেখানেও তাদের প্রভাব বিস্তারের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিচারপতির পদে নিয়োগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আওয়ামী আমল যেন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য পোয়া বারো। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম বাহাত্তর হাত কালীমূর্তি তৈরি হয়েছে। এটাও একটা বিশ্ব রেকর্ড। আওয়ামী আমলের বাহাদুরি আছে।

পুলিশ বিভাগে ক্রমাগত রদবদল পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। দিনকে দিন দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণের পর জননিরাপত্তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিপতিত হয়েছে। মানুষের জান-মালের কোন নিশ্চয়তা এ সরকার বিধান করতে পারছে না। প্রতিদিন রাজধানীতে এবং দেশের অন্যত্র প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষজনকে হত্যা করা হচ্ছে। চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ক্যাডারদের অন্যায় দাবি মিটাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসীদের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের শিকারে পরিণত হচ্ছে। পুলিশের কনস্টেবল, সার্জেন্ট, সরকারের যুগ্ন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারাও দিনের আলোকে দুষ্কৃতিকারীদের হস্তে নিহত হচ্ছে। কথায় কথায় হাত-পায়ের রগ কেটে দিচ্ছে। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

শহরে কলিং বেল বাজিয়ে গৃহে প্রবেশ করে ডাকাতি হচ্ছে। নাকের ডগায় উপস্থিত পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। ওদের নীতিবোধ অতি নিম্নস্তরে পৌঁছেছে। নগরীতে ছিনতাই এবং খুন-খারাবি যেন জাতীয়করণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীর হম্বি-তম্বি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া অন্য প্রতিবিধান পরিলক্ষিত হয় না। সরকারি দলের বাড়াবাড়ির একটা নমুনা কাগজে দেখলাম। নারায়নগঞ্জের কোন ইউনিয়ন বা থানার এক পাতি নেতা থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিসে তসরিফ আনয়ন করে। মহিলা কর্মকর্তা তাকে চায়ে আপ্যায়িত করে। কিন্তু সে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা কেন উঠে দাঁড়ায়নি সেই অপরাধে সাঙ্গপাঙ্গ পাঠিয়ে তাকে গালাগালি করে জোর করে অফিস থেকে বের করে দিয়ে ঘর তালাবদ্ধ করে দেয়। আওয়ামী সুব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

নারী নির্যাতন চরম পর্যায়ে। একটি মেয়েমানুষ গৃহ থেকে বের হয়ে মান-সম্মান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারলে তাকে ভাগ্যবতী বলতে হবে। বলৎকার এখন সময়ের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীনদের এক ছাত্রনেতা ধর্ষণের নয়া রেকর্ড স্থাপন করেছে। ইতিমধ্যেই সেঞ্চুরী উদ্‌যাপন করে শতাধিক মেয়ের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের গৌরব অর্জনকারী এই ধর্ষণবিদের দম্ভোক্তির শেষ নেই। সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেননা, সে যে ওদেরই একজন।

আওয়ামী আমলে বেলেল্লাপনা প্রকট বৃদ্ধি পেয়েছে। নববর্ষের রাতে, শহীদ মিনারে, বইয়ের মেলায়, আনন্দ মেলায়, নবীণ বরণে উপর্যুপরি শ্লীলতা হারিয়েও বাঁধনদের মতো এক শ্রেণীর নির্লজ্জা মেয়ে

www.pathagar.com

নিজেদের রূপ-যৌবনের পসরা সাজিয়ে সমাজবিরোধী বখাটেদেরকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। একের পর এক দুর্ঘটনার পরও ওদের দেহ প্রদর্শনীর অন্ত নেই। এইসব গায়ে পড়া তরুণীদের সীমাহীন উগ্র আচার-আচরণ অবশ্যই বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজটি অবাধে সাধিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে কথায় কথায় ঢাক-ঢোল সহকারে যুবতীরা অশ্লীল সাজ-সজ্জা করে যৌবনের হিল্লোল তুলে রাস্তায় নেমে আসছে খোল-করতাল সহযোগে নৃত্য-গীতের মিছিলে। গরুর পাল দেখে ষাড়দের আক্রমণেচ্ছা বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু এক হাতে কখনওই তালি বাজে না, এটা উপলব্ধি করতে হবে।

সৃষ্টির ঊষালগ্নে শয়তানের প্ররোচনায় একদিন মানুষের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হলে তাদেরকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে এই মাটির পৃথিবীতে শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। একই পথ ধরে আজও স্বল্প বসনা বা অর্ধনগ্না দেহ সম্ভার প্রদর্শনে উৎসাহী তথাকথিত আধুনিকা আলোক-প্রাপ্তাদেরকেও অকথ্য নির্যাতন ও অপমান নিত্যদিন ভোগ করতে হচ্ছে।

নারী নির্যাতন, ব্যাভিচার, হত্যা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, বখাটেদের উৎপাত, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ ও বিদেশে পাচারের ঘটনা এখন ডাল-ভাত। পরপর মহিলা প্রধানমন্ত্রীর শাসনে দেশের মহিলারাই সর্বাধিক ভুক্তভোগী। সামগ্রীক বিচারে খুন, রাহাজানি, ঘুষ, দুর্নীতি ও হানাহানি সমাজ জীবনকে দারুণভাবে কলুষিত করে তুলেছে। দেশে উগ্রবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদেরকে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করিয়ে অবহেলা প্রদর্শনের বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ওরা পালিয়ে গিয়ে নতুন করে সংগঠিত হয়ে পূর্বের চাইতে ব্যাপক আকারে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছে। কাজী আরিফের মতো সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ্য জনসভায় গুলি করে আরও পাঁচ ব্যক্তিসহ হত্যা করে চলে যাচ্ছে। যশোরে উদিচীর অনুষ্ঠানে বোমা মেরে পাখির মতো মানুষ মারা হল। নওগাঁয় আওয়ামী সদস্যদের খুন করে একটি গোপন সংগঠন দায়-দায়িত্ব নিলেও অনেক অঞ্চলে দিনে পুলিশ, রাতে সন্ত্রাসীরা সহঅবস্থান করছে। কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। ছাতকে সরকারি সাংসদের বাসায় বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও তাকে ধরা হয় না। এটাই আওয়ামী শাসনের বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

সমাজচিত্র বলতে সন্ত্রাসেরই চিত্র। অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় সন্ত্রাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশময় সন্ত্রাসের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গিয়ে অরাজকতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ, শাসন বা বিচারের সুযোগ নেই। আছে বিরোধী দলের উপর নির্যাতন, নিপীড়িন, জেল-জুলুম আর হামলা ও মামলা। অন্য পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের সাত খুন মাফ।

তারপরও সরকারি কর্তাদের বাগাড়ম্বরের অন্ত নেই। চারদিকে শুধুই নাকি দেশ গড়া হচ্ছে। দেশ যে গড়িয়ে যাচ্ছে সে খবর নেই।

খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়াসহ অনেক এলাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ। শহর-গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসীদের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন মাসের এক হিসাবে প্রকাশ, খুন হয়েছে পাঁচ শত ঊনানব্বই জন, ধর্ষিত হয়েছে এক শত বাষট্টি জন, পুলিশের গুলিতে নিহত বারো জন, এসিড দগ্ধ সাইত্রিশ জন, যৌতুকের কারণে খুন ঊনত্রিশ জন, ধর্ষণের পর হত্যা সতেরো জন।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা শাসকদের স্বোচ্চার কণ্ঠের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরপর দু'বছর ভালো ফলনের কারণে চালের মূল্যে ঊর্ধ্বগতি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অন্য সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। টাকার মূল্যমান নিম্নমুখী। একটি ডলারের বিনিময় হার অর্ধ শত টাকার ঊর্ধ্বে। ব্যাংকের জমাকৃত অর্থ মুষ্টিমেয় সম্পদশালী ঋণ খেলাপীরা আত্মসাতের উদ্যোগ করেছে। বোধগম্য কারণে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুজিব কোটধারীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিস দখল, ব্যাংক দখলের প্রতিযোগিতা চলছে। মন্ত্রী, এমপি ও তাদের অনুগ্রহভাজন আমলাদের সন্তুষ্টি মোতাবেক ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি অনুকম্পা বিতরণ করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর নব্য ধনী সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে।

ঢাকায় এক প্রতিমন্ত্রী এবং তিন সাংসদের কীর্তিকলাপের কথা মানুষের মুখে মুখে। এইসব তথাকথিত ভিআইপি তনয়দের ভিআইপি সন্ত্রাসে দেশবাসী সন্ত্রস্ত। বরিশালে চীফ হুইপের পরিবারের অতি বাড়াবাড়ি এবং ঢাকায় তার পুত্রের বাড়ি দখল চুয়াত্তরের পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়। ফেনীর হাজারী গং সেখানে একচ্ছত্রাধিপত্য প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসবে। মানুষ খুন আজকাল কোন ব্যাপারই নয়! প্রতিনিয়তই এমনি ঘটনা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটছে।

ঢাকার ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে স্পষ্ট কণ্ঠে এইসব সন্ত্রাসী এবং তাদের গডফাদারদের উপাখ্যান তুলে ধরে। তাদের বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নির্লজ্জ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করে সন্ত্রাস দমন হয়েছে। বাস্তবে সন্ত্রাস সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। তড়িঘড়ি পুলিশের আইজি পরিবর্তন করে সমস্যা সামাল দেওয়ার চেষ্টা নেওয়া হয়। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! খোদ প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে হয়, হত্যা মামলার এজাহারকৃত আসামিদের ধর। তারপরও কাজ হয় না।

দৈনিক সংবাদ আমি পড়ি না। কিন্তু সেদিন সহবন্দিরা আমাকে সংবাদের একটি 'মন্তব্য প্রতিবেদন' পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এই কাগজটি পুরোপুরি সরকার ঘেঁষা। চোখ বুজে এই সরকারকে সমর্থন জানাবার জন্য কাগজটি আদা-জল খেয়ে মাঠে নামে। সেদিন তাদের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য প্রতিবেদনটি ছাপা হয় সেটি প্রণিধানযোগ্য। ২৮শে মের সংখ্যায় তারা প্রশ্ন তোলে, 'আমরা ভোট দিই কেন? সংসদ সদস্য নির্বাচন করার জন্য। সংসদ সদস্য নির্বাচিত করি কেন? জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার জন্য। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের কথা। কিন্তু বাংলাদেশের কোন কোন নির্বাচনী এলাকার জনগণ ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করেন যেন সাংসদ পুত্ররা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বাড়ি দখল এবং মানুষ হত্যা করতে পারে এবং পুত্র গর্বে গর্বিত সাংসদ পিতারা ভীতির সাইনবোর্ড হিসাবে সোনার বাংলার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারে। আমরা ভোট দিই যেন সাংসদ পুত্ররা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি হত্যা করতে পারে এবং সাংসদরা তাদের পুত্রদের প্রটেকশন দিতে পারে। না হলে শুধু শুধু ভোট দিলে এমপি নির্বাচন করার দরকার কী?

রাজধানীর বনানীতে তরুণ ব্যবসায়ী ইফতেখার আহমেদ শিপুকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে সরকারি দলের সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদারের কীর্তিমান পুত্র জুয়েল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে, সাংসদ পুত্র জুয়েল তার দু'সঙ্গীকে নিয়ে ব্যবসায়ী শিপুকে হত্যা করেছে এবং তার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে আহত করেছে।

www.pathagar.com

'ফাও' মোবাইল সেট চেয়ে না পেয়ে সাংসদ পুত্র এই হত্যা করেছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর দু'দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু পুলিশ কোন আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। থানা বলছে, আসামিরা পলাতক আর পত্রিকা লিখছে হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই জুয়েলকে পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাংসদ কামাল আহমেদ মজুমদার। পুলিশ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। এমন কি তাকে ধরার চেষ্টাও করেনি। এ থেকে বুঝা যায়, সাংসদ-পুত্র হলে খুন করে গর্বিত পিতার পাশে ঘুরে বেড়ান যায়। পুলিশ কিছুই করে না। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নকারী (সরকারি দলের) সাংসদদের একটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, আইনের হাত থেকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, হত্যাকারী পুত্রকে প্রটেকশন দেওয়া।

শুধু এবারই নয়, আরও তিনটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার নাম আসে। বনানীর রাজু, মিরপুরের শামসুল এবং মোহাম্মদপুরের পলাশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সাংসদ পুত্র জুয়েলের নাম আসে। তবে প্রত্যেকবারই তদবিরের জোরে এসব হত্যা মামলার এজাহার থেকে জুয়েলের নাম বাদ দেওয়া হয়। এজাহারে জুয়েলের নাম দেখলেই নাকি পুলিশ আপত্তি জানায়, মামলা নিতে চায় না। সাংসদ পুত্রের নাম বাদ দেওয়ার পর থানায় মামলা নেওয়া হয়, এবারও পুলিশ এজাহার থেকে সাংসদ পুত্রের নাম বাদীপক্ষের দৃঢ়তার কারণে বাদ দিতে পারেনি। তবে সাংসদ পুত্রকে হত্যা মামলার অভিযোগ থেকে রক্ষা করার জন্য নানা মহল থেকে জোর তদবির শুরু হয়ে গেছে। এই তদবিরকারীর মধ্যে পুলিশ রয়েছে, সাংসদ রয়েছে, মন্ত্রী এবং সরকারি দলের নেতারাও রয়েছেন।

পুলিশ নাকি সাংসদ পুত্র জুয়েলকে দেখতে পায় না। অথচ এই হত্যাকারী তার গর্বিত পিতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্যে। হত্যাকাণ্ডে তার ভূমিকা সম্বন্ধে তার মা বলেছেন, সেই সময় জুয়েল মিরপুরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ছিল।

তার বাবা সাংসদ কামাল আহমদ মজুমদার বলেছেন, জুয়েল আমার সাথে ধামরাই ছিল। এক ব্যক্তি একই সময়ে দু'জায়গায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও কামাল আহমদ মজুমদারের পুত্র বোধহয় একই সঙ্গে মিরপুর এবং ধামরাই থাকতে পারে। এটা কেবল বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের সাংসদের পুত্রের পক্ষেই সম্ভব এবং সে জন্যই সাংসদ পিতার সঙ্গে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখলেও পুলিশ দেখতে পায় না।

www.pathagar.com

আরেক এমপির পুত্র কলাবাগানে এক বাড়ি দখল করতে গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বা নিতে সাহস পায়নি। একসময় পুলিশ নাকি ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েছিল। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই এক মন্ত্রীর পুত্র ঢাকার একটি থানায় গিয়ে লকআপে পোরা তার প্রতিপক্ষকে আচ্ছাসে পিটিয়ে হাতের সুখ মিটিয়েছিল। পুলিশ তাকে এই কাজটি করতে দিয়েছিল বিনা বাধায়।

সম্প্রতি বরিশালে সন্ত্রাসীদের 'ফাও' মোবাইল সেট না দেওয়ায় গ্রামীণ ফোনের স্থানীয় প্রতিনিধির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হামলার শিকার হয়। বরিশালে গ্রামীণ ফোনের ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এরা সকলেই সরকারি ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসী এবং একজন প্রভাবশালী এমপির পোষ্যপুত্র। ঢাকার কুখ্যাত হত্যাকারী, সন্ত্রাসীদের একটা বড় অংশ স্থানীয় এক এমপির পুত্রের প্রটেকশনে পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে এক প্রতিমন্ত্রীর পুত্র উত্তরায় এক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন রিপোর্ট পত্রিকায় ছাপা হতে না হতে জানা গেল, সোনার বাংলার সোনার ছেলেটি সে সময়ে বিদেশে পালিয়ে গেছে। এমন নয় যে, পুলিশ এসব জানে না। জানে, দেখে ও শোনে, মাঝে মাঝে হয়ত ধরেও বসে—এই পর্যন্তই।

মামলার এজাহারে এমপির পুত্রের নাম থাকলেও মামলা নেওয়া যাবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মামলা নেওয়া হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এজাহার থেকে এমপি পুত্রের নাম বাদ না দেওয়া হচ্ছে—এমন কোন নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে থানা পুলিশ, আইজি, পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে কিনা এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেশবাসীকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হোক। যদি এমন কোন আদেশ থাকে তবে সেটা দেশবাসীর জানা থাকবে এবং ভবিষ্যতে (সরকারি দলের) সাংসদ পুত্র চাঁদাবাজি করতে গেলে তারা চাঁদা দিয়ে দেবে, সন্ত্রাস করলে তারা প্রতিবাদ করবে না এবং হত্যা করলে থানায় মামলা করবে না, করলেও এজাহার থেকে হত্যাকারীর নাম বাদ দেবে। অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে দেশবাসী।

আর তা যদি না হয় তবে আমরা দেখতে চাই, সাংসদ কামাল আহমদ মজুমদারের পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, হত্যা ইত্যাদি অভিযোগে সরকার মামলা পরিচালনা করছে।

www.pathagar.com

যদি এমন না হয় তা হলে বুঝতে হবে সরকারই চাচ্ছে দলীয় সাংসদ পুত্ররা চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হত্যা করবে কিন্তু পুলিশ তাদের কিছু বলতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার কোন রেহাই নেই।

এটা বোধহয় আওয়ামী সন্ত্রাসী ও আওয়ামী সাংসদ পুত্রের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তা না হলে সাংসদ কামাল আহমদ মজুমদারের পুত্র বার বার হত্যা অফিযোগ থেকে বাদ পড়ছে কেন? কথাটা এভাবে না বলে সন্ত্রাসী (সরকারি দল ছাড়া) যে দলেরই হোক তার রেহাই নেই বললে বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকত। বক্তৃতা দেওয়ার সময় ব্র্যাকেটবদ্ধ কথাগুলো বলতে সরকারি দলের নেতারা ভুলে যান, কিন্তু সন্ত্রাসীরা কখনও ভোলে না।

কামাল আহমদ মজুমদারের মতো সাংসদ পুত্রকে সন্ত্রাসী-হত্যাকারী হিসাবে পেয়ে পুলকিত বোধ করছে, গর্ববোধ করছে—এতে ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রিয়তা কতটা বাড়ছে আমরা জানি না। তবে ইমেজের মধ্যে যে সন্ত্রাসের ছাপটা ভালো করেই বাড়ছে এটা বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। সরকার সকল দলের সন্ত্রাসীদের দমন করতে চায়, উদ্দেশ্যটা মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা করতে হলে আগে নিজের দলের সন্ত্রাসী ক্যাডার এবং সাংসদদের সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ পুত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ ইচ্ছা আর বক্তব্যই যথেষ্ট নয়, কাজটাও সেই অনুযায়ী করতে হবে। তা না হলে সরকার ঘোষণা দিয়ে দিক—'সোনার বাংলার পুত্রদের থেকে সাবধান।'

সমস্ত প্রতিবেদনটি এখানে হুবহু তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই। সকলের নাকের ডগায় বসে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও সকল মন্ত্রীদের চোখের সম্মুখে কূটনৈতিক মহলের দৃষ্টিসীমায়, মিডিয়াসমূহের ধারে কাছে, রাজধানীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করে এই আওয়ামী সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও হত্যাকারীরা যা করছে, দেশের অন্যত্র গ্রামে-গঞ্জে তাদের দৌরাত্ম কতটা সীমা ছাড়িয়েছে তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। একই চিত্র আরও ব্যাপকতায় সেসব পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা সহজেই অনুমেয়।

কাগজে পড়ি, ঢাকার জনৈক সাংসদ একটি মেয়েকে অফিসে ডেকে নিয়ে বলাৎকার করে। অভিযোগ পেয়েও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

www.pathagar.com

উল্টা অভিযুক্তাকে কারাগারে যেতে হয়। মুক্তি পেয়ে বারংবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দ্বারে ধর্ণা দেয়। আওয়ামী রাজত্বে আইন সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তাই পুলিশ স্পর্ধা প্রদর্শন করে সরকারি দলের এমপির নাম রয়েছে বিধায়, বিষয়টি তাদের কাছে স্পর্শকাতর। সরকার দলীয় সাংসদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয় না।

সব দেখে-শুনে আন্তর্জাতিক সেইসব সংস্থাসমূহ আরও জোর কদমে কেন এগিয়ে আসছে না এই মহিলাকে নানা পদকে ভূষিত করার জন্য! শান্তি ও সুশাসনের জন্য তাকে স্বর্ণ পদক কেন প্রদান করা হচ্ছে না! বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন যে অহেতুক বিলম্ব করছে ডক্টরেট প্রদানে তা বোধগম্য হয় না! পার্শ্ববর্তী দাদারাই বা নিশ্চুপ কেন! নিদেনপক্ষে আর একটা দেশী কুত্তম উপাধি প্রদান করতে পারে। সবার উপর দালালি সত্য তাহার উপরে নেই!

দেশের সার্বিক অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন। চারদিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। জাতি তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপর্যয়ের মুখে। আওয়ামী লীগ নিজেদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করে না। প্রায় তেরো কোটি মানুষ অধ্যুষিত এই দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পরপদানত করার চেষ্টা চলছে। আওয়ামী অপশাসনে দেশ ও জনগণের দুর্বিসহ চিত্র প্রতিদিন আরও ভাস্বর হয়ে উঠছে। গ্রামে-গঞ্জে অনেক মানুষ মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সারা দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান। কৃষক গায়ের রক্ত পানি করে শস্য উৎপাদন করে, তার ঘরে খাদ্য নেই। অন্য পথে উপার্জনের কোন উপায় নেই। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফিতা কাটা বা জাতীয় পার্টির সরকার কর্তৃক নির্মিত প্রকল্পের সাইনবোর্ড পাল্টানোর কাজে এরা অধিকতর ব্যাপৃত। পিতার নামে, মাতার নামে, ভ্রাতাদের নামে, এমনকি ভ্রাতৃবধূর নামে নামকরণ করার আশ মিটছে না। তৈরী ছেলের জনক বনতে এদের জুড়ি নেই। বিদগ্ধজনের মন্তব্য, এত পরিশ্রম না করে দেশটার নাম পাল্টে দিলেই বোধহয় ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বাংলাদেশের নাম মুজিবদেশ হলে ক্ষতি কী! ওরা আর কিছুদিন থাকলে একদিন হয়ত এটাও ঘটতে দেখলে অবাক হওয়ার আর কিছু থাকবে না।

মানুষের হতাশা আর হাহাকারে ক্ষমতাসীনদের কিছু যায়-আসে না।

www.pathagar.com

তারা দেশ-বিদেশ থেকে অনেক শ্রম ব্যয় করে প্রশংসা-সাধুবাদ ক্রয় করছে। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে খোদ ক্লিনটন সাহেবকে এনে প্রচুর তৈল-সিঞ্চনে খুশি করে নিজেদের আখের গুছাবার প্রয়াস নিয়েছে।

কারাগারের বাইরে থাকলে দেশের এই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হত না। এই দেশটি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সেই ছাত্রাবস্থা থেকে লড়াই করেছি। আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং তার অনেক সহকর্মীর মতো সেদিন নীরবে-নিশ্চুপ বসে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলাম না। যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। এই দেশের মানুষের এই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকার প্রশ্ন আসে না।

জেলে বসেও রাজধানী ঢাকা শহরের অবস্থা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। শহরের নাগরিকদের দুর্ভোগের শেষ নেই। পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, নগরবাসীদের যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। মেয়র নির্বাচনের পূর্বে কত গালভরা আশ্বাস! আজ পিপাসার পানিটুকুও প্রদানে অক্ষম। পদে বহাল থাকাতে সরকারের কি লজ্জাবোধ হয় না!

কারাগারে বসে কোন কিছু রচনায় হাত দেওয়া বড়ই বিড়ম্বনার কাজ। খাতা-কলম নিজের অর্থে ক্রয় করলেও কখন ওদের মর্জি হবে, কখন কতটা সাপ্লাই দেবে তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কোন রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে তথ্য বা দলিলাদি পাওয়া অসম্ভব। নিজের স্মরণ এবং মনন থেকে যেটুকু সম্ভব লিপিবদ্ধ করতে হয়।

গত বছর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ১৭ই এপ্রিল জাতীয় পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির চেয়ারম্যান সেখানে যে ভাষণ দেন সেটা পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে অনেক তথ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তিনিও সেদিন বলেছেন, আমি এক বিবৃতিতে বলেছিলাম যে সরকার পিপাসার পানিটুকু পর্যন্ত দিতে পারে না তারা ক্ষমতায় থাকে কোন্ লজ্জায়?

একদিন শেখ সাহেব পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ওদের পানিতে মারব, ভাতে মারব। ওরা অবশ্য ভাত খেত না। পিতা যেটা করার সুযোগ পাননি, কন্যা সেটা পেরেছে। পাকিস্তানীদের কোথায় পাবে? তাই অগত্যা বাংলাদেশীদের উপরই পিতার বাক্য সত্যে পরিণত

www.pathagar.com

করছে। এরশাদ সাহেব বলেছেন, বর্তমান সরকার দিনে দিনে মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। এখন পানিটুকু পর্যন্ত দিতে পারছে না। পানির অভাবে মানুষ যখন শূন্য কলসি হাতে নিয়ে রাজপথে এককাতরা পানির জন্য বুক চাপড়িয়ে বিক্ষোভ করে তখন এই সরকারের হৃদয় এতটুকু কাঁপে না। পিপাসার্ত মানুষের উপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে চোখের পানি ঝরিয়ে পানির অভাব মিটায়।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা বলার নয়। অথচ এই বিদ্যুৎ ব্যতিরেকে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থমকে যাবে।

এদের আমলে বিদ্যুতের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুতের চাহিদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু উৎপাদন নিম্নমুখী। এর পশ্চাতেও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে সন্দেহ করার কারণ আছে। পরিকল্পিতভাবেই এই সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। বিদ্যুতে ঘাটতি থাকলে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হবে। ফলে পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। স্বভাবতই পার্শবর্তী রাষ্ট্র থেকে আমদানী সহজতর। চোরাপথেও পণ্য আসায় অসুবিধা নেই। সে কারণে কেউ যদি অভিযোগ করে ওরা নিজেদের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে প্রভুদের বাজার রক্ষার তাগিদে নিজ দেশের শিল্প উন্নয়ন ব্যাহত করছে বিদ্যুৎ সঙ্কট সৃষ্টি করে, তা হলে সে অভিযোগকে অমূলক বলা যাবে না। এদের আমলে বিদ্যুৎ সঙ্কট কখনওই দূর হবে না। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সৃষ্ট মানুষের দুর্ভোগ এরা হৃদয়ঙ্গম করবে না। সঙ্কট যে তাদেরই সৃষ্ট। চমক সৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে হটিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। তার দায়িত্ব নেওয়ার পর সঙ্কট আরও ঘণীভূত হয়। প্রধানমন্ত্রীর যদি বিন্দুমাত্র নৈতিকতা থাকত তা হলে যে কারণে জেনারেল নুরুদ্দীনকে বরখাস্ত করেছিল সেই একই ব্যর্থতার গ্লানিতে নিজেও পদত্যাগ করা উচিত ছিল।

আজ দ্রব্যমূল্যও আকাশচুম্বি। এসবও আসছে সেই আকাঙ্ক্ষিত সীমান্ত-পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। আজ এদেশে কি আসছে না! মাছ-ভাতের দেশ বলে একদা পৃথিবীতে সুপরিচিত এই দেশে এখন সেখান থেকে রুই মাছ, তরিতরকারিও এসে থাকে। ফল-মূল, চাল, ডাল, মসলাপাতি, আনাজ, গরুর মাংস, এমনকি কাছিমের ডিমও অনায়াসে ওপার থেকে এপার চলে আসছে। পত্র-পত্রিকা, বই, সিনেমার ক্যাসেট, কাগজপত্র, কাপড়-চোপড়, যন্ত্রাংশ এমন কোন জিনিস নেই যা সেখান থেকে

www.pathagar.com

আসছে না। ভারতীয় পণ্যে এভাবে বাজার সয়লাব হতে কোনদিন দেখা যায়নি। মনে হয় সীমান্ত উঠে গিয়েছে, এটা সে দেশেরই একটা ভূখণ্ড!

বিদ্যুতের অভাবে পাম্প চলে না। সেচ ব্যবস্থা ব্যাহত। আগামীতে আরও সঙ্কটের হাতছানি।

অর্থের অবমূল্যায়ন বিগত কয়েক বছরে এদের সময়ে কমপক্ষে পনেরো-ষোল বার হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রায় পঁচিশ শতাংশ। গত বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল এক শত আটষট্টি কোটি ডলার। দু'মাসের আমদানি খরচের সমান। সে সময়ে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি ছিল আট শত চার কোটি টাকা এবং ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ ছিল প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা। এই যদি হয় সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা তা হলে দেউলিয়া হতে আর কত বাকি! সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে এবং অর্থমন্ত্রীর অবিমৃশ্যতার কারণে দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে সর্বস্বান্ত করে বিদেশীরা শেয়ার বাজার থেকে দশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে। এই একটি অপরাধে অর্থমন্ত্রী এবং এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। তারা সে অধিকার হারিয়েছে।

সঙ্কট সমাধানের একটিই পথ, ওদের অপসারণ। দেশ ও তার মানুষের কল্যাণে ওরা যত শীঘ্র বিদায় নেয় ততই মঙ্গল। অন্যথায় শিল্প থাকবে না, বাণিজ্য থাকবে না, অর্থনীতি থাকবে না। প্রকারান্তরে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। মানুষের অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে।

জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে গার্মেন্টস শিল্পে এক নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটেছিল। এই সরকারের এক বাকসর্বস্ব শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তার অদক্ষ পরিচালনায় জিএসপি (Generalized system of preference) সমস্যার সমাধান করতে না পেরে এই শিল্পকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারে নিয়ে এসেছে। পোশাক রপ্তানী প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। নিটিং ও গার্মেন্ট সেক্টরে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার লোকসান ঘটেছে। ভারতীয় বস্ত্রে বাজার প্লাবিত। জাতীয় পার্টির সরকারের আমলে বছরে কাপড়ের উৎপাদন ছিল গড়ে প্রায় সাত কোটি মিটার। আওয়ামী লীগ আমলে উৎপাদিত হচ্ছে এক কোটি মিটার। ঘাটতি পূরণ হচ্ছে ভারতীয় কাপড় দ্বারা।

পাট শিল্পের অবস্থা করুণতর। ক্ষমতায় আসার পূর্বে আজকের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী চোখ ঘুরিয়ে, গাল ফুলিয়ে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় গেলে পাটের মন পাঁচ শত টাকা করবেন। আজ সে কথা বিস্মৃত হয়েছে। অধিকাংশ পাটকল বন্ধ হতে চলেছে। উপমহাদেশের বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। পেছন থেকে কারা কলকাঠি নাড়ছে সেটা সহজেই অনুমেয়।

দেশের রপ্তানী আয়ের অন্যতম বড় উৎস চামড়া। সেটাও অবাধে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশের লোকসান হচ্ছে প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা। কোরবানীর তিনটি চামড়ার বিনিময়ে একটি গরু পাওয়া যায়। ক্ষমতাসীন দলের তিন-চার জন এমপি একচেটিয়াভাবে তিন শত থেকে চার শত টাকায় নামমাত্র মূল্যে কোরবানীর চামড়া কিনেছে। ঈদের পূর্বে দেশের ট্যানারীগুলোকে বোধগম্য কারণেই ঋণ দেওয়া হয়নি। তারা চামড়া ক্রয় করতে পারেনি। ভারতে দেদার চামড়া রপ্তানির ফলে দেশের মাদ্রাসা মক্তব ও লিল্লাহ্ বোর্ডিংগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। এদের প্রধান আয়ের উৎস কোরবানীর চামড়া। ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করার যে সরকারি চক্রান্ত রয়েছে এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় অধিবাসীরা কখনওই এই হীন চক্রান্ত মেনে নিতে পারে না। তারা পবিত্র কোরান ও হাদিস শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে রুখে দাঁড়াবে।

কলকারখানার ক্ষেত্রেও বন্ধাত্ব নেমে আসছে। প্রায়গুলোই বন্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার। কর্মরতরাও ঠিকমতো বেতন পাচ্ছে না। সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওদের বেতন কমপক্ষে তিন হাজার টাকার উন্নীত করবে। আজ কোথায় সে প্রতিশ্রুতি! মন্ত্ররা আজ নিশ্চুপ কেন! পে-কমিশন কার্যকর হচ্ছে না কেন!

প্রাথমিক শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই রাজপথে আন্দোলনরত। তারা ওসমানী উদ্যানে অনশন করে। সেখানেও সরকারি থাবা। উদ্যানের শোভা দীর্ঘদিনের ছায়া-সুশীতল গাছগুলো নিঃশেষ করার আওয়ামী উদ্যোগের বিরুদ্ধে নগরবাসী আজ স্বোচ্চার।

গঙ্গার পানির হিস্সা নিয়ে এই সরকার কত লম্ফ-ঝম্ফই দিয়েছে। তারা পানি চুক্তি করেছে। চুক্তি অবশ্যই করেছে কিন্তু পানি আসেনি।

'পণ্ডিত মশায় চলিয়া গেল, জুতা জোড়া পড়িয়া রহিলেন।' উপরন্তু ফল লাভ হয়েছে এইটুকু, এই চুক্তির ফলে আজ ফারাক্কার পানি নিয়ে দেন-দরবার বা আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি। দেশের এক-দশমাংশ হাত ছাড়া হবার উপক্রম। দেশের সংবিধান এই নিশ্চয়তা দেয়, দেশের অধিবাসীরা যে কোন স্থানে জায়গা-জমি ক্রয় করতে পারবে, সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে। চুক্তির ফলে সংবিধান স্বীকৃত সে অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সতর্ক প্রহরী আমাদের সেনাবাহিনীর বিচরণ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করা হয়েছে। সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে, দেশের এক বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্যোগের জন্য বিবি হাসিনার নোবেল পুরষ্কার, নিদেনপক্ষে একটা ইউনেস্কো বা অন্যকোন পুরষ্কার জোটা উচিত ছিল! আমরা একটু 'আহা বেশ বেশ' করে বগল বাজাতে পারি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কি মহা অবদান! শিক্ষাঙ্গণ এই মুহূর্তে সকল সন্ত্রাসী অস্ত্রধারীদের নিরাপদ আস্তানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি আওয়ামী লীগের ক্যান্টনমেন্ট। নিষিদ্ধ ও অবৈধ অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌ানি, পরীক্ষার অবাধ নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া, যত্রতন্ত্র প্রকাশ্যে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, ছাত্র-শিক্ষকদের প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নেওয়া, হল দখল প্রভৃতি এই সরকারের মহান অবদান। পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরাও এক্ষেত্রে বরণীয় হচ্ছে। মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ জেলা বা বিশেষ অঞ্চল বা গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে নিজেদের সংগঠনের অভ্যন্তরেও রক্তপাত, প্রাণহানি ঘটছে।

বেগম জিয়া এবং বেগম হাসিনা একই পথ ধরে নিজেদের কীর্তির ধ্বজা ধরে নিঃসন্দেহে বরণীয় হয়েছেন!

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে হাজার বছরের ঐতিহ্য ছিল। সে সংস্কৃতি আজ বিদেশী আগ্রাসনের শিকার। পরিকল্পিতভাবে সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থি ভিনদেশী কৃষ্টি আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটি বিশেষ দেশের সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নির্বিচারে এদেশে মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো হচ্ছে। নৃত্য, গীত ও অভিনয় শিল্পের তারকাদের পুনঃপুন আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে আগামী দিনের মানুষের মন-মানসিকতার দিক-নির্দেশের প্রচেষ্টা চলছে।

www.pathagar.com

ঘুরে-ফিরেই সন্ত্রাসের কথায় আসতে হয়। দেশে সন্ত্রাস আজ সর্বকালের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শুধু পুলিশকে দায়ি করলে চলবে না। তাদের দায়িত্ব অবশ্যই আছে। মূল দায়িত্ব সরকারের। অধিকাংশ সন্ত্রাস করে সরকারের লোক। পুলিশ এজাহার পর্যন্ত নিতে পারে না। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কথামতো পুলিশকে কাজ করতে হয়। কাজে-কাজেই তাদের হতাশারও অন্ত নেই। সেনাবাহিনীকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। রাজধানীর দুঃসহ যানজটের সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে পুলিশকে দোষারোপ করে সেনাবাহিনী এনে প্রথমোক্তদেরকে হেয় করা হচ্ছে।

মানুষের শেষ ভরসার স্থল আদালত। ক্ষমতাসীনদের মধ্যে সেই আদালতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং প্রকারন্তরে অবমাননা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্ট যে সুচিন্তিত রায় দিয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার অভাব রয়েছে। বিচারকগণ তার কাছ থেকে আরও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য আশা করেন। প্রধানমন্ত্রী দু'দিনে বারো শত জামিনের কথা বলেছিলেন। বিচারপতিগণ অনুসন্ধানে দেখেছেন অভিযোগ অসত্য। তারা দেখেছেন দু'দিনে এক শত সাতাশিটি রিট এবং জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী হলে কি করত সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লর্ড এটকিনের উদ্বৃতি প্রদান করে বিচারপতিগণ যা বুঝিয়েছেন তা উপলব্ধি করা এবং সেভাবে এই মহিলাকে সৎ পরামর্শ দেওয়াই বোধহয় তার উপদেষ্টাদের জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে। সুপ্রীমকোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিলেন তাতেও প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের লোকগাথায় একটা কথা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।' পুষ্করিণীতে পদ্মপাতায় ব্যাঙ্ বসে ফুলের শোভা দেখছিল, সাপ দেখে সে পানিতে লুকিয়ে যায়—এ ধরনের অর্থই হয়ে থাকবে। শব্দার্থে নয়, ভাবার্থে যদি ওদের কিছুটা উপলব্ধি আসে তাতেও মঙ্গল।

সরকার দেশের সকল ক্ষেত্রে এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে

www.pathagar.com

যেভাবে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তেমনিভাবে আমাদের দলের মধ্যেও একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দলকে দ্বি-খণ্ডিত করার উদ্যোগে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে। এই দলে আওয়ামী-বাকশালী কিছু লোক পূর্ব থেকেই ছিল! তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এরশাদ সাহেবের অন্তরীণাবস্থায়। '৯৬-এর নির্বাচনের পরপরই, নেতৃবৃন্দ ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জু গোপনে ধানমন্ডিতে শেরে খাজা নামধারী তথাকথিত এক ধর্মগুরুর বাসভবনে হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে দলের পক্ষ থেকে লিখিত সমর্থন দিয়ে আসেন। চুক্তি হয়, মিজান সাহেবকে প্রেসিডেন্ট বানানো হবে এবং মঞ্জুকে যোগাযোগ মন্ত্রী। মঞ্জুর অংশ সে ঠিকই বুঝে নেয়। কিন্তু মিজান সাহেবকে অন্যভাবে তুষ্ট করে এবং সময়ে এই দু'জনের নেতৃত্বে সম্ভাবনাময় জাতীয় পার্টিকে দ্বি-খণ্ডিত করে। এরশাদ সাহেব অনেক বিলম্বে এসব উপলব্ধি করে তাদেরকে বহিস্কার করেছিলেন। কিন্তু তখন বিষয়টা অনেক দূর গড়িয়েছে। বহিষ্কৃতরাও কাউন্সিল করে তাদের আখের গুছাবার ব্যবস্থা করেছে। এদের চরিত্র সম্বন্ধে দেশবাসী সজাগ থাকলেও অবৈধভাবে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজের ঠিকাদারি দিয়ে দলে লোক ভিড়ানো হচ্ছে। দলে না এলে রাস্তা-ঘাট নির্মাণের অনুমোদন বাতিল করছে। এভাবে দল ভারি করার প্রচেষ্টায় আপাতত কিছুটা সাফল্য এলেও এসব যে শেষ অবধি ধোপে টিকবে না, টিকতে পারে না, ইতিহাস তা বার বার প্রমাণ করেছে। রাজনীতিতে চিরদিন সুবিধাভোগকারী মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং সুযোগশিকারী যোগাযোগ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা ঠিকাদার সমিতি অবশ্যই গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু জাতীয় পার্টি হতে পারে না। জাতীয় পার্টির নাম ব্যবহারের অধিকার তাদের থাকতে পারে না। সরকারের মন্ত্রী হয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে জাতীয় পার্টির নাম ব্যবহার করে সরকারের বি-টিম সেজে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশবাসীর কাছে তাদেরকে একদিন অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

জাতীয় পার্টি আজ নির্দ্বিধায় উপলব্ধিতে এসেছে যে, দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দেশ ও জনগণের স্বার্থে আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাজপথই দলের ঠিকানা হতে হবে। বিষয়টা সহজ না হলেও বিকল্প নাই। পার্টি সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং জাতীয়বাদী ইসলামী শক্তিসমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে। সময়ের একান্ত দাবিতে যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সে দাবির প্রেক্ষিতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জমাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট একজোটবদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, দেশকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চার দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

চারটি বিরোধী দল কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই ঐক্যজোট দেশের চৌষট্টি ভাগ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে। সরকার অনমনীয়। ঐক্যজোটের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকেই একতরফাভাবে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। বিরোধী দল একজোটে সে নির্বাচন বর্জন করে। একতরফা পৌরনির্বাচনেও দেখা গিয়েছে সন্ত্রাসীরা হেলমেট মাথায় দিয়ে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত।

সরকার এই চার দলের ঐক্যজোটে বেসামাল। গণরোষে গদি হারাবার দুশ্চিন্তায় ভীতগ্রস্থ হয়ে অশ্লীল ভাষায় অবিরাম গালিগালাজ করে যাচ্ছে। চার কুচক্রী, ভোট চোর, স্বৈরাচার, রাজাকার বলে ডাঙর ও পাতি সব নেতা-কর্মীরা তারস্বরে চিৎকার করছে।

জাতীয় পার্টির আমলে এদেরকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করতে বাধেনি। বিএনপির সময়েও এদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করে এদের একটি দলের সহায়তায় ক্ষমতায় যেতে কোন অসুবিধা হয়নি। এই অযোগ্য-অপদার্থ ও দেশের স্বার্থবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আর একবার জনতার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ওদের আর্তনাদের শেষ নেই। গেল, গেল, সব গেল!

এরা যদি ভোট চোর, স্বৈরাচার আর রাজাকার হয়, ক্ষমতাসীনরা তার চাইতে কয়েক ডিগ্রী উচ্চে। চুরি কী! ওরা সরাসরি ভোট ডাকাতিতে অভ্যস্ত! তাও প্রকাশ্য দিবালোকে। টাঙ্গাইল উপনির্বাচন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। একসময় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ছিল ওদের নয়নমণি। আজ সে সত্য ভাষণে মুখ খোলাতে চোখের বালিতে পরিণত হয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত দল করার তার অধিকার তথাকথিত গণতন্ত্রের মানস কন্যার দল ছিনিয়ে নিয়েছে। তার সশস্ত্র ক্যাডাররা গোলাগুলি, বোমা ও ককটেলের বৃষ্টিবর্ষণ করে তার দলের অধিবেশন বানচাল

www.pathagar.com

করেছে। আজ তার সম্পদের হিসাব চাওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ছোট ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদ করায় তাকে পিটিয়ে আহত করে হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। আওয়ামী গণতন্ত্রের নমুনা আর একবার নজির স্থাপন করেছে। অন্যকে স্বৈরাচার বলার পূর্বে আয়নায় নিজেদের মহা স্বৈরাচারী চেহারা তথা লেলিহান জিহ্বা বের করা খড়্গ হস্ত চামুণ্ডা মূর্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কী!

এতদিন পরে স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকার জন্য অন্যকে কটাক্ষ করার পূর্বে খোদ প্রধানমন্ত্রীর একবার নিজেদের আমলনামা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমরা যখন অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করি তখন তিনি কোথায় ছিলেন? স্বামীর ঘরে চুটিয়ে সংসার করছিলেন। আজ যাকে বঙ্গমাতা বলার চেষ্টা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সেই মা এবং তার পরিবার সেদিন পাকিস্তানীদের খোরপোষে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। পাকিস্তানের কাছে তার পিতার আত্মসমর্পণের কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। স্বাধীনতার ঘোষণার মতো বিষয় আজ সবচাইতে বড় প্রশ্নের সম্মুখীন। আজ একথা রাজনৈতিক মহলে অবিদিত নেই যে, চট্টগ্রামের কর্মীরা জিয়াউর রহমানকে ধরে-বেঁধে প্ররোচিত করে এই ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। জিয়াউর রহমান সেদিন সেই ঘোষণায় যা জুড়ে দিয়েছিলেন, স্থানীয় কর্মীদের কারণে তা প্রকাশ পায়নি। কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যের দিকে ঢিল ছোঁড়া ঠিক নয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। একের পর এক উপ-নির্বাচন, পৌর নির্বাচন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে দেশের আপামর মানুষের দাবি প্রতিধ্বনিত করে বিরোধী দলসমূহ তার পদত্যাগের জন্য আন্দোলন করে আসছে। সরকার অনড়। শেষ পর্যন্ত সে পদত্যাগে বাধ্য হলে সকলেই আশা করেছিল আলোচনার মাধ্যমে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সে পদে স্থলাভিসিক্ত করা হবে। কিন্তু মানুষের প্রত্যাশার মুখে ছাই দিয়ে ওরা আর একবার নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেছে।

বিরোধী দলসমূহের নিকট আজ আর কোন দ্বার উন্মোচিত রইল না। সরকার-পছন্দ এই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে তারা উপজেলা নির্বাচনসহ অন্য কোন নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না। বাধ্য হয়ে চার দফা বা পাঁচ

www.pathagar.com

দফার পরিবর্তে সরকার হটাবার এক দফা আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। সুতীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে ওদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সেক্ষেত্রেই কেবল এই গণবিরোধী, জাতীয় স্বার্থ বিসর্জনকারী ওপারের আশীর্বাদপুষ্ট আওয়ামী চক্রকে ক্ষমতার মসনদ থেকে হটানো সম্ভব। সে লক্ষ্যেই সকলের ক্ষুদ্র দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। এটা সময়ের ডাক। এই আহ্বানে কেউ সাড়া দিতে ব্যর্থ হলে জাতির নিকট দায়ি হয়ে থাকবে।

রাজনৈতিক দলসমূহ অসফল হতে পারে, কোন বিশেষ নেতা-নেত্রী কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু এ দেশের ইতিহাস পরপর সাক্ষ্য দিয়েছে, মানুষ অত্যাচার-অনাচার জর্জরিত হয়ে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়াই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আসে। সেটাকেই বলা হয়ে থাকে গণ-অভ্যুত্থান। রাজনৈতিক দলগুলিকে আজ ইতিহাস নির্দিষ্ট তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। জাতির প্রতি তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। এক সময় এই বিএনপি সরকার জাতীয় পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক নীল নকশার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছিল। আজ সে কথা জাতীয় পার্টি ও তার নেতা-কর্মীরা ভুলে দেশ ও জনগণের স্বার্থে সেই বিএনপি'র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এক সময় আমার উপর অকথ্য নিপীড়ন করে থাকলেও আজ কারাভ্যন্তর থেকে আমার এটাই অভিব্যক্তি। সর্বগ্রাসী সঙ্কট থেকে দেশকে রক্ষাই আজ প্রধানতম কর্তব্য।

যখনই কোন রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা না করে পারা যায় না। ফলশ্রুতিতে সরকারের কর্মকাণ্ড বা তাদের সফলতা-বিফলতার কথা উল্লেখে এসে যায়। এদের বিরুদ্ধে এত কথা বলার আছে যে, জেল হত্যার মামলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বৃহৎ পরিসরে সেসব বিবৃত করলে রচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাই সংক্ষেপে শুধু কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত করা গেল।

প্রধানমন্ত্রী অন্যকে গাল দেওয়ার সময় একবারও ভাবেন না, ক্ষমতার পাগড়ি বেঁধে কেউ পৃথিবীতে আসে না। চিরদিন কেউ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারে না। একদিন তাকে জবাবদিহিতায় যেতে হবে।

www.pathagar.com

দরিদ্রদেশের সরকারি অর্থে অপ্রয়োজনীয় দলীয় লোকজন, নিকট আত্মীয় ও পারিষদবর্গ নিয়ে অহেতুক ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ একদিন ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের আওতায় অবশ্যই পড়বে। বার বার পৃথিবীর আরেক পৃষ্ঠে অবস্থানরত কন্যার নবজাতকদের দেখতে যাওয়ার খায়েশ একদিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বৈকি! আজ জুজুর ভয়ে সবাই নীরব থাকলেও একদিন নিশ্চয়ই সে সব উদ্‌ঘাটিত হবে।

এদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গদিতে বসে কেউ কেউ স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়ে থাকে। 'নেপটিজম ও ফেডারিটিজিম' শব্দ দুটি অনেকের রক্ত ধারায় মিশ্রিত।

কিন্তু এবারের মতো এত নিলর্জ্জ আত্মীয়-তোষণ অতীতে আর কোনদিন দৃষ্টিগোচর হয়নি। জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্য তিনি প্রায়ই বলে থাকেন পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে তার আর কোন আত্মীয় নেই। বাংলাদেশের মানুষরাই নাকি তার সবচাইতে আপন। কিন্তু ক্ষমতার মসনদে বসেই ভোল পাল্টে যায়। কত কত আত্মীয়স্বজন বের হয়ে আসে।

হাসিনা ক্ষমতারোহণ করে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে। ভদ্রলোক অবসর নিয়ে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছিল। সেখান থেকে এনে তাকে সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অন্য কারো উপর তার আস্থা নেই। সেনাবাহিনী বলেই কোন উচ্চবাচ্য হয় না। অন্যথায় এ নিয়ে প্রচুর আন্দোলন, সংগ্রাম ছিল অবধারিত। এ ধরনের চরম স্বজনপ্রীতি কখনও দেখা যায়নি।

বরিশালের হাসনাতের কথা কারো অজানা নয়। শেখ সাহেব নিজেও তার এই ভাগ্নের উৎপাতে একাধিকবার বিব্রত বোধ করেছেন। সে ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা বা অন্য কোন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা না থাকার পরও তাকেই চীফ হুইপ করা হয়। সে যে আপন ফুপাত ভাই! ফুপাত বোন সৈয়দ হোসেনের মেয়েকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে। সলিমুজ্জামানের স্ত্রীর অন্য সামাজিক পরিচয় নেই। খাদ্যমন্ত্রী তার আত্মীয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী তার আর এক ফুপাত ভাই। চাচাত ভাই সাংসদ সদস্য। আর এক আত্মীয় মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাজনৈতিক উপদেষ্টা। মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে দায়িত্ব অর্পিত। শেষ অবধি এমন আরেক ভাইকে রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে যার সম্বন্ধে কিছু বলতে লজ্জা বোধ হয়। শেখ

www.pathagar.com

পরিবারের সবচাইতে প্রশ্নবোধক চরিত্রের অধিকারী এই লোকটি ব্যতীত তিনি রেড ক্রিসেন্টের মতো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বানাবার আর কাউকে খুঁজে পাননি। এ বিষয়ে অবশ্য বিএনপি'র পদাঙ্ক আর একবার অনুসরণ করেছে। তারাও যাকে এই পদে বহাল করেছিল, তাদের দলের মধ্যেও সে লোকটির স্বভাব-চরিত্র ও কর্মকাণ্ড নিয়ে এত প্রশ্ন ছিল যা বলার মতো নয়।

এক বেগম যদি চলে ডালে ডালে আর একজন চলে পাতায় পাতায়। কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান!

নির্বাচনের পূর্বে গাল ভরা প্রতিশ্রুতির বাহার। চালের ন্যায্য মূল্য, পাটের সঠিক দাম, শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি কত কি ওয়াদার কথা মানুষ ভোলেনি।

প্রথম সুযোগেই বিশেষ ক্ষমতা আইন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার শপথকারীরা আজ কেবলমাত্র বিরোধী দলকে ঠেঙ্গাবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল রাখার পাশাপাশি কঠিনতম বিধান সন্নিবেশিত করে, কোর্ট-কাচারীর ক্ষমতা খর্ব করে, এ্যভিডেন্স এ্যাক্টের বিধান পাল্টিয়ে নতুন করে নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করছে। জন-নিরাপত্তা আইনের নামে জনরোষ প্রতিরোধের প্রয়াস পাচ্ছে। ক্ষমতার রঙিন চশমায় দৃষ্টি ওদের বিভ্রান্ত। তা না হলে ঠিকই হৃদয়ঙ্গম হত জনতার রুদ্র রোষ যখন ফেটে পড়বে কোন আইন বা কোন নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেটা প্রতিহত করা যাবে না। সেদিন সরকারের ক্ষমতার মসনদ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

পিতা করেছিলেন বিশেষ ক্ষমতা আইন। তার দুঃখজনক পরিণতি কেউ ভোলেনি। কন্যা করছেন জননিরাপত্তা আইন। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা অপেক্ষা কর। তাঁর বিধানে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

রেডিও-টেলিভিশনের বিরুদ্ধে তখন কত কথা। ক্ষমতায় গিয়ে এ দুটোকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে। আজ ওরা সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা হাতকাটা কালো কোর্ট পরিহিত স্তাবকদের কীর্তনের চোটে টিভি খোলা দায়। রেডিওতে কান পাতা যায় না। যখন তখনই বাণীর নামে অসার বাগাড়ম্বরের প্রতিধ্বনি বাজানো হচ্ছে। একশ্রেণীর চাটুকারের আর কোন কাজ নেই। কর্ত্রীভজার অভিলাসে এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে পারিবারিক প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

www.pathagar.com

সেদিন দূরে নয় যেদিন সকলকে ক্ষমতার এই দুরপনেয় অপব্যবহারের কারণে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, সেদিন কোন কৈফিয়ত চলবে না, ভুললে চলবে না প্রতিষ্ঠান দুটি কারো পৈত্রিকসম্পত্তি নয়। জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের অর্থেই পরিচালিত।

এ সময় বাইরে অবস্থান করলে হয়ত কিছুটা অবদান রাখার সুযোগ হত। সরকারের চাইতে বিরোধী দলে আমার ভূমিকা পূর্বাপরই অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার যেমন ইচ্ছা, সেভাবেই মেনে নিতে হবে।

একুশ বছরের ব্যবধানে একটা জঘন্য মামলায় আমাদেরকে জড়িয়ে যে সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, তাদের প্রকৃত চেহারা ও কর্মকাণ্ডের কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করা গেল এই উদ্দেশ্যে যে, পূর্বাপর পরিস্থিতি সম্যক অবগত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

মামলার মূল এজাহারে কি আছে জানার উপায় নেই। হাতি, ঘোড়া, ব্যাঙ যা-ই হোক সেটি কখনওই সম্মুখে উপস্থিত করা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথম যেদিন নথি খোলার আবেদন করে সেদিন মূল এজাহারের একটি ফটোকপি পেশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার উপরে কি পরিমাণ অপারেশন চলেছে ভাবা যায় না। চরম জালিয়াতি, শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সেই এজাহারকে পরিবর্তনের বিচিত্র সব প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং পরে নতুন করে প্রস্তুত ফটোকপির ফটোকপি কোর্টে দাখিল করে মামলা রুজুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আইনজীবীগণ দুটি ভিন্নমত পোষণ করে। মুন্সী সাহেব মামলার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও প্রবঞ্চনামূলক মামলা এগুতে না দেওয়ার পক্ষপাতী। তার মতে এসব প্রশ্ন সমাধান না করে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার অমার্জনীয় বেআইনী কার্যকলাপের বিহিত না করে অবৈধ দলিলভিত্তিক মামলা চললে মূলেই গলদ থেকে যাবে এবং ন্যায়বিচার দূরের কথা, কোন বিচারই হবে না।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করে এসব খুঁটিনাটি এই পর্যায়ে সরকারের দৃষ্টিতে আনা হলে তারা একটা গ্রহণযোগ্য বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে। দীর্ঘসূত্রিতায় না গিয়ে মামলা সমাধা করাটাই অধিকতর

www.pathagar.com

অভিপ্রেত। বিচারকালে এই সব বিচ্যুতির ফায়দা পাওয়া যাবে। খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং অন্যান্যরা এই ধারণাই পোষণ করে।

আমার অন্য দু'সতীর্থের পক্ষ থেকে পরপর কয়েকটি দরখাস্ত কোর্টে পেশ করা হয়। সেগুলোরও আজ পর্যন্ত পুরো বিহিত হয়নি। চার্জ গঠন করার জন্য তারিখের পর তারিখ পড়ছে। মামলা এগুতে পারছে না। কী করে এগুবে? চার্জ গঠন করতে গিয়ে প্রথমেই বিবেচনায় আসে সরকার আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি ধারামতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে। সহজ করে বুঝার জন্য এভাবে বলা চলে, দণ্ডবিধির এই ধারাতে কোন মামলা চালাতে হলে এ সম্বন্ধে অভিযোগটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ কগ্‌নিজেন্স বা আমলে নিতে হবে। কিন্তু দেখা যায় ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বিচারের জন্য মামলাটি সেশন আদালতে প্রেরণের পর অদ্যাবধি সেটার কগ্‌জিগেন্স নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ বিচারযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে আমলে নেওয়া হয়নি।

এ সম্বন্ধে বাংলাদেশে ফৌজদারী বিধান কোষের ১৯৬ (ক) ধারায় রয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার নিকট হতে আদেশক্রমে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ দায়ের না হলে কোর্ট এ বিষয়ে কগ্‌নিজেন্স নেবে না। ইংরেজিতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, No court shall take cognizance এর প্রণিধানযোগ্য বিষয়, এই মামলার দণ্ডবিধির ১২০বি ধারার বিধানমতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্মকর্তার নিকট থেকে এই মর্মে কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। ফলত, আইনের অবশ্য পালনীয় বিধান লঙ্ঘন করে উপরোক্ত ধারা সন্নিবেশিত করা বিধি বহির্ভূত হয়েছে। সে কারণেই উক্ত ধারায় চার্জ গঠন বেআইনি হবে। এবম্বিধ কারণে ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধের সম্বন্ধে অভিযোগ গঠনের পুলিশী তৎপরতা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সমতুল্য। কাল্পনিক ধারণাপ্রসূত জটিলতা ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে তদন্ত কর্মকর্তা এই ধারার অভিযোগ গঠনের বেআইনি পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হলে '৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে প্রদত্ত ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম আদেশটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেদিনই প্রথম বিষয়টির বিচারকার্যের সূত্রপাত হয়। জি.আর.ও দক্ষিণের আবেদনের সঙ্গে লালবাগ থানার মামলা নম্বর ১১

www.pathagar.com

(১১) '৭৫-এর এজাহারের একটি ফটোকপি সন্নিবেশিত করে বিচারের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সেদিন তার আদেশে ১২০বি ধারার আমল বা কগ্‌নিজেন্স নেয় না। সেদিনের তার আদেশের মূল এবং সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ,

'জি.আর.ও দক্ষিণ এর আবেদন দেখিলাম। তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে অত্র মামলা সংক্রান্ত এজাহারের ফটোকপিসহ নথি খোলার অনুমতির আবেদন করিয়াছে। আবেদন মঞ্জুর।'

ম্যাজিস্ট্রেটের উপরোক্ত আদেশে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, '৭৫ সালে রেকর্ডকৃত এজাহারের ফটোকপি সেদিন কোর্টে পেশ করা হয়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ ধারা বলে '৭৫ সালে এদেশে দু'প্রকারের ছাপান এফআইআর ফরম ব্যবহৃত হত। একটি বাংলায়, অপরটি ইংরেজিতে। বিষয়টি সম্যক উপলব্ধির জন্য নিম্নে ফরম দুইটির ইংরেজি ও বাংলা কপি সন্নিবেশিত করা গেল।

EP. From No. 5356 A No. 769746

FIRST INFORMATION REPORT

(PR. R.B. Form No. 38-Vide Rule 200)

First information of a cognizable crime reported under section 154 criminal precedence code

at police station.....

Sub division..... District.....

No..... Date and hour of occurrence.

Date and hour when reported.	Place of occurrence and distance and direction from police station and jurisdiction number	Date of dispatch from police station

www.pathagar.com

N.B.- A first information must be authenticated by signature, mark of thumb impression of informant and attested by the signature of the officer recording.

Name and residence of informant and complaint 1	Name and residence of the accused 2	Brief description of offence with section and of property carried off, if any 3	Steps taken reqarding investigation, explanation of delay regarding information 4	Result of the case 5

(FIRST INFORMATION TO BE RECORDED BELOW)

Note- The signature, seal or mark of informant shouted be affixed at foot of the information.

Signature.....

Designation.....

EPFP (---) Doc. No. 456/63-64-25M. Bks 1964

বি.পি. ফরম নং ২৭

বেঙ্গল ফরম নং ৫৩৫৬ প্রাথমিক তথ্য বিবররণী ১৪২৫৪৪

(নিয়ন্ত্রণ নং ২৪৩)

থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য

মহকুমা.....

জেলা.....

নং ঃ ..... ঘটনার তারিখ ও

সময়.....

পেশ করার তারিখ ও সময়	ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নং	থানা হইতে প্রেরণের তারিখ

www.pathagar.com

বিঃ দ্রঃ - প্রাথমিক তথ্য অবশ্যই সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি সম্বলিত এবং লিপিবদ্ধকারী অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

সংবাদ দাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান / ঠিকানা	আসামির নাম ও বাসস্থান / ঠিকানা	ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তদন্ত চালনার কর্মতৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত	মামলার ফলাফল

(প্রাথমিক তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)

স্বাক্ষর.....

পদমর্যাদা.....

নোট : তথ্যের পাদদেশে সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি থাকিতে হইবে।

বাঃ সঃ মুঃ রেজঃ নংঃ ১০০০১ জে/৭৪-৭৫ ১০ হাজার বহি ১৯৭৪।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ৯-৯-৯৬ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট লালবাগ থানার ১১ (১১) ৭৫ নম্বর মামলার এজাহারের ফটোকপি পেয়েছিলেন এবং সেই মর্মে সেই তারিখের আদেশে সেটা উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীতে কোর্টে দাখিলকৃত সেই ফটোকপি বেআইনিভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেটিকে আদালতের নথি থেকে সংগোপনে সরিয়ে গায়েব করে দেওয়া হয় এবং জালিয়াতিপূর্বক মূল এজাহার থেকে গৃহীত বলে একটি নতুন ফটোকপি চুপিসারে আদালতের নথিতে রেখে দেওয়া হয় এবং এক অনির্ধারিত তারিখে সেটিকে সেশন জজের আদালতে প্রেরণ করা হয়। আরও প্রণিধানযোগ্য যে, এই মামলায় আর একটি অনির্ধারিত দিবসে ১৮-১০-৯৮ তারিখে চার্জশিট দাখিল করা হয় এবং আর এক অনির্ধারিত তারিখ ৪-১১-৯৮তে কোর্টে সেটি গৃহীত হয়। কোন তারিখেই আমাদেরকে কোর্টে উপস্থিত করা হয় না। যদিও আইনের বিধানে বলে, অভিযুক্তদের উপস্থিতিতেই চার্জশিট দাখিল ও গৃহীত হবে। এই মামলার বিচারাধীন অভিযুক্তরা জেল হাজতেই রয়েছে। জেলগেটে কোর্টের অবস্থান। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই লুকোচুরির কারণ কি? অনির্ধারিত তারিখে চার্জশিট কেন দাখিল হয়? আর এক অনির্দিষ্ট সময়ে সেটা কেন আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়?

www.pathagar.com

কেন অভিযুক্তদেরকে উপস্থিত করা হয় না? তাদের অগোচরে এ সমস্ত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ যে বেআইনি সেটা কেন তারা বিবেচনায় নেয় না?

সবকিছু পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা মোটেই অমূলক নয় যে বাদীপক্ষের অনভিপ্রেত দুরভিসন্ধি প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, চার্জশিটে উল্লেখিত দলিলাদির তালিকার বহির্ভূত অন্যকোর্টে অন্য মামলায় ব্যবহৃত কিছু কাগজপত্র অত্র আদালতের অত্র নথিতে এক অনির্ধারিত তারিখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাদীপক্ষের এই গর্হিত আচরণ কেবলমাত্র আদালত অবমাননারই সামিল নয়, এটা আইনের প্রতিও চরম অবমাননার নামান্তর।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, প্রথমত ম্যাজিস্ট্রেট আটকাধীন অভিযুক্তদের উপস্থিতিতে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধের আমল নিতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ত, ফৌজদারী বিধান কোষের ১৬৪ ধারামতে প্রদত্ত জবানবন্দি, যাহা বিচার্য বিষয়ের অবিচ্ছেদ অংশ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তৃতীয়ত, চার্জশিটে উল্লেখিত কাগজপত্রের তালিকা পরীক্ষান্তে আদালতের নথিভুক্ত করতে ব্যর্থ হন এবং চতুর্থত, বিধান কোষের ১৬১ ধারামতে প্রদত্ত জবানবন্দিসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার পর সেশন আদালতে প্রেরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। বাদীপক্ষের উপরোক্ত আচরণে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেট তার উপর অর্পিত বিচার কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হন না এবং ফৌজদারী বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারার অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ পালনে ব্যর্থ হন। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্ট এ বিষয়ে যে রায় প্রদান করেছে তারও লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়।

বিচারাধীন বিষয়ে উপরে উল্লেখিত জালিয়াতির চরিত্র, সূক্ষ্মকৌশল ও গর্হিত কার্যাবলীকে নিম্নে উল্লেখিত সাতটি পর্যায়ে উপস্থাপনা করা যায়।

প্রথম পর্যায়—সর্বাগ্রে এটা বিবেচ্য যে, ৯-৯-'৯৬ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মূল এজাহারের ফটোকপি দাখিল করা হয় এবং পরবর্তী একসময়ে সেটি সরিয়ে তদস্থলে এজাহারের একটি জাল ফটোকপি রক্ষিত হয়। সে কারণেই চার্জশিট দাখিলের পর ১৮-১০-'৯৮ তারিখের আদেশবলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট জি.আর. ওকে এ সম্বন্ধে লিখিত ব্যাখ্যা বা প্রতিবেদন প্রদানের নির্দেশ দেন। তার সেই আদেশে মূল এজাহারের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন রয়েছে।

www.pathagar.com

আদেশটি নিম্নরূপ ঃ

"এজাহারের ফটোকপিতে জি.আর নং ঃ ১০৬৯৮/৭৫ লেখা আছে। উক্ত মামলার নথিসহ এবং মূল এজাহার উপস্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট জি. আর, ওকে বলা হইল। উক্ত নথি অথবা মূল এজাহার পাওয়া না গেলে এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জি.আর.ও একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত প্রতিবেদন আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

সি.এস. গৃহীত সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আগামী তারিখ ধার্য।"

স্বা / মোঃ আবদুস সালাম মিয়া
এম.এম. ঢাকা।

প্রণিধানের বিষয়, জি.আর.ও. একজন কোর্ট কর্মচারী। সে কোন তদন্তকারীরূপে কাজ করতে পারে না। সে কোন তদন্ত এজেন্সীর সদস্য হতে পারে না। কোন তদন্তানুষ্ঠান করা তার এখতিয়ার বহির্ভূত। কেস রেকর্ডদৃষ্টে এটা প্রতীয়মান হয় এই জালিয়াতিতে সে জড়িত। তার সাহায্য ব্যতিরেকে বাদীপক্ষ এই অপরাধ সংঘটিত করতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্যায়—বর্তমানে আদালতে রক্ষিত নথিতে এজাহারের যে তথাকথিত ফটোকপি রয়েছে সেই ফরমে নিম্নোক্ত ইংরেজি ছাপা শব্দ বা বাক্যসমূহ অনুপস্থিত :-

(a) Form No.....
(b) First Information Report No.....
(c) P.R.B. Form No.....
(d) Name and Residence of Informant and Complainant
(e) Name and Residence of Accused
(f) Brief description of offence with section and of property carried off if any.
(g) Steps taken regarding investigation.
(h) Result of the case
(i) EPGP (J) DOC NO.....

তৃতীয় পর্যায়—বাদীপক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, লালবাগ থানার ১১(১১)৭৫ মামলায় এজাহারে বাংলা ফরম ব্যবহার করা হয়েছে। সেই মামলায় এজাহারের যে ফটোকপি এখন আদালতের নথিতে রক্ষিত

www.pathagar.com

আছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বাংলা ছাপা শব্দ বা বাক্যসমূহ নেই।

(ক) বি.পি. ফরম নং.....।

(খ) বেঙ্গল ফরম নং .....।

(গ) প্রাথমিক তথ্য বিবরণী নং .....।

(ঘ) নিয়ন্ত্রণ নং ২৪৩.....।

(ঙ) থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারার ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য।

(চ) সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানা।

(ছ) আসামির নাম ও বাসস্থান/ঠিকানা।

(জ) ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ঝ) তদন্ত মামলার কর্মতৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত।

(ঞ) মামলার ফলাফল।

এফআইআরের ফটোকপিতে উপরোক্ত বিষয়সমূহ না থাকায় সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, এই পরবর্তী ফটোকপি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিজহস্তে প্রস্তুত, জাল এবং তার মস্তিষ্ক উদ্ভুত।

চতুর্থ পর্যায়—এই মুহূর্তে আদালতের নথিতে এফআইআরের যে ফটোকপিটি রক্ষিত আছে তার এক নং ছক বা ঘরে The Name and residence of informant and complainant এই ছাপা শব্দগুলো বা বাক্যটি নেই। তা সত্ত্বেও কলমের প্রেসারে একটি চতুষ্কোণ ছক প্রস্তুত করে তাকে নিম্নোক্তভাবে পূরণ করা হয়েছে ঃ

কে.এ. আউয়াল ডি.আই.জি of prisons Dacca Divn. Central jail, Dacca.

ছকটিতে ইংরেজিতে লেখা "of prisons Dacca Divn.Central jail Dacca." বলে দেয় ফটোকপির অপর পৃষ্ঠায় একই হস্তাক্ষরে সংবাদদাতার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত কথাগুলো স্থান পেয়েছে ঃ

Sd. K.A. Awal, D.I.G of the Prison, Central jail Dacca, Dated 4-11-75

উপরে উল্লেখিত সুচতুর লেখালেখিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিচারাধীন বিষয়ে বাদীপক্ষের তরফ থেকে প্রচণ্ড জালিয়াতি, অপব্যাখ্যা, প্রতারণা ও জাল-জোচ্চুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মসি চালনের রীতি, কলমের চাপ, ধরন পদ্ধতি ও সে লেখার আঁচড় সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয়

www.pathagar.com

লালবাগ থানার মামলা নং ১১ (১১) '৭৫-এর ফটোস্ট্যাট কপিতে বাদীপক্ষ সাফল্যজনকভাবে বিচার্য বিষয়ের স্বাধীনতা খর্ব করে তাকে নষ্ট করেছে। ফলে এজাহারের হাতে তৈরি একটি জাল-কপি প্রস্তুত করে নথিভুক্ত করে বিচারে বিভ্রান্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং আইন প্রয়োগে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশের অপরাধ জগতের ইতিহাসেই কেবল নয়, এ ধরনের জাজ্জ্বল্যমান জালিয়াতি এই উপমহাদেশের অপরাধ জগতেও বিরল।

পঞ্চম পর্যায়—এজাহারের উপরোক্ত জাল ফটোস্ট্যাট কপি নথিভুক্ত করার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধান কোষের ১৬১ ধারামতে সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আইনের বিধানমতে প্রতি সাক্ষীর জবানবন্দি পৃথক পৃথকভাবে তদন্ত কর্মকর্তার স্বহস্তে লেখা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু একবার জালিয়াতি করে তার বুকের পাটা বেড়ে গেছে। সে এক বৈঠকে অন্য লোক দিয়ে সেইসব জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিয়ে তার উপরে অস্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধকারী হিসাবে নিজ স্বাক্ষর রাখে।

আইন বলে, তদন্তকারী অফিসারকে স্বহস্তে এইসব জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোন কারণে সে নিজে লিপিবদ্ধ করতে অপারগ হলে যাকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করাবে তার স্বাক্ষর থাকবে এবং সেখানে তদন্তকারীর কৈফিয়ত থাকতে হবে। তাকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে, কি কারণে সে নিজে লিখতে পারেনি এবং কাকে দিয়ে কোন অবস্থায় লিখাতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে তা না করে এক বৈঠকে অজানা লোকদের দিয়ে লিখিয়ে সেটা নিজের নামে চালাবার প্রয়াস দু'প্রকারের অপরাধ সংঘটিত করেছে। প্রথমত, আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং দ্বিতীয়ত, নিজেকে লিপিবদ্ধকারী হিসাবে দেখিয়ে চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তার এ ধরনের অপরাধপ্রবণ আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সে পাবলিক ডকুমেন্ট প্রস্তুতে অবাধ জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে। এই জবানবন্দিসমূহের অভিন্ন পেন প্রেসার, পেন-হোল্ডিং এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক একই কালি ব্যবহারের বিষয়টিও উপলব্ধিতে নেওয়া বিধেয়। বিষয়টি সেশন আদালত হয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সেসব অবলোকন করেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে মন্তব্য করেন কমপক্ষে তিন ধরনের লেখা সেখানে বিদ্যমান

www.pathagar.com

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা তিনটি জবানবন্দির নকল তাদের কাছে রেখেও দেন। তারা অন্তত তিনটি ভিন্ন লেখা অবলোকন করেন। তাদের রায়ে সে কথা উল্লেখ করেন। যথাসময়ে ট্রায়ালকোর্টে সে রায় পৌঁছলে এই তিন লিখকের নাম জানতে চাওয়া হয়। জজ সাহেব আদেশ দেওয়ার পরও বাদী পক্ষ বোধগম্য কারণে নাম না জানিয়ে নানা টালবাহানায় সময় ক্ষেপণ করে।

দলিল মূলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এই অভিযোগটি নিঃসন্দেহভাবে একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ চার্জশিটে নিজেকে ১৬১ ধারার জবানবন্দিসমূহের লিপিবদ্ধকারী হিসাবেই কেবল মিথ্যা পরিচয় দেয়নি, সে সেই সব জবানবন্দির উদ্ভাবক এবং রচয়িতাও বটে। বিধান কোষের ১৬১ ধারামতে লিখিত সকল জবানবন্দিই তার মস্তিষ্কপ্রসূত। পাবলিক ডকুমেন্ট প্রণয়নে এ ধরনের অপরাধ বাংলাদেশ দন্ড বিধির ১৬৬, ১৬৭, ৪৭১ ধারার আওতায় পড়ে। ১৯৪৭ সালের দুর্নীতিদমন আইনের বিধানেও এটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ষষ্ঠ পর্যায়, দেশের ফৌজদারী বিধান কোষের ১৬৪ ধারামতে যে জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করবেন সেটা বিধান কোষের ৩৬৪ ধারায় নির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু এই জবানবন্দি বিচার্য নথির অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু আইন জবানবন্দি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে এ ক্ষমতা দেয় না যে, তিনি সেই জবানবন্দি পুলিশের হেফাজতে প্রদান করে দেবেন। কিন্তু এই মামলার ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ সবের উপর যথেচ্ছা আচরণ সম্ভব হয়েছে এবং তাদের রূপান্তর ঘটানও অসম্ভব নয়। পরিণতিতে বিচারকার্যে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তম পর্যায়, বাংলাদেশের ফৌজদারী বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারায় অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ মামলার নথি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে সেশনকোর্টে প্রেরণের সময় পালন করা হয়নি। বরং আইনের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। মামলার নথি এবং এজাহারের মূল কপির পরিবর্তে যখন জাল নকল কপি প্রেরণ করা হয় তখন তার সাথে ১৬১ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দিসমূহ এবং ১৬৪ ধারার জবানবন্দি প্রেরণ করা হয় না। চার্জশিটে তালিকাভুক্ত দলিলাদিও সেশন আদালতে সে সময় প্রেরণ করা হয় না।

বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারার নির্দেশাবলী এবং ৩৫ ডিএলআর

www.pathagar.com

এর ১৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিচারপতি মোঃ হাবিবুর রহমান এবং বিচারপতি মোস্তফা কামাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অবশ্য পালনীয়। ম্যাজিস্ট্রেট এটা ভালোভাবেই অবগত রয়েছেন যে, সেশন আদালত কোন অবস্থাতেই সরাসরি বাদীপক্ষের নিকট হতে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে না। দেশের প্রচলিত আইন পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয় ম্যাজিস্ট্রেট মামলার নথি বিচারের জন্য সেশন আদালতে প্রেরণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রেরণ করবেন। কিন্তু এই মামলায় প্রত্যক্ষ করা যায়, চার্জশিটে তালিকাভুক্ত ১ থেকে ৫৩ পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরের দলিলাদি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়নি, তার আদেশনামায় সেসবের উল্লেখ ঘটেনি এবং সেগুলোকে সেশন আদালতে প্রেরণ করা হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১ ধারায় বিধান এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

উপরে উল্লেখিত সাতটি পর্যায় পর্যালোচনা করলে এটা প্রতীয়মান করা কষ্টসাধ্য নয় যে, এজাহারের জাল ফটোকপিতে ম্যাজিস্ট্রেট 'দেখিলাম' বলে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা পরে কোনও একসময় সন্নিবেশিত হয়েছে। এটাও বিচারাধীন নথিতে বাদীপক্ষের প্রতিদিনের অন্যায় হস্তক্ষেপেরই একটি নিদর্শন। বাদীপক্ষের এইসব অন্যায় আচরণ এবং বিচার্য নথিতে নিত্যকার জালিয়াতির কারণেই বিবাদীপক্ষ বহুবার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও তাদেরকে এজাহার এবং অন্যান্য বিতর্কিত দলিলের সই মোহরকৃত নকল প্রদান করা হয় না। এটাও আইনের বিধান লঙ্ঘনেরই সামিল।

আজ আমাদের এই উপসংহারে আসতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, বাদীপক্ষের এইসব গর্হিত আচরণের পশ্চাতে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের সমর্থন এবং উৎসাহ ছিল। তাদের উদ্ধত আচরণ এ পর্যায়ে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, আমাদেরকে ২৯-৯-'৯৮ তারিখে রাতের শেষ প্রহরে গ্রেপ্তার করে ৩-১০-'৯৮ তারিখ পর্যন্ত পুলিশের রিমাণ্ডে তাদের হেফাজতে রাখে। তদন্তকারী কর্মকর্তা বানোয়াট ১৬১ ধারার জবানবন্দি প্রস্তুত করে আমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধারাসহ দণ্ডবিধির ১২০বি ধারায় চার্জশিট প্রদানের উদ্যোগ নেয়। সে যে কি পরিমাণ ক্ষমতার অপব্যবহার বা বাড়াবাড়ি করে তা বলার নয়। মামলার সকল কাগজপত্রেই তার অশুভ হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, জালিয়াতি করে, নতুন এজাহারের কপি প্রণয়ন করে, মিথ্যা সাক্ষী তৈরি

www.pathagar.com

করে, তাদের মুখে নিজের অভিরুচি মাফিক বক্তব্য এনে সে এই মামলায় অবিমৃশ্যকারীতার চূড়ান্ত রেকর্ড স্থাপন করে। যেনতেন প্রকারে আমাদেরকে অভিযুক্ত করে শাস্তি দিতে পারলে তার মোক্ষ লাভ ঘটবে!

১৫-১০-'৯৮ তারিখে তথাকথিত চার্জশিট প্রদান করা হয়। ১২০বি ধারায়ও অভিযুক্ত করা হয়। '৯৮-এর শেষ ভাগে আমাদের গ্রেপ্তারের পর মিথ্যা, বানোয়াট ও বিলম্বিত যেসব ১৬১ ধারার জবানবন্দিমতে এই চার্জশিট দাখিল হয় সেসব বিচার কার্যের আওতায় বহির্ভূত রাখা বিধিসম্মত। এ সম্বন্ধে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ যে নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন তা ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালের বিএলডিতে প্রকাশিত হয়েছে।

কোন জালিয়াতি উদ্ঘাটিত হলে বা জাল-জোচ্চুরি ধরা পড়লে বাদী পক্ষকে কোন অবস্থাতেই তাদের কৃত অপকর্মের সুযোগ নিতে দেওয়া বিধেয় নয়। এই মামলায় বাদীপক্ষ অন্যায়ভাবে অন্য মামলার কিছু কিছু কাগজ আমদানী করতে সক্ষম হয়েছে। সেগুলো এখনও অন্যত্র বিচারাধীন বিষয়বস্তু। বিচারকার্য চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়নি। কিন্তু বাদীপক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটকে যেভাবেই হোক সম্মত করিয়ে একটি অনির্ধারিত তারিখে চার্জশিটের সাথে সেইসব তালিকা বহির্ভূত দলিলাদিও বিচারের নথিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুষ্ঠ বিচারের পরিপন্থি এই অবৈধ কার্যক্রম মেনে নেওয়া যায় না।

কোর্টে নিবেদন করা হয়, বিধান কোষের ২৬৫ ক, খ ও গ ধারামতে কেবলমাত্র সেশন আদালতে বিচার্য অপরাধের বিষয়ে সর্বদা প্রশ্নাতীতভাবে খাঁটি দলিলাদির ভিত্তিতেই বিচারকার্য সমাধা করতে হবে। কোন অবৈধ বা জাল দলিল মূলে বিচার করা চলবে না। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে প্রশ্নের নিষ্পত্তি সর্বাগ্রে করে নিতে হবে।

বাদীপক্ষ দু'ধরনের অপরাধ করেছে। প্রথমত, আদালত অবমাননা এবং দ্বিতীয়ত বিচারাধীন নথিতে জালিয়াতি। আদালত অবমাননার অভিযোগের বিচার সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অরিজিনাল জুরিসডিকশনের আওতাভুক্ত। দ্বিতীয় অভিযোগ অর্থাৎ বিচারাধীন বিষয়ে জালিয়াতির বিচার একজন প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ১৯৫৮ সালের অপরাধ আইনের সংশোধনীমতে এ কাজের জন্য নিযুক্ত কোন বিশেষ জজকে করতে হবে। ফৌজদারী বিধান কোষের ৪৭৬/১৯৫ ধারার বিধানসমূহের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে এবং এ সম্বন্ধে

www.pathagar.com

দায়েরকৃত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। উত্থাপিত বিষয়টিতে সম্যক উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হাইকোর্ট বিভাগ সেটি যে কোন সময়ই পর্যালোচনা করতে পারে।

সে কারণে আদালতে নিবেদন করা হয়, যাতে এজাহারের তথাকথিত ফটোকপি, ১৬১ ধারা এবং ১৬৪ ধারার তথাকথিত জবানবন্দি এবং ৪-১১-'৯৮ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত চার্জশিট বহির্ভূত কাগজ-পত্রাদি বিচারকের হেফাজতে তালা-চাবি দিয়ে রাখা হয়। আরও নিবেদন করা হয় যাতে বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্ট রেফারেন্স করা হয় যাতে তদন্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশী তদন্ত বাতিল হয়।

ভূতপূর্ব জজ জনাব রেজোয়ান আলীর বরাবরে এসব নিবেদন উত্থাপিত হলেও সে সম্বন্ধে কোন আদেশ প্রদত্ত হয় না। বরং অন্যতম ঘাতক এ.আলী বিষয়ক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে একটি ভ্রান্ত আদেশবলে বিষয়টিতে পুনতদন্তের নির্দেশ দেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, বিষয়টি গড়িয়ে হাইকোর্টে গেলে পুনঃতদন্তের আদেশ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায় এবং অন্যান্য উত্থাপিত বিষয়ে ট্রায়াল কোর্টকে নিষ্পত্তির পরামর্শ দেওয়া হয়।

তদন্ত কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দের অপকর্মসমূহের বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ফৌজদারী বিধান কোষের ১৯৫ এবং ৪৭৬ ধারামতে কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করা হয়। তার বিরুদ্ধে দত্তবিধির ১৬৬, ১৬৭, ৪৬৩, ৪৭১ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারামতে কৃত অপরাধের জন্য আবেদনে বলা হয়, সে লালবাগ থান্না মামলা নং ১১ (১১) ৭৫ তদন্তকালে এ সমস্ত অপরাধ সংঘটিত করেছে।

এই মামলার চার্জশিটের সই-মোহর নকল, তথাকথিত এজাহারের ফটোস্ট্যাট কপি, ১৬১ ধারামতে গৃহীত সাক্ষীদের জবানবন্দির ফটোস্ট্যাট কপি, ম্যাজিস্ট্রেটের বিভিন্ন তারিখের প্রদত্ত আদেশের সই-মোহর নকল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পবিদৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত অভিযুক্ত আবদুল কাহার আখন্দ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম এবং পাবলিক ডকুমেন্টে আপাতদৃষ্টিতে দণ্ডবিধির

www.pathagar.com

১৬৬, ১৬৭, ৪৬৩, ৪৭১ ধারায় এবং দুর্নীতি দমন আইনের ৫ (২) ধারায় অপরাধ সংঘটিত করেছে।

দেশের সাক্ষ্য আইনের ৫৮ ধারার বিধানমতে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৬৬, ১৬৭, ৪৬৩, ৪৭১ ধারায় কৃত অপরাধের বিচারকার্য শুরু করার জন্য কোন প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন নেই। নথিভুক্ত বস্তুগত তথ্যের ভিত্তি এবং মামলার বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে প্রস্তাবিত অভিযুক্ত অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ প্রচণ্ড জালিয়াতির মাধ্যমে এই মামলায় চার্জশিট প্রদান করে এবং জাল-জোচ্চুরি, অবপ্যাখ্যা ও প্রতারণাপূর্বক এই মামলায় জাল দলিলাদির ব্যবহার ঘটায়। তার কার্যাবলীকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনায় আনা যায়।

(ক) অত্র মামলায় নিম্ন আদালতে ৯-৯-'৯৬ এবং ১৮-১০-'৯৮ তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দুটির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি উপলব্ধিতে আসে। আদেশ দুটির হুবহু কথাগুলো পূর্বে এ কারণেই উদ্ধৃত করা গেছে।

উপরের দুটি আদেশই নথির অবিচ্ছেদ্দ অংশ। সে কারণে অনুসন্ধান বা তদন্তের মাধ্যমে সেসব প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না। এই দুটি আদেশ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, ৪-১১-'৭৫ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডিআইজি কে.এ.আউয়াল লালবাগ থানায় যে এজাহার দায়ের করে তার থেকে গৃহীত ফটোকপি ৯-৯-'৯৬ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত করা হয় এবং সেই মূল এজাহারে কোন অভিযুক্তের নাম ছিল না। থাকলে সেই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট তার সেদিনের আদেশে উল্লেখ করতেন এবং আমলে এনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করতেন। পরবর্তী সময়ে মূল এজাহার থেকে গৃহীত সেই ফটোকপি সরিয়ে ফেলা হয় এবং হাতে তৈরি একটি জাল ফটোকপি মূল এজাহারের ফটোকপি বলে সেশনকোর্টে প্রেরণ করা হয়।

(খ) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ ধারামতে ১৯৭৫ সালে দেশে ইংরেজি ও বাংলা দু'প্রকারের ছাপান এফআইআর ফরম প্রচলিত ছিল। এই ফরম দুটির হুবহু নকলও পূর্বে তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে এর বাস্তব চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সব বিষয়বস্তু প্রাথমিক তদন্তপূর্বক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এগুলো সবই পাবলিক ডকুমেন্ট। এফআইআরের

www.pathagar.com

ইংরেজি এবং বাংলা ফরম এবং জাল ফটোকপি সবই এখন বিচার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং কোর্টে রক্ষিত। সে কারণে সাক্ষ্য আইনের ৫৭ ধারামতে এইসব বিচার্য কাগজপত্রে আইনানুগ দৃষ্টি প্রদান বিধিসম্মত। এটা উল্লেখ বাঞ্ছনীয় যে, ১৯৭৫ সালে কোন কার্যালয়ে বা থানায় ফটোস্ট্যাট মেশিন ছিল না।

(গ) বর্তমানে কোর্টে নথিভুক্ত যে জাল এফআইআরের ফরমটি রয়েছে তাতে ১৯৭৫ সালের ফরমের যেসব শব্দ এবং বাক্য নেই তাও পূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে। এফআইআরের এই ইংরেজি ও বাংলা ফরমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কোর্টে রক্ষিত বর্তমান ফরমটি পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করে যে নথিভুক্ত এই ফটোকপিটি হাতে প্রস্তুত এবং পরে সেখানে আসামি মোসলেমউদ্দীনের নাম সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাতে তার সঙ্গে অন্যান্যদের একটি মিথ্যা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে অপরাধের সঙ্গে জড়িত করা যায়।

(ঘ) জাল এফআইআরের প্রথম পাতা এবং তার অপর পৃষ্ঠায় তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষরের যে চিত্র ফুটে রয়েছে তা অবলোকন করলে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অভিহিত হওয়া যায়। পূর্বে উল্লেখিত হলেও পাশাপাশি দুটি চিত্রই পুনরায় তুলে ধরা গেল।

কে.এ.আউয়াল	Sd.K.A.Awal
ডি.আই.জি	D.I.G. of the prisons
Of prisons	Central jail Dacca
Dacca Divn	Dated-4-11-75.
Central jail	
Dacca	

এই সুচতুর হস্তলিপির পেনপ্রেসার, পেন হোল্ডিং এবং আঁচড় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি এক হাতে, এক কলমে, এক রচয়িতা দ্বারা লিখিত। এও নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় যে, এর স্থপতি অন্য কেউ নয় বরং এফআইআরের এই জাল ফটোকপি নির্মাণ এবং পাবলিক ডকুমেন্টে এ ধরনের মারাত্মক অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রস্তাবিত অভিযুক্ত আবদুল কাহার আখন্দেরই কাজ।

ঙ) মিথ্যা জাল এফআইআরের ফটোকপিতে বলীয়ান হয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী বিধান কোষের ১৬১ ধারামতে সাক্ষীদের

www.pathagar.com

জবানবন্দি গ্রহণে রত হয়। বিধানমতে প্রতিটি জবানবন্দি নিজহস্তে লিপিবদ্ধ না করে সে অজানা লিপিবদ্ধকারীদের দ্বারা এক বৈঠকে এই সমস্ত দলিল প্রস্তুত করে এবং প্রতিটি জবানবন্দিতে নিজের অস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে নিজেকে লিপিবদ্ধকারী হিসাবে দেখাতে প্রয়াস পায়। তার এই বেপরোয়া আচরণে দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রথমত, আইনের বিধান লঙ্ঘন এবং দ্বিতীয়ত, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে লিপিবদ্ধকারীরূপে দেখান। ট্রায়ালকোর্টে এবং হাইকোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু কিছু সাক্ষীর জবানবন্দির নকল পেশ করা হয়। হাইকোর্ট এ সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত হয়ে নিম্ন আদালতকে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়।

প্রথমে সরকার পক্ষ হাইকোর্টে এফিডেভিটের মাধ্যমে বলেছিল, সকল জবানবন্দি তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বহস্তে লিখিত। কিন্তু পরে এটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে স্বীকার করতে বাধ্য হয় অন্তত তিন হাতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিগত ১২-৪-২০০০ তারিখে হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক এই বিষয়ের উপরে যে রায় প্রদান করেন সেটি প্রণিধানযোগ্য। বিবাদীপক্ষ থেকে যে ফৌজদারী রিভিশন করা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে সে রায়ের মধ্যে এই মামলায় বাদী পক্ষের অনেক বিচ্যুতি এবং অপকর্মের দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে। মাননীয় বিচারপতি হামিদুল হক তার রায়ে মন্তব্য করেন যে, নিম্ন আদালত থেকে মামলার নথি সেশন আদালতে প্রেরণকালে বিধানমতে যে সমস্ত ডকুমেন্ট প্রেরণ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। ১৬১ ধারা ও ১৬৪ ধারার জবানবন্দি নথির সঙ্গে প্রেরণ না করে বাদীপক্ষ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাতে অভিযুক্ত বিবাদীপক্ষের স্বার্থহানির আশু সম্ভাবনা বিদ্যমান।

সময়মতো দরখাস্ত দাখিল করার পরও মামলায় জবানবন্দির সই-মোহরকৃত নকল পাওয়া যায় না। বোধগম্য কারণে সে সমস্ত জবানবন্দি বাদীপক্ষ নিজেদের হেফাজতে রাখে এবং সুবিধামত তার মধ্যে বেআইনি হস্তক্ষেপ করে। শুধু তাই নয়, বিলম্বে যে নকল পাওয়া যায় তার মধ্যে ৪৬টি জবানবন্দির ৩৫টিতে লিপিবদ্ধকারী হিসাবে জনৈক এ.বি.এম. ফজলুল করিমের নাম পাওয়া যায়।

কোর্টের নকল বিভাগের কর্মীদের ভুলবশত এ ধরনের বিভ্রান্তি

www.pathagar.com

ঘটেছে বলে সরকার পক্ষ বিষয়টি ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। মাননীয় বিচারপতি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে ট্রায়ল কোর্টকে একটি পূর্ণ তদন্ত অনুষ্ঠান করে সার্বিকভাবে তা সমাধার নির্দেশ দেন। তার রায়ে বিচারপতি এটাও উল্লেখ করেন যে, তাদের নির্দেশে হাইকোর্টে পেশকৃত মূল জবানবন্দি পর্যালোচনা করে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জবানবন্দিগুলো কমপক্ষে তিন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত। হস্তলেখা তা প্রমাণ করে। বিচারাধীন কোর্টে বিষয়টির নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। সে রিভিশন মামলার দরখাস্ত অবস্থাদৃষ্টে নামঞ্জুর হলেও সেদিনের রায়ে যে সমস্ত আইনগত নির্দেশাবলী রয়েছে সেশন আদালত সেসবের নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত বিবাদীপক্ষ অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে সুবিচারের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত।

বিধানানুযায়ী নথির সঙ্গে প্রয়োজনীয় জবানবন্দিসমূহ প্রেরণ না করা, সে সব বেআইনিভাবে নিজেদের কাছে রাখা, সই-মোহরকৃত নকল বিবাদীদের প্রদান না করা, জবানবন্দি তদন্তকারী ছাড়াও অন্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা, ন্যূনতম পক্ষে তিন ব্যক্তির হস্তলিপির প্রমাণ পাওয়া, তদন্তকারীর স্থলে জনৈক এ.বি.এম. ফজলুল করিমের স্বাক্ষর পাওয়া, কোর্টের নকল বিভাগের অবিমৃশ্যকারীতা প্রভৃতি বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে এই মামলার অভিযোগ গঠন মূলেই আর একবার ত্রুটিপূর্ণ রয়ে যাবে। ট্রায়ালকোর্টের পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষণীয়।

(চ) ফৌজদারী বিধান কোষের অষ্টাদশ অধ্যায় রহিত হয়ে যাবার পর থেকে বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারা কার্যকর রয়েছে। এই ধারার বিধান মতে যে সমস্ত মামলা সেশন আদালতে বিচার হবে সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে ম্যাজিস্ট্রেট বিধান কোষের ১৯০ ধারামতে অপরাধের আমল নেবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সেই রেকর্ড বা নথি সেশন আদালতে প্রেরণ করবেন। এফআইআর বা অভিযোগের এজাহার, সুরতহাল রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, চার্জশিট, জব্দ তালিকা, বিধান কোষের ১৬১ এবং ১৬৪ ধারামতে প্রদত্ত জবানবন্দি প্রভৃতি রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত।

বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারার অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী ব্যতিরেকেও ৩৫ ডি.এল.আর–১৪০ পৃষ্ঠায় বিচারপতি মোঃ হাবিবুর রহমান এবং বিচারপতি মোস্তফা কামাল যে রায় প্রদান করেন তার নির্দেশাবলী আদালতের অবশ্য পালনীয়।

www.pathagar.com

বিচারপতিদ্বয় সেখানে এক মামলায় ২০৫ (গ) ধারার উপরে তাদের রায়ে বলেন ঃ

"যখন বিধান কোষের ২০৫ (গ) ধারা বলে ম্যাজিস্ট্রেট একটি মামলা সেশনকোর্টে প্রেরণ করে, সেই মামলা পুলিশ রিপোর্টে বা অন্য কোনভাবে রুজু হোক, তাকে সেই মামলার সমস্ত দলিলাদি, দ্রব্যসমূহ (যদি থাকে) কেস রেকর্ড যাতে থাকবে এফআইআর অভিযোগপত্র, পুলিশ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষীদের জবানবন্দি, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দি এবং মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র অর্থাৎ পুলিশ রিপোর্ট, বিধান কোষের ১৬৪ ধারামতে রেকর্ডকৃত জবানবন্দি, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি, সুরতহাল রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, আঘাতসমূহের প্রশ্নে ডাক্তারের রিপোর্ট, জব্দতালিকা প্রভৃতি সে নথির সঙ্গে সেশন আদালতে প্রেরণ করবে। বিধান কোষের ১৯০ ধারার (খ) উপধারার আওতায় যে সমস্ত মামলা কেবলমাত্র সেশন আদালত কর্তৃক বিচার্য, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিধান কোষের অষ্টাদশ অধ্যায়ের তদন্ত রহিত হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট আইনের বিধানমতে সেই মামলা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেশনকোর্টে প্রেরণ করবে।"

জালিয়াতি গোপন করার লক্ষ্যে এই মামলায় আইনের সেইসব অবশ্য পালনীয় বিধি পালিত হয়নি।

(ছ) উপরের আলোচনাসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এজাহারের একটি জাল ফটোকপির বদৌলতে এবং ১৬১ ও ১৬৪ ধারার বিধি বহির্ভূত মিথ্যা ও বানোয়াট জবানবন্দির সুবাদে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের তোয়াক্কা না করে তদন্ত কর্মকর্তা চার্জশিট দাখিল করে। চার্জশিট দাখিলের পূর্ব থেকেই সে তদন্তের নামে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার পর অন্য লোকের সহায়তায় সাক্ষীদের তথাকথিত জবানবন্দি লিখিয়ে নিজেকে তার লিপিবদ্ধকারী বলে চালায়। এক কথায় বলা চলে, অবৈধভাবে এবং জাল দলিল মূলে প্রদত্ত চার্জশিট বেআইনি এবং আইনের দৃষ্টিতে অচল। এটা সর্বজন বিদিত যে, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে যে বিচার তা আদৌ বিচার নয়।

৩৬ ডি.এল.আর. ১৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত সুপ্রীমকোর্টের আর একটি মামলার রায় এ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য। প্রস্তাবিত অভিযুক্তের সম্বন্ধে আনীত অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এবং সুবিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই রায়টির নিম্নোক্ত অংশ সবিশেষ বিবেচ্য।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালের ২০ শে জুন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এফ.কে.এম.এ মুনিম, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ, বিচারপতি চৌধুরী এ.টি.এম মাসুদ এবং বিচারপতি সৈয়দ মোঃ মোহসেন আলী যে রায় দেন তা নিম্নে তুলে ধরা গেল :

"কোর্টস—কোর্টসমূহ কর্তৃক বিরোধের বিচার, দেশের আইনসম্মত হইতে হইবে।'

প্যারা-৬—যখন কোন বাদী কোর্টে একটি অভিযোগ নিয়ে আসে তখন সে একটি সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির অধিকারী এবং বিরোধীয় বিষয়ে একটি নিষ্পত্তির অধিকারী এবং এ ধরনের নিষ্পত্তি দেশের আইন ও বিধি মোতাবেক হবে। এই নিয়মে কোন ব্যত্যয় ঘটলে সুবিচার ব্যাহত হতে বাধ্য। কেননা, সম্পূর্ণ বিষয়টিই জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর এবং একবার সে আস্থা বিনষ্ট হলে পুরো বিষয়টিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

প্যারা-১৮—'প্রাথমিক পর্যায়' অর্থ পুলিশ কর্তৃক চার্জশিট প্রদানের পূর্বাবস্থা নয়, বরং এটা চার্জশিট প্রদানের পরবর্তী অবস্থা বুঝায়।" তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত বা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে সেটি যে অসময়োচিত নয় সে লক্ষ্যেই উপরোক্ত রায়টি উল্লেখিত হল।

জালিয়াতির মাধ্যমে কোর্টে কোন ব্যবস্থা উপস্থাপিত হলে বা বিচারকার্যের কোন পর্যায়ে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হলে, বিচার সুষ্ঠু ও নির্ভুল হবে না। জালিয়াতি বা প্রতারণা বিচার ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত করে থাকে এবং এটাও প্রতিষ্ঠিত নীতি যে জাল-জুয়াচুরি বিচার ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম বিধ্বস্ত করে দেয়।

এ সম্বন্ধেও বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের আপিলেট ডিভিশনের প্রধান বিচারপতি এ.টি.এম, আফজাল, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এবং বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী ১৯৯৪ সালের ৯২ নম্বর সিভিল আপিলে যে রায় দেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য। বিষয়টি বিএলটি (এডি) ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ৭৩ প্যারা ১৩ তে বিধৃত আছে। সে রায়ে প্রতারণার যে ব্যাখ্যা বিচারপতিগণ প্রদান করেন সেটা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করে জজ সাহেবের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সে সম্বন্ধে দীর্ঘদিন কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

www.pathagar.com

ট্রায়ালকোর্টে সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী সিরাজুল হক সাহেবের সঙ্গে সেদিন এমনিই একহাত হয়ে গেল। তার অবশ্য তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। প্রায় দু'বছর পর ৭ই জুন, ২০০০ সালে জেল হত্যা মামলার চার্জ গঠনের জন্য নির্ধারিত ছিল। পূর্বের তারিখে কোর্ট বাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের ফাইন্ডিং মতে যে তিন ব্যক্তি সাক্ষীদের জবানবন্দিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছে তাদের নাম-ধাম বিবাদীপক্ষকে যেন প্রদান করা হয়। বেশ কয়েকটি তারিখ চলে গেলেও তা প্রদান করা হয় না।

আমাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে নিবেদন করা হয়, এসব নাম জানার পর আইনগত করণীয় রয়েছে। তার নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে চার্জ গঠনের প্রচেষ্টা অমূলক। কিন্তু বিজ্ঞ জজ সাহেব তারপরও সিরাজুল হক সাহেবকে অনুমতি দেন চার্জ গঠন প্রক্রিয়ায় বক্তব্য শুরু করার জন্য। এ পর্যায়ে দেখা যায় মোট তেরো জন পলাতক আসামির জন্য রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবীদের সাত জন অনুপস্থিত। যারা হাজিরা দিয়েছে তারাও কেউ কেউ কোর্টে নেই। আইনজ্ঞদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য চালিয়ে যাওয়া বিধিবহির্ভূত হবে। অনুপস্থিতিতে বিচার চলে, কিন্তু সে মর্মে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি করে আদেশ জারি করতে হবে।

অবস্থাদৃষ্টে সেদিনও মামলা চালিয়ে যাওয়া বিধিসম্মত হয় না। অনেক দিন পর চার্জগঠনের কথা শুনে অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন কোর্টে এসেছিল। সব দেখে-শুনে সে চলে যায়। হাইকোর্টে তার মামলা রয়েছে। মামলায় আবার তারিখ পড়ে।

শরীর অসুস্থ থাকায় মানসিক অবস্থাও ভালো ছিল না। সালেহা এবং আনোয়ার কোর্ট রুমের পেছনের দিকে বসেছিল। জজ সাহেব উঠে গেলে তারা এগিয়ে আসে। আমিও কাঠগড়া থেকে বের হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যাই। হঠাৎ করেই সিরাজুল হক সাহেবের মুখামুখি পড়ে যাই। দীর্ঘ দিনের পরিচয়। তিনি নিজের অজান্তেই জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন?

মাথায় চট করে রক্ত চড়ে যায়। নিজেকে আর সম্বরণ করে রাখতে পারি না। ফেটে পড়ি, কেমন আছি বুঝতে পারছেন না? একজন প্রতিহিংসা-পরায়ণা মহিলার কোপানলে পড়ে আমাদের মতো লোকেরা

www.pathagar.com

এই বয়সে বছরের পর বছর কারা নির্যাতন ভোগ করছি এবং আপনি তার প্রধান প্রসিকিউটার! বুঝতে পারছেন না কেমন থাকতে পারি!

সিরাজুল হক সাহেব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি আমি এইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। আমতা আমতা করে বলেন, সবই বুঝি। কিন্তু কি করব বলুন!

কী করবেন মানে? আপনি কি জানেন না কারা জেল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে? সরকার বা তার প্রধান ওই মহিলাই কি জানেন না কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে? সব জেনে-শুনেও কেবল মাত্র প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন। আর আপনার মতো একজন প্রবীণ আইনজ্ঞ তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। আপনার লজ্জা করে না?

তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। বিব্রত মুখে নিচের দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশিত করে বলেন, আমার কী করার আছে?

অনেক কিছু করার আছে সিরাজ ভাই! আপনি কি আমাদেরকে বা আমাকে চেনেন না, জানেন না? আপনার সাথেই কি সম্পর্ক আজকের? ভুলে গেছেন যে সংসদে আপনি একজন সদস্য ছিলেন, আমি সেই সংসদেরই চীফ হুইপ ছিলাম। আমাকে প্রত্যক্ষভাবে জানার আপনার কোন সুযোগের অভাব ঘটেনি। এই দেশের রাজনীতি এবং সমসাময়িক সকল ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে আপনার কি জানা নেই এই জঘন্য অপরাধের সাথে কারা জড়িত? তারপরও এক মহিলার অন্ধ ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন! তার আক্রোশ চরিতার্থ করতে গিয়ে নির্বিবাদে তার সব অন্যায় বেআইনি নির্দেশ পালন করে যাচ্ছেন! আপনি না এই দেশের একজন প্রবীণ আইনজ্ঞ! সাহস করে একটি কথাও বলতে পারেন না! বলতে পারেন না, তার বিরোধী বলে, উত্তরাধিকারের রাজনীতির বিরোধী বলে এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণে অপারগ বলে অন্য অনেকভাবে হয়রানি করতে পারেন। কিন্তু যে মামলার বিচার আমরা চিরকাল দাবি করে এসেছি, নিজেদের শ্রদ্ধাভাজন নেতাদের হত্যা মামলার ষড়যন্ত্রে জড়িত করে আপনারা যে নির্মম ও অমানবিক মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন একদিন তার প্রতিফল অবশ্যই পাবেন। ষড়যন্ত্র করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়নের ফলশ্রুতি একদিন অবশ্যই ভোগ করবেন।

সিরাজুল হক সাহেব লজ্জিত মুখে চুপ করে থাকেন।

www.pathagar.com

সালেহা এবং আনোয়ার এসে আমাকে শান্ত করার প্রয়াস পায়।

কিন্তু আমার তখন আর চুপ করে থাকার মুড ছিল না। সাধারণত কোর্টে আমি সর্বদা চুপচাপ বসে থাকি। আমার বিষণ্ন-মূর্তি লক্ষ্য করে অনেকেই সালেহাকে বলেছে, আপনার হাজব্যান্ড এত বিমর্ষ থাকে কেন?

সে আমাকে সে কথা জানাতে তাকে প্রতিউত্তর করেছিলাম, অবস্থার প্রেক্ষিতে হাসি-উল্লাস করার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। এত নিষ্ঠুর যাতনা সহ্য করে আনন্দের ভান করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সিরাজ সাহেবকে আরও বলি, সব জেনে-শুনে, তদন্তকারীর জাল-জালিয়াতিকে প্রশ্রয় দিয়ে সিনিয়ার প্রসিকিউটর হিসাবে আপনি এখানে যে অপরাধ করে যাচ্ছেন একদিন তার জন্যও হয়ত জবাবদিহি করতে হবে। চিরদিন কেউ ক্ষমতায় থাকে না। আজ কোথায় শেখ সাহেব? কোথায় জিয়াউর রহমান? ভুলে যাবেন না, এই সরকারের কালও একদিন শেষ হবে এবং দিনে দিনে যে ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা সুদে-আসলে শোধ করতে হবে।

আমার উচ্চকণ্ঠে সমস্ত কক্ষ সচকিত হয়ে ওঠে। সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল এবং আমার কথাগুলো অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করছিল। পুলিশ অফিসাররাও মিটি মিটি হাসছিল। সালেহা ও আনোয়ার আমাকে দু'দিক থেকে হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে এনে নিচে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠিয়ে দেয়। তাদের ভয়, আরও কি না কি বলে ফেলি! তারা দু'জনই আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

সালেহা বার বার বলে, তুমি উত্তেজিত হয়ো না, এটা তোমার স্বাস্থ্যের হানিকারক।

তাকে বলি, এতদিন চুপ করে বসেছিলাম, তখনও তুমি নালিশ করেছ। এখনও করছ।

সে বলে, অ্যাডভোকেট সাহেবকে বলে লাভ কি! যা করার প্রধানমন্ত্রী আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা করছেন।

তাকে বলি, এই অ্যাডভোকেটও তার একজন সাঙ্গ-পাঙ্গ। তার তিন কাল গিয়ে, এক কালে ঠেকেছে। এখন তার ভয়ের কি আছে! সে কি সাহস করে সত্য কথা বলতে পারে না? এই মামলার বিচার আমরাও চেয়েছি। যারা অপরাধ করেছে তাদের কঠিন বিচার হোক। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, জাল-জুয়াচুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে সরকার পক্ষ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার যে হীন ষড়যন্ত্র করছে তার সাথে

www.pathagar.com

এই বৃদ্ধ বয়সে আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ ওই প্রবীণ আইনজীবীও জড়িত।

সালেহা আর কথা বাড়ায় না। সে চাচ্ছে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দিক, আমার প্রতিবাদের কণ্ঠ বন্ধ হোক। আমাকে আজ জেলখানায় দ্রুত পাঠাতে তার আগ্রহ। অন্যান্য দিন যতক্ষণ পারে আমাদের প্রত্যাগমন বিলম্বিত করার কামনা করে।

জেল গেটে আসার পর অন্যান্য সব অভিযুক্তেরা এসে সোৎসাহে আমার সঙ্গে করমর্দন করে অভিনন্দন জানায়। তাহের ঠাকুর বলে, ভাই! কথার মতো কথা বলেছেন! কিন্তু যাকে বলা হয়েছে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকলে কথাগুলোর মূল্যায়ন হত।

সিরাজুল হক সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক আজকের নয়। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। পার্লামেন্টে ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন। একবার তিনি বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে শুরুতেই বলেন, Mr. Speaker sir, I represent the smugglers of this country. তার নির্বাচনী এলাকা তদানীন্তন কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার কসবা অঞ্চল। তিনি বলেন, সেখানকার অধিবাসীদের মূল জীবিকা চোরাচালানি। তিনি তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। কথাবার্তায় চৌকস এবং একজন ভালো আইনজীবী হিসাবে পরিগণিত হবার পরও শেখ সাহেব তাকে তেমন পছন্দ করতেন না। তার পক্ষ হয়ে কেউ সুপারিশ করতে গেলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ওটা একটা পাতি মাতাল। ওর কথা-আমাকে বলো না।

এখন এই সিরাজুল হকের কত কথা! তিনি নাকি শেখ সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ঘনিষ্ঠই যদি হতেন তা হলে নির্বাচনে তাকে আর মনোনয়ন দেওয়া হয় না কেন?

কিন্তু কী হবে এইসব প্রশ্ন তুলে! সকলেই বাতাসের অনুকূলে বাদাম টানায়! সকলেই জানে, সিরাজুল হক সাহেবের পানাভ্যাস আছে। ভালো মাত্রাতেই আছে।

সে সময় আওয়ামী লীগের মধ্যে কুমিল্লা অঞ্চলের নেতৃত্ব খন্দকার মোশতাকের উপরই বর্তে ছিল। সিরাজুল হক তাঁকে মুরব্বী ধরে ক্ষমতার পাদপিঠে আরোহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও সফলতা লাভ করতে পারেন না। শেখ সাহেব নিহত হবার পর শুনেছি তিনি

www.pathagar.com

মোশতাক সাহেবের কাছে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন তাকে জাতে ওঠাবার জন্য। কিন্তু মোশতাক সাহেবও শেখ সাহেবের মতোই তাকে পছন্দ না করার ফলে সিরাজুল হক সাহেবের আর কোন পদোন্নতি ঘটে না। যদিও আওয়ামী আমলে কত আঘাটা ঘাটে পরিণত হয়!

সিরাজুল হক সাহেব রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। অগত্যা, যার নাই কোন গতি সে করে ওকালতি, এই রম্য কথাটিকে সপ্রমাণিত করে তিনি আইন ব্যবসায় মন দেন।

বিএনপি আমলে এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দায়ের করা হলে এরশাদ সাহেব সিরাজুল হককে তার আইনজ্ঞ নিয়োগ করেন।

১৯৯১ সালে আমরা যখন রংপুরে উপ-নির্বাচন করি তখন দলের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এই হক সাহেবের বাসায় গিয়ে নানা প্রকারের কলকাঠি ঘুরাবার প্রচেষ্টা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আমি যেন সেখান থেকে উপ-নির্বাচন না করতে পারি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একক কর্তৃত্ব রংপুরে বজায় রাখার স্বার্থে তার এই উদ্যোগ। ফলশ্রুতিতে এরশাদ সাহেব অ্যাডভোকেটের খাতায় একটি লাইন লিখে দিয়েছিলেন, 'If any one, other than Mizanur Rahaman Chowdhury, contests from Rangpur it will be disastrous.'

আমি রংপুরবাসীদের আগ্রহাতিশয্যবশত এরশাদ সাহেবের সে অস্বাক্ষরিত নির্দেশে কান দিই না। অবশ্য সেটি আমাকে দেখাবার সৎসাহসও মিজান সাহেবের ছিল না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সকলের সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় আমি সেখানে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলাম।

যাক সে কথা। এরশাদ সাহেবের মামলার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি সিরাজুল হক সাহেবের বাসায় গিয়েছি। তাকেও এ উদ্দেশ্যে আমার বাসায় আমন্ত্রণ জানাই।

আলোচনান্তে নৈশভোজে কাবাব-রুটির ব্যবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করেন, শাহ্ সাহেব, আগে জানলে আমি আমার হুইস্কির বোতলটি নিয়ে আসতাম। আপনি তো আবার এ রসে বঞ্চিত!

www.pathagar.com

তার সঙ্গে কোনদিনই ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোন বিরূপতা লাভ করেনি।

এই জেল হত্যা মামলার নিগূঢ় তথ্য তার অজানা নয়। তদন্তকারী আবদুল কাহার আখন্দ যেসব অপকর্ম করেছে তাও তার অবিদিত নয়। এ সবের প্রশ্রয় দেওয়া তার বয়সের মানুষের পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। জেনে-শুনে তারা এ গর্হিত অপরাধ করছে। বিচারকে প্রহসনে পরিণত করছে। বিষয়টি মনের মধ্যে প্রথম থেকেই আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। সেদিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তার মতো অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ আইনজীবী যদি সরকারকে সৎপরামর্শ দিতেন, ভেজালের কারণে আসলই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা, তা হলে কাজ হলেও হতে পারত। কিন্তু দেখা গেল সব ভেড়ার পালে তিনিও এক শিং ছাড়া বশংবদ ভেড়া। মহিলা যেভাবে তর্জনী নাচাচ্ছেন এরা সব তাথৈ তাথৈ করে নেচে আসর সরগরম করে তুলছেন। সত্য কথা বলে প্রকৃত তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে কাজ হলেও হতে পারত।

আমাদেরকে টেবিল ফ্যান দেওয়ার বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ কার্যকর হয়েছিল। এক্ষণে জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টার ফলে মূল মামলাই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা!

এদেরকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই!

সিরাজুল হকের পরে যে আইনজীবী নিয়োজিত ছিল সেই রমজান সাহেব এর মধ্যেই পরপারে চলে গেছেন। ক্লোজকাট দাঁড়িওয়ালা এক প্রায় তরুণ কালো কোর্ট পরিধান করে রোজই আসে। অন্যদের ফুট-ফরমাস শোনাই যেন তার কাজ। ঢাকা কোর্টের আর এক পিপিকে দেখি। সে সবকিছু জেল কোডের বিধানমতে চলার পক্ষপাতি। সব কিছুতেই জেল কোড। পারলে মূল মামলাও সে জেল কোডের আওতায় সমাধা করে! ভদ্রলোক আর কিছু আইনের কথায় তেমন যায় না। ক্যানভ্যাসারের সেই সর্বরোগের মহৌষধ সুরমার ক্যানভাসের মতো, 'আখমে দরদ হ্যায় তো সুরমা লাগাও, শিরমে দরদ হ্যায় তো সুরমা লাগাও, পেটমে দরদ হ্যায় তো সুরমা লাগাও।'

হক সাহেবের এক ছেলেও আসে। নতুন আইনজীবী, সে কি নিবেদন করে বুঝি না। সে নিজেও বোঝে কিনা জানি না। দু'-একদিন ঢাকার এক মহিলা অ্যাডভোকেটকে আসতে দেখি। সে নিশ্চুপই থাকে।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে এসেছিল ছাত্রলীগের একদা আমাদেরই কর্মী কুমিল্লার গালকাটা রেজাউর রহমান। এখন সে আইন ব্যবসায়ে জড়িত। ছাত্রজীবন থেকেই কথাবার্তায় খানিকটা বেয়াড়া।

একদিন কি নিয়ে বেঞ্চ ক্লার্ককে চোটপাট করতে থাকলে আমি মুখ খুলতে বাধ্য হই, তোমার ওকালতির বয়স শুক্কুরে শুক্কুরে আট দিন। দল সরকারে থাকার কারণে ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছ। একদিন কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে।

সে আমার দিকে তাকিয়ে মান রক্ষার খাতিরে বিড়বিড় করে কি বলে। সেদিন যে সে বিদায় হয়, আর এ মুখো হতে দেখিনি।

আজ এই মামলায় আসামির কাঠগড়ায় বসে মন বার বার বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এতবড় হীন অপরাধের হোতা কে বা কারা!

সে সময়ের দেশের পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচ্য। অভ্যুত্থান হয়েছে, পাল্টা-অভ্যুত্থান হবে এটা প্রণিধানযোগ্য। ১৫ অগাস্টের নায়করা রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে ঘিরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছে। তাদের শক্তির উৎস ট্যাঙ্ক বহর। ল্যান্সার এবং পদাতিক বাহিনীও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

মেজরগণ সেনা ছাউনীর বাইরে অবস্থান করে একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার পরিপন্থি কাজ করছিল, অন্যদিকে তাদের এই অবস্থান উচ্চাভিলাষী কিছু কর্মকর্তাকে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করছিল। সেনা ছাউনীর মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হচ্ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করার লোকের অভাব ছিল না।

শোনা যায় পট-পরিবর্তনের কোন কোন নায়ক সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ে অযাচিত প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা করে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা নেই। আমি একবারই এমনি একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব একদিন আমার ঘরে ঢুকে অস্বস্তির সঙ্গে নিবেদন করে, স্যার, আমার উপরে আপনি আছেন, তার উপরে রাষ্ট্রপতি আছেন। আমি আপনাদের কাছ থেকেই নির্দেশ পেতে অভ্যস্ত। এখন যদি আমাকে কোন মেজরের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হয় তা হলে আমি অনুপায়!

কী হয়েছে সচিব সাহেব?

www.pathagar.com

স্যার, মেজর ফারুক এসে বিমান পরিবহন সম্বন্ধে অনেক আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে গেছে।

আপনি তাকে কী উত্তর করেছেন?

বলেছি, আমি মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে যা করার করব।

গুড্। সঠিক বলেছেন। অন্য সময় হলে বলতাম, মেজর সরাসরি আপনার ঘরে প্রবেশ করে কী করে! কিন্তু এখন বাস্তবতা ভিন্ন। যা-ই হোক, এরপর সে কিছু বললে বা যোগাযোগ করলে তাকে বলবেন সে যেন আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে।

তাই ঘটে। এরপর একদিন সেক্রেটারিয়েটে পিএ টেলিফোনে জানায়, স্যার, মেজর ফারুক সাহেব ভিতরে যেতে চাচ্ছেন।

পাঠিয়ে দিন।

সে ভিতরে প্রবেশ করে হাত মিলায়। ইতিপূর্বে তার নাম শুনলেও, তার কথা আলোচনায় এলেও কখনও তাকে প্রত্যক্ষ দেখিনি। একজন বুদ্ধিদীপ্ত সুঠাম দেহের আত্মবিশ্বাসী যুবকরূপে তাকে প্রতিভাত হয়। জিজ্ঞেস করি, বলুন আপনার এখানে আসার হেতু কী?

সে নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে থাকে, আপনার মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে, বিশেষ করে বিমান পরিবহণ সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনাদের সচিবকে বলেছিলাম, সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে।

বলি, সচিব ঠিকই বলেছে। মন্ত্রণালয়ের বাইরের কারো নিকট থেকে উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ তার এখ্তিয়ার বহির্ভূত।

কেউ কিছু সৎ পরামর্শ দিতে পারবে না?

প্রথমত, অযাচিত পরামর্শ স্বাগত নয়। দ্বিতীয়ত, সবকিছুই একটা নিয়ম-নীতিতে চলে। এ সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বিধি রয়েছে।

সে কিছুটা অধৈর্য কণ্ঠে বলে, এসব বিধি-বিধানের কথা আপাতত স্থগিত রাখুন। আমার কিছু বক্তব্য আছে। শুনুন।

আমি বোধহয় তার চাইতেও বেশি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করি না। বলি, ঠিক আছে, বলুন, আপনার বক্তব্য শোনা যাক।

সে তার একটি নোট কনসাল্ট করে পরপর অনেক কথাই বলে যায়। সবই প্রায় নীতি-নির্ধারণী বিষয়। আরও বলে, আপনি যে কোন সময় একটা প্লেন নিয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে আসতে পারেন। আপনি এই

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। নিজের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখবেন না।

আমি কোনদিনই নীরবে লোকজনের কথা হজম করায় অভ্যস্ত নই। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় মাথা ঠাণ্ডা রেখেই হাসিমুখে জবাব দিই, নিজের বিষয়ে আমি অনবহিত নই। আপনি এক কাজ করুন, আপনার সকল পরামর্শ লিখিত আকারে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা যখন এসব নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করব তখন সব বিবেচনায় নেওয়া যাবে।

আমার সম্বন্ধে তার কি ধারণা ছিল জানি না। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আমার কথাগুলো কী গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না?

সেটা এই মুহূর্তেই বলা সম্ভব নয়। আমাদের নীতি-নির্ধারকমণ্ডলী রয়েছে। তারাই এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী।

তা হলে রাষ্ট্রপতিকেই বলব। আপনাকে বলার প্রয়োজন দেখছি না।

আপনি কোথায় কাকে কি বলবেন সেটা আপনার বিবেচ্য। তবে এ মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলে আমাকে বলাই ভালো এবং সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে বলবেন।

সে কার্যত অসন্তুষ্ট চিত্তে আমার অফিস ত্যাগ করে। আমি ক্যাবিনেটের এক বৈঠকে বিষয়টি রাষ্ট্রপতির গোচরে আনি। তাকে বলি, আমাদের মন্ত্রণালয়ের কাজ সম্বন্ধে আপনার বাইরে আর কারো উপদেশাত্মক পরামর্শ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এইসব মেজরগণ কে কতটা ক্ষমতাধর আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাদের কিছু বলার থাকলে তারা যেন সেটা আপনাকেই বলে। আপনি ভালো মনে করলে, আমাদেরকে নির্দেশ দেবেন।

মোশতাক সাহেবের যত দোষই থাক, তিনি বুদ্ধিহীন ছিলেন না। অল্প কথাতেই তিনি সবটা উপলব্ধি করেন। এরপর থেকে আর কেউ কোন হস্তক্ষেপ করেনি।

এ ধরনের ঘটনা অন্যত্র এবং ব্যাপকভাবে ঘটা অসম্ভব নয়। সকলের প্রতিক্রিয়াও সমভাবে প্রকাশ হবে না। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থার কারণে এবং ১৫ অগাস্টের মতো এত বড় ব্যাপার সফলতার সঙ্গে সংঘটিত করার কারণে সাধারণ্যে এদের সম্বন্ধে একটা শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভীতির মনোভাব বিরাজ করছিল। এদের কোন কথার ব্যত্যয় করা সে পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। কাজেই, কোথাও কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি একথা বলা চলে না। সংশ্লিষ্ট মহল

www.pathagar.com

ব্যতিরেকে সেসব জানার কোন উপায়ও ছিল না। সাধারণ মানুষজন এসব জানত না। পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং অর্থনৈতিক সুনিয়ন্ত্রণ তাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি এনে দিয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে সামাজিক অপরাধসমূহের নিম্নমুখী প্রবণতায় জনগণ সুখী ছিল।

কিন্তু কথায় বলে তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

দেশের পরিস্থিতি যতই অনুকূল হোক, সামরিক ছাউনীতে প্রতিদিন প্রতিকূলতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথম থেকেই একটা বিদ্বেষ এবং হিংসার মনোভাব কাজ করছিল। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকা উচ্চাভিলাষী সেনাপতিরা চুপ করে বসেছিল না।

আজ এতদিন পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমান জড়িত ছিল।

যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে তাকে সে মামলায় অবশ্যই জড়িত করা উচিত ছিল। মৃতব্যক্তি হিসাবে বিচারে সোপর্দ না হলেও তার বিরুদ্ধেও অভিযোগনামা দায়ের হওয়া বিধেয় ছিল। পূর্বাপর অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ঘোলা পানিতে যারা কার্যোদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছে তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমান ছিলেন অগ্রণী। ফারুক, রশীদ এবং খন্দকার মোশতাকের যেসব অভিমত পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এক্ষনে আওয়ামী লীগ যা দাবী করে তাতে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জিয়াউর রহমান চোরকে চুরি করতে বললেও গৃহস্থকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেননি। ১৫ই অগাস্টের ঘটনাটি ঘটে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন। ওদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি তাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন। তারা যদি কার্যসিদ্ধি করে আসতে পারে তিনি তাদেরকে সমর্থন দেবেন। বস্তুত ১৫ই অগাস্টের ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সবচাইতে বড় সুবিধাভোগী। একজন সাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন মেজর একসময় এদেশের রাষ্ট্রপতি বনে যান। এটা ১৫ই অগাস্ট না হলে কল্পনাই করা যেত না। আজও তার জের চলছে।

তার পূর্বাপর সকল আচরণই নির্দ্বিধায় এই উপসংহারে উপনীত করে যে, তিনি ছিলেন একজন সুযোগ সন্ধানী এবং অতি উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মুহূর্তেও তিনি প্যাঁচ

www.pathagar.com

কষেছিলেন। বিষয়টা চাপা পড়ে গেছে বলে সবিস্তারে উল্লেখ করতে চাই না। সংশ্লিষ্ট মহলের সব জানা আছে। পরবর্তীতে তার সব পরিকল্পনা ঠিক ঠিক মিলে গেলেও যবনিকায় বুমেরাং হয়ে যায়। কথায় বলে, ওস্তাদ লাঠিয়াল নিজের লাঠির আঘাতে প্রাণ হারায়। বড় সাপুড়ে পালিত স্বর্পের দংশনেই জীবনপাত করে।

সেনা ছাউনীতে প্রথম যে বিরূপতা প্রত্যক্ষ করা যায় সেটা ঘটে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার দিন কয়েক পরেই প্রধান সেনাপতি শফিউল্লাহ যখন ফরমেশন কমান্ডের সভায় মেজর রশীদ ও মেজর ফারুককে ডেকে পাঠান এবং তাদের উদ্দেশ্যে সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানান। তাদের বক্তব্যের এক পর্যায়ে কর্নেল সাফায়াত জামিল নাকি বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে এবং নতুন রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি অস্বীকার করে তাঁকে প্রথম সুযোগেই উৎখাতের সংকল্প ব্যক্ত করে।

প্রধান সেনাপতি শফিউল্লাহ সে সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। মাত্র দু'দিন পূর্বে নতুন সরকারকে আনুগত্য প্রদান করে এসেছেন। তার সম্মুখে তারই একজন অধস্তন কর্মকর্তার একম্বিধ প্রকাশ্য বিদ্রোহের আচরণ মুখ বুজে সহ্য করে প্রধান সেনাপতি সেদিন কেবল কাপুরুষতারই পরিচয় দেননি, সেনা ছাউনির অভ্যন্তরে পুনরায় বিদ্রোহের বীজ বপণে সাহায্য করেন। তার অপদার্থতা এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সহায়ক হয়। সর্বক্ষণ রাষ্ট্রপতির পাশে অবস্থান করে তাঁকে সর্বপ্রকার পরামর্শ প্রদান করে তাঁর সকল কাজে ইন্ধন জুগিয়ে সুবিধামতো একসময় বাইরে কূটনীতিকের দায়িত্ব নিয়ে সটকে পড়েন এই সেনাপতি। জিয়াউর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতার পাদপ্রদীপের আরও নিকটে চলে আসেন।

সেনা ছাউনীর গোলযোগের সূত্রপাতে তিনি যদি তার অভিলাষ সিদ্ধ করতে পারেন তা হলে দোষ কি! দু'দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে তিনি নিজের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান।

হয়ও তাই। ঘটনা পরম্পরায় খালেদ মোশাররফ কর্নেল সাফায়াত জামিল গংদের সহায়তায় সাময়িকভাবে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসে। মোশতাক সাহেবকে নামমাত্র প্রেসিডেন্ট রেখে বঙ্গভবনে কার্যত বন্দি করে রাখে। জিয়াউর রহমানকে সেনা ছাউনীতে একই অবস্থায় আটক রেখে নিজে প্রধান সেনাপতি বনে যায়। দেশ তখন তার নিয়ন্ত্রণে। ১৫

www.pathagar.com

অগাস্টের নায়কদেরকে তারা বিমানে করে বাংলাদেশের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করে। খালেদ মোশাররফের সেই স্বল্পকালীন ক্ষমতাসীন থাকার প্রাক্কালেই জেলখানায় এই নৃসংশ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ৭ই নভেম্বর '৭৫-এর সিপাহী বিদ্রোহে খালেদ মোশাররফের পতন ঘটে। তার জীবনাবসান হয়।

দুটি বিষয় এখানে বিবেচ্য, এই জঘন্য কাজটি খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে বা জ্ঞাতসারে ঘটতে পারে। তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটাও সে পরিস্থিতিতে অসম্ভব নয়। একটি গবেষণামূলক বিদেশী গ্রন্থে একথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক তাঁর দেশের বাড়ি দাউদকান্দির দশপাড়া গমন করলে রশীদ-ফারুক এই পরিকল্পনা আটে। এটা সঠিকও হতে পারে, বেঠিকও হতে পারে। ঘটনার রাতে শেষ মুহূর্তে খন্দকার মোশতাকও এ ধরনের হীন কাজের অনুমতি দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সব ভালো জানেন।

অন্যদিকে সদ্য ক্ষমতার পাদপীঠে উঠে আসা খালেদ মোশাররফ গংও পথের কাঁটা দূর করনার্থে আগামী দিনে ক্ষমতার অবশ্যম্ভাবী দাবিদার জনপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদেরকে খতম করে দেওয়ার আদেশ দিতে পারে। তখন চারদিকে আসন্ন যুদ্ধের ঘনঘটা। ল্যান্সার পদাতিক বাহিনীর মূহুর্মূহু সমর প্রস্তুতি, ট্যাঙ্ক বাহিনীর আত্মরক্ষামূলক অবস্থান এবং চারদিকে বন্দুক আর কামানের গোলা-বারুদের মাঝে এক ফাঁকে এই চার হতভাগ্য দেশবরেণ্য নেতার জীবনাবসান ঘটে। কার অদৃশ্য হাত কাজ করেছে সর্বশক্তিমানই তা জানেন। যদি মোশতাকের অনুমত্যানুসারে কোন সামরিক অফিসারের পরিকল্পনামতে ঘটনা ঘটে থাকে তা হলে সে সময়ে রাষ্ট্রপতির সার্বক্ষণিক উপদেষ্টামণ্ডলী দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। রশীদ, ফারুক, মোশতাক প্রভৃতির সঙ্গে মোশতাকের ডান হাত উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ কোন অবস্থাতেই বাদ যেতে পারেন না। বাদ যাবেন না রাষ্ট্রপতির প্রধান প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল এম.এ.জি.ওসমানি এবং সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান।

সেই সঙ্গে দু'দল ঘাতককে দু'বার কারাভ্যন্তরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে যেসব কারাকর্মকর্তারা এই ঘটনা ঘটাতে সহায়তা করেছে তারা সকলেও প্রত্যক্ষ অভিযুক্ত হবে। তেমনি করে সে সময়ের ক্ষমতাধর

www.pathagar.com

ব্যক্তিদ্বয় খালেদ মোশাররফ এবং শাফাত জামিল গংও অভিযুক্তের তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে না। হয় অপরাধ করেছে, না হয় কৃত অপরাধীদেরকে দেশ ত্যাগের সুযোগ করে দিয়েছে। দুটোই সমান অপরাধ।

দুটি ঘাতক দল জেলের অভ্যন্তরে ঢুকেছে। কোনটি কোন্ দলের তা আজ এতদিন পরে সঠিক করে বলা কঠিন। ঘাতক রিসালাদার মোসলেম যদি মোশতাক-রশীদের দলভুক্ত হয়, অপর ঘাতক নায়েক এ.আলী কার দলভুক্ত? সেকী খালেদ মোশারফের কর্তৃক প্রেরিত?

এসমস্ত জট খোলার দায়িত্ব ছিল তদন্তকারী কর্মকর্তার। কিন্তু সে তা করে না। সে মূল আসামিদের বাদ দিয়ে তার কর্ত্রীর ইচ্ছায় আমাদের মতো নির্দোষীদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে।

মানুষের মনে এ সন্দেহও দানা বাঁধতে পারে, আগামীতে ক্ষমতার মসনদের দাবীদার সম্ভাব্য মুখ্য নেতাদেরকে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কেউ হয়ত নিজেদের পথ পরিষ্কার করার প্রয়াসে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। চারদিক তখন ধুলায় অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে সাপ, সারা ঘরেই সাপ!

তাই আজ মনের অভ্যন্তরে অন্য কথাও জেগে ওঠে। যে ক্ষমতার আসনে এইসব নেতাদের অবস্থানের কথা সেখানে আজ কিছু অর্বাচীন জাঁকিয়ে বসেছে। ডঃ কামাল হোসেনের মতে একটি দোকান চালাবার যোগ্যতা যাদের নেই, তারা দেশ পরিচালনা করছে। সেক্ষেত্রে আজকে যারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়ে পারে না। নেতাদের নিহত হবার ফলে এরাই সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধাভোগী। সন্দেহের দৃষ্টি কি সেদিকে নিপতিত হতে পারে না? সুদূরপ্রসারী কোন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এরা কি কোনভাবে জড়িত? সে দৃষ্টি বিপরীত লক্ষ্যে প্রবাহিত করার জন্যই কি আমাদের মতো সর্বতোভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে জড়িত করা হয়নি!

মিসেস জোহরা তাজউদ্দীন সেদিন কোর্টে আসে। মামলার গতি-প্রকৃতি কোন পর্যায়ে আছে স্বচক্ষে দেখার জন্য এসেছে। আমি তার সাথে কথা বলিনি। মন চাইল না। এরা সব জেনে-বুঝেও চুপ করে আছে!

এ যেন এক ভীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কোন কথা

www.pathagar.com

বলবে না। সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করতে এরা লজ্জা পায়, ভয় পেয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে। তার মেয়ে নিজ উদ্যোগে জেল হত্যাকাণ্ডের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। সে সম্ভবত এখন আইনের পেশায় নিয়োজিত। পিতার মৃত্যু রহস্য এবং এর পশ্চাতে কাদের হাত রয়েছে জানার প্রয়োজনে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে সে এই স্টাডি সম্পন্ন করে। সে পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসে খন্দকার মোশতাক এবং কর্নেল রশীদের ইঙ্গিতে কিছু সেনা সদস্যদের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়। এর মধ্যে অন্য আর কারো কোন ষড়যন্ত্রের আভাস সে খুঁজে পায় না। সত্য উদ্ঘাটনের পরও মা-মেয়ে কেউ মুখ ফুটে কথা বলে না। স্বামী ও পিতার একান্ত কাছের এবং আস্থার তিন সহকর্মীর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশে তাদের আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, এতে যে মূল মামলা নষ্ট হবার উপক্রম এবং প্রকৃত অপরাধীদের নিষ্কৃতি পেয়ে যাবার সম্ভাবনা সেটা অনুধাবন করেও কি এক জুজুর ভয়ে অন্যদের মতো তারাও দিশেহারা। তাদের ভীতিও হয়ত অমূলক নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে এত বড় অবদান রাখার পর খোদ তাজউদ্দীন সাহেবের যে অবস্থা হয়েছিল পিতার হাতে, কন্যা যদি সে পথ ধরে এগোয় তা হলে সমূহ বিপদ। তাজউদ্দীন সাহেবের স্ত্রীও রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকটা 'জল বিন মছলি'র অবস্থায় আছে।

ওবায়েদ আলাপ করেছে এবং আমাদেরকে অহেতুক হয়রানির কথা তুলে ধরেছে। মহিলা কোন প্রতিউত্তর করেনি।

একসময় তার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। ছাত্রলীগের সভাপতি থাকা অবস্থায় একবার একদিন হঠাৎ করেই জেল থেকে মুক্তি পাই। কর্তৃপক্ষ মুক্তির সময়টি এভাবে নির্ধারণ করে যাতে ছাত্রসমাজ টের না পায়। জেল গেটে সম্বর্ধনা এড়াবার জন্য এ কৌশল। তাজউদ্দীন সাহেবের বাসা তখন খুব দূরে ছিল না। তারা কী করে যেন খবর পেয়ে যায়। তাজউদ্দীন সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে জেল গেটে চলে আসেন। সেদিন জোহরা তাজউদ্দীন অনেক আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে নিজ হাতে আমার গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ আমরা জীবন সায়াহ্নে। তারও একই অবস্থা। জীবনের

www.pathagar.com

হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করার কোন ইচ্ছা পরিদৃষ্ট হয় না। জেনেও যে না জানার ভান করে, সব জানা সৃষ্টিকর্তার নিকট একদিন এই অক্ষমতার জবাব অবশ্যই দিতে হবে।

মামলার সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তদন্তকারী কর্মকর্তা তার মেধা ও মনন খাটিয়ে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও সংযোজন করে অভিযোগের সঙ্গে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য অনেক পরিশ্রমে সেসব প্রস্তুত করেছে।

বাদীর বক্তব্যের বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সে এই মামলায় লিখিত এজাহার করে ঘটনার পর ৪-১১-'৭৫ তারিখে। সেই এজাহার এখন লাপাত্তা। থানা ব্যতিরেকে তার কপি এসপি, ডিসি, আইজি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছিল। সবক'টি উধাও হয়ে গেল! যদিও ৯-৯-'৯৬ তারিখে সেটি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল। তারপর সেই এজাহারের উপর অনেক কারুকার্য করা হয়েছে এবং প্রতারণা ও ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে তাকে নতুনভাবে প্রণয়ন করে ফটো কপি করে নথিতে সংযোজিত হয়েছে। সেসব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কোর্টে সাক্ষ্যদান কালীন সে স্বীকার করে ১৯৭৫ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল বা কোন অফিসে ফটোষ্টেট মেশিন ছিল না। তাই নির্দ্ধিধায় প্রমান হয় ১৯৯৬ তে একটি জাল এজাহার তৈরী করে সে সময় তার ফটোকপি করা হয়। এই বাদী আবদুল আউয়াল ৮-৯-'৯৬ তারিখে সন্দ্বীপ থানা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কার্যবিধির ১৬৪ ধারামতে একটি দীর্ঘ জবানবন্দি প্রদান করে তদন্তকারীর ইচ্ছানুযায়ী অনেক নতুন নতুন তথ্যের সূত্রপাত করে। তার বক্তব্যমতে আইজি ভালোভাবেই জড়িয়ে পড়ে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় আইজির নির্দেশেই নাকি সে জেলগেটে যায়। ঘটনার আট-দশ দিন পূর্বেও নাকি এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। আইজি নাকি বার তিনেক বঙ্গভবনের সঙ্গে কথা বলে এবং সেখান থেকে নির্দেশ পেয়ে তারা ঘাতকদের অকুস্থলে নিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সহায়ক শক্তি হিসাবে সেখানে উপস্থিত থেকে সকল কার্য সমাধা করতে ঘাতকদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দান করে। দ্বিতীয় দফা যে

www.pathagar.com

ঘাতক দল ঢোকে তাদের অভ্যর্থনা ও কাজের বিষয়েও জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

বাদী, আইজি প্রিজন এবং জেলের সকল স্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের অমার্জনীয় গাফিলতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং ঘটনা সংঘটনে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আইনের কোন বিধানমতেই তারা রেহাই পেতে পারে না। যদি অন্যের নির্দেশেও করে থাকে তা হলেও বেআইনি নির্দেশ পালন করে তারা মানুষ খুনের মতো জঘন্য অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে আইন নিশ্চয়ই তার বিধিমত পথ খুঁজে নেবে। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। আইন নয়, ব্যক্তি ক্রোধই এখানে সর্বাপেক্ষা বিচার্য বিষয়।

বাদী আবদুল আউয়াল এবং তার সেদিনের সহকর্মীগণ যদি এই মামলার আসামির কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে সাক্ষীর ডকে দাঁড়ায় তা হলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘারে নিপতিত না হয়ে যায় না। বিচারকে বিচারের মতোই করতে হবে। তাদেরকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হবে। তারা যদি নির্দোষ হয়, কোর্ট যথাবিধি তাদের নিরপরাধ ঘোষণা দিলে তারা মুক্তি পাবে। কিন্তু বিচারে তাদেরকে স্বোপর্দ করাতেই হবে। তা না হলে গোড়ায় আরও বড় গলদ থেকে যাবে।

তদানীন্তন মহা কারা-পরিদর্শক জনাব নুরুজ্জামানেরও একটি জবানবন্দি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২০-১০-'৯৬ তারিখে রেকর্ড করা হয়। তার বক্তব্য মতে ভোর রাত্রে বঙ্গভবন থেকে রশীদ তাকে টেলিফোনে সতর্ক করে দেয় যে কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি কিছু বন্দিকে জেলখানা থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। সে যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সে ভালোই ব্যবস্থা গ্রহন করে! তার ব্যবস্থাপনার গুণে সামান্য পরেই ছিনিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে একদল ঘাতক জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের সহায়তায় নেতাদেরকে হত্যা করে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রেসিডেন্ট বা অন্য কেউ যদি তাদেরকে মানুষ খুন করার মতো মারাত্মক নির্দেশ দিয়েও থাকেন সে অবৈধ নির্দেশে কাজ না করে সামান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ইতিহাসের এত বড় নিকৃষ্টতম অপরাধ সংঘটিত হতে পারত না। আইজি সাহেবের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়বারও পরিলক্ষিত হয় যখন এ.আলীর নেতৃত্বে আর একবার

www.pathagar.com

তাদের সহায়তায় ঘাতকরা ভিতরে প্রবেশ করে বেয়নটের খোঁচায় খোঁচায় নেতাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে। এবার কোন ফোনের নির্দেশের বালাই নেই। আইজি, ডিআইজি এবং আর সব জেলকর্মকর্তাদের এই পরম দায়িত্ব যথোপযুক্তভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের জন্য ও কর্মদক্ষতা ও কর্তব্য পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পদক-পদবী বা খেতাব পাওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়!

সর্বক্ষণ শত শত সশস্ত্র কারারক্ষী বেষ্টিত এইসব কর্মকর্তা মুহূর্তের উদ্যোগে ঘাতকদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করে, নিরস্ত্র করে, বন্দি করে কারা বন্দিদেরকে রক্ষা করতে পারত। তার পরিবর্তে সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে আজ বঙ্গভবন, প্রেসিডেন্ট, রশীদ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেওয়ার অযৌক্তিক প্রয়াস পাচ্ছে এবং নিজেদের কৃত অপরাধ এড়িয়ে সবটাই ভূতের ঘাড়ে প্রদানের পরিহাস করছে। সত্যিকারের বিচার যদি কোনদিন হয় এরা কাঠগড়ায় স্বোপর্দ না হয়ে পারে না।

আইজি আরও জানায় একদিন পর খালেদ মোশাররফ তাকে ও ডিআইজিকে বঙ্গভবনে ডেকে নিয়ে সবকিছু সবিস্তারে অবহিত হয়! আজ না আছে মোশতাক, না আছে খালেদ মোশাররফ, রশীদও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কোথায় মোসলেম আর কোথায় এ.আলী নামীয় ঘাতকরা! কোথায় তাদের সহযোগিরা! আজ কাউকে পাওয়া যাবে না।

তাতে কোন অসুবিধা নেই! যাদেরকে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাদেরকে বড়শিতে গেঁথে ফেলা যাক। নীরবে-নিভৃতে নয়, বিচারের বাণী সখেদে চিৎকার করে রোদন করলেও নিঠুরা রমণী বা তার হাতের পুতুল কাহারের উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই!

কিন্তু বন্ধু, এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে, এই দিনকে নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে!

এই মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপের সূত্রপাত হয় ২৬-১০-'৯৬ তারিখে প্রদত্ত তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিকে আশ্রয় করে। ঠাকুর এই জবানবন্দি যথাকালে সেশনকোর্টে দাঁড়িয়ে প্রত্যাহার করেছে এবং আমাদের কাছে নিবেদন করেছে অকথিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে সেই মুহূর্তে এই অনভিপ্রেত জবানবন্দি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে আরও বলে, ওরা কি লিখেছে এবং কিসে সে স্বাক্ষর করেছে তার

www.pathagar.com

উপলব্ধি করার মতো মনের অবস্থা সেই মুহূর্তে ছিল না। তার বক্তব্য অনুধাবন করলেও একটা বিষয় কিছুতেই আমাদের উপলব্ধিতে আসে না, নির্যাতন-নিপীড়ন ঠেকানোর জন্য কোন জবানবন্দি দিয়ে থাকলেও সে কেন এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে আমাদের কাউকে এ সম্বন্ধে অবহিত করে না! স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল না। অনায়াসে সে আমাদেরকে খবর দিতে পারত। অবশ্য এটা ঠিক, তার সঙ্গে আমাদের কোনদিনই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল না। সে কোনদিনই আমাদের কারো বাসায় আসেনি। আমরাও কস্মিনকালে তার বাসায় যাইনি। সে কোথায় থাকে তাও জানতাম না। কোনদিনই না। সে কারণে সে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদেরকে সতর্ক করার নিমিত্তে সময়ে খবর দেবে সেটা হয়ত আশাতিরিক্ত। তবুও কোনও যুক্তিতেই এই দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি আমাদের গোচরে না আনার কোন সদুত্তর সে দিতে পারে না। প্রশ্ন করলে নীরব হয়ে যায়। বেশি জিজ্ঞেস করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

তাহের ঠাকুর তার জবানবন্দি ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছে। আইনের চোখে আজ আর সেটার কোন মূল্য নেই। কিন্তু দুঃখ বোধ করি এই মর্মে যে, এই তথাকথিত জবানবন্দির সহায়তায়ই কাহার আখন্দ অন্যান্য সাক্ষীদের প্রভাবিত করে আরও মিথ্যা, বানোয়াট এবং কষ্টকল্পিত কাহিনীর প্রবর্তন করে। সত্যকে অবিলম্বে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে হাসতে হাসতে সত্যে পরিণত করার প্রয়াস পায়। সত্য-মিথ্যার নির্যাসে তার নিজস্ব পরিকল্পনা মিশ্রিত করে অপূর্ব সব গল্প গাথা প্রস্তুত করে এক নতুন মামলা তৈরি করে কর্ত্রীকে তুষ্ট করে। তার দ্বারা তৈরী সে জবানবন্দিতে সে অবলীলাক্রমে বলে, আমরা নাকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে বঙ্গভবনে নিয়ে যাই। কথাটা যে ডাহা মিথ্যা এবং কল্পনাপ্রসূত তা বলাই বাহুল্য। এটা সত্য কথা, মনসুর আলী সাহেবের ইচ্ছায় আমরা তিন জন একদিন তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসনের স্থান মতিঝিলে এক বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুসারেই তাঁকে তাঁর বেইলী রোডের বাসায় পৌঁছে দিই। তিনি ছিলেন আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর ইচ্ছার অমর্যাদা করার প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু এরপর আর তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। তাঁকে বঙ্গভবনে নিয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না। পরদিন খবরের কাগজে যে ছবি দেখতে পাই সেটাই সারা বিশ্বকে বলে দেবে ঠাকুরের তথাকথিত

www.pathagar.com

জবানবন্দি কেবল মিথ্যাই নয়, এ ধরনের জঘন্য অসত্যারোপ অন্যত্র কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। যে আইজি পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য হবে এখানে প্রণিধানযোগ্য।

ঠাকুরের সেই বানোয়াট জবানবন্দিতে জনাব মনসুর আলীকে তাঁর বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া বা পরে প্রেসিডেন্টের তলব পেয়ে তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে প্রবেশ করে আলোচনান্তে তাদেরকে কারাগারে প্রেরণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নই। আমাদেরকে কখনওই ডাকা হয়নি। ঠাকুর উপস্থিত থাকতে পারে, তাঁর বক্তব্যানুযায়ী প্রেসিডেন্টের দেশরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মান্নান সাহেব থাকতে পারেন। আমাদের কিছুই জানা নেই, আমাদের জানার কথাও না। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নই।

জিয়াউর রহমান এবং খালেদ মোশাররফের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মোশতাক সরকারের পতন ঘটার আশঙ্কায় অন্যান্যদেরসহ আমাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আলোচনা করেছেন বলে যে বক্তব্য রয়েছে সেটাও সর্বৈব মিথ্যা। কোন পর্যায়েই আমাদের সঙ্গে এ ধরনের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। তখনই নাকি জেল হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিথ্যার উপর মিথ্যা, তার উপর মিথ্যা। সত্যের লেশমাত্র নেই। অন্তত আমাদের বিষয়ে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার চাইতে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। তার সবটুকু বক্তব্যই তদন্ত কারীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে মনে হয়।

পুলিশের কাছে দেয়া আর এক ডাহা মিথ্যা জবানবন্দি, বা তার জবানবন্দি বলে প্রকাশমান, পর্যালোচনা করে দেখা যায় তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাদের বিরুদ্ধে মামলাটি সাজাবার জন্য কত দুর্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। তখন নাকি সে প্রেসিডেন্টের এমএসপি'র সহকারি পিএ।

মোখলেসুর রহমান। এখন তার বয়স ৪৭ হলে সে সময় তার বয়স সহজেই অনুমেয়। সে নাকি ১৫ই অগাস্ট বিকাল তিনটায় আমাদের তিন জনকে ঠাকুরসহ প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কক্ষে বসা দেখতে পায়। কী চমৎকার আবিষ্কার! ঠাকুরের বিষয় জানি না। পত্রপত্রিকায় দেখেছি এবং সেও স্বীকার করেছে সেদিন প্রত্যুষ থেকে সে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে ছিল। কিন্তু দুনিয়ার সকলে জানে সেদিন সন্ধ্যায় সামরিক বাহিনীর লোকজন এসে আমাদেরকে প্রথমবারের মতো বঙ্গভবনে নিয়ে শপথ করায়। মোখলেসের বক্তব্য ঘটনার বিষয়ে

www.pathagar.com

অবান্তরও বটে। কেননা সে সেদিন রাত ১১ বা ১১:৩০ মি: সে বঙ্গভবন হতে বাড়ী চলে যায়। রাত্রি ২ ঘটিকার তথাকথিত সভা বা নাটকের বিষয়ে সে অবহিত নয়।

ঠাকুরের তথাকথিত জবানবন্দি যদি সত্যের ধারে-কাছেও হত তা হলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হত যে সেদিন আমার পাশে বসে সে আমার মনোভাব যথেষ্টই টের পেয়েছিল। চীফ হুইপের পদে ছিলাম। কার্যত পদাবনতি ঘটিয়ে আমাকে প্রতিমন্ত্রী করা হচ্ছে। আমি শপথ নিতে অনিচ্ছুক ছিলাম। ঠাকুর আমার কথা শুনে বলেছিল, এই মুহূর্ত কোন কথা বলা সমীচীন হবে না। যা করছে করুক।

পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন করে আর উচ্চবাচ্য করিনি। অসন্তুষ্ট চিত্তে শপথ নিতে বাধ্য হই। শপথের পূর্বে মোশতাক সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। আমাদের তিন জনকে সকলের শেষে নেওয়া হয়। আমরা পৌঁছার পর পরই অনুষ্ঠান শুরু হয়।

কিন্তু আইও চরম মিথ্যার বেসাতি করে সেদিনের এমএসপি'র সহকারি পিএর মুখজবানী বলে দিল বিকাল তিন ঘটিকায় অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদেরকে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কক্ষে দেখা গিয়েছে! কী চমৎকার বলে গেল! আহা বেশ বেশ!

সেদিনের সামরিক সচিবের সহকারি পিএর মুখে অক্টোবর মাসের শেষভাগে তাহার ভাষায় দেশে উত্তেজনাকর ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল বলে বলা হয়। ২রা নভেম্বর রাতে সে কিছু সামরিক অফিসারকে জেল হত্যার বিষয়ে পরামর্শ করতে শোনে। বঙ্গভবনের দ্বিতলের একটি নিভৃত কক্ষে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করার মতো গোপন বিষয়টি আলোচনার সময় তারা মিলিটারি সেক্রেটারির সহকারি পিএকে টেলিফোন নম্বর চাওয়ার উছিলায় ডেকে পাঠায়। তাকে যে সে সময়টিতে সেখানে উপস্থিত রাখতে হবে! তা না হলে চাক্ষুস সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে! তাই টেলিফোনে নাম্বার না চেয়ে তারা তাকে সশরীরেই ডেকে পাঠায়! শুধু তাই নয়, তার উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। তাকে যে শুনতে হবে এবং একসময় আইওর নির্দেশে কোর্টে জবানবন্দি দিতে হবে।

শুধু এটুকুই নয়, সে রাতেই ন'টার দিকে ঠাকুরসহ আমাদের তিন জনকে এমএসপি'র কক্ষে বসা দেখতে পায়। বঙ্গভবনে অন্তত দুটি স্থানে ভিআইপিদের যাতায়াতের খুঁটিনাটি রেকর্ড করা হয়। সেসব

www.pathagar.com

কোর্টে উপস্থাপিত হলেই ওদের মিথ্যার ফানুস উড়ে যাবে। তার উপস্থিতিতেই সামরিক সচিব প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে তার শয়নকক্ষে প্রেরণ করে। মহামহিম সহকারি পিএ মোখলেসুর রহমানকে সাক্ষ্য রেখে মিলিটারি সেক্রেটারি আমাদের চার প্রতিমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের কক্ষে পাঠায়। আমরা নাকি প্রেসিডেন্টের অতি পেয়ারের লোক! ঠাকুর তো তার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী! তারপরও সেই সহকারী পিএর উপস্থিতিতে মিলিটারি সচিবকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে আমাদেরকে তার শয়ন-মন্দিরে প্রেরণ করতে হবে! তা না হলে যে ব্যাটে-বলে হচ্ছে না! এই সহকারি পিএর বক্তব্যে কি আছে? যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় আমরা বঙ্গভবনে গিয়েছিলাম সেটা কী অপরাধ? মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট ভবনে যাবেন না তো কি শুঁড়ি বাড়ি যাবেন?

শুরুতেই নিবেদন করেছি, অক্টোবরের শেষভাগের পর আমাদের আর বঙ্গভবনে যাওয়া হয়নি। সে মাসের শেষে সিলেট থেকে প্রত্যাবর্তন করেই দেখতে পাই ঘটি উল্টে গিয়েছে। দু'জেনারেলের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার আকাশ-বাতাস তখন ট্যাঙ্ক, কামান আর বন্দুকের গর্জনে প্রকম্পিত এবং রাজধানীর অধিবাসীরা অজানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। চারদিক সম্মুখ সমরের ঘনঘটা। স্থলে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্যানি, আকাশে হেলিকপ্টার ও মিগের পায়াতারা। আমরা নিভৃতে পরিস্থিতি অবলোকন করছিলাম। জেল হত্যার নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্তির পর অস্থির হয়ে বের হয়ে পড়ি এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বাসায় একত্রিত হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করি। পরদিন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বঙ্গভবনে খালেদ মোশাররফের উদ্যোগে আহুত ক্যাবিনেটের সভায় যোগদান করি।

সত্য ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য! কিন্তু কি করা যাবে।

জলপ্রপাতের নিচের ছাগ শিশুটিকে সিংহের খেতে হবে। সে উপর থেকে নেমে এসে অজুহাত খাড়া করে, জল ঘোলা করছিস কেন?

হুজুর! নিচ থেকে জল কি করে ঘোলা করা যায়?

তুই না করলেও তোর বাবা করেছিল!

ঘটনা এরকম না হলেও, ভাবার্থ প্রায় একই। আমাদেরকে জড়াতে হবে। যেন-তেন প্রকারেণ আমাদেরকে সেখানে উপস্থিত করতে হবে। কাঠ-খড় পুড়িয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্ত্রীর ইচ্ছার মর্যাদা দিতে গিয়ে

www.pathagar.com

যত সত্যের অপলাপ করেছে তারচাইতে বেশি গুণ করেছে মিথ্যার বেসাতি!

প্রেসিডেন্টের সেদিনের এডিসি কমোডোর গোলাম রব্বানী তার জবানবন্দিতে বলেছে ১৫ই অগাস্টের পর প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমেদ মেজর শাহরিয়ারের সাথে তাকে একটি চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর মিন্টু রোডস্থ সরকারি বাসভবনে পাঠায়। সে চিঠিটি তার হাতে পৌঁছে দেয়। দু'-একদিন পরই চার নেতাসহ আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার বক্তব্যে কোথাও আমার বা অন্য কোন বেসামরিক ব্যক্তির নাম আসে না। আসার কথাও না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তাই তদন্তকারী অফিসারকে না-হক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সন্দেহের আবহাওয়া তৈরির প্রয়াস পেতে দেখা যায়।

মানিকগঞ্জের অ্যাডভোকেট মুসলেমউদ্দীন হাবু মিয়া মোশতাক মন্ত্রী সভারও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

এই হাবু মিয়া তার জবানবন্দিতে অহেতুক কিছু মিথ্যারোপ করেন। তিনি তাহের ঠাকুরকে নাকি দেখেছেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য চাপ দিতে! যতদূর জানি মোশতাক সাহেব তাঁকে এই প্রস্তাব দিলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঠাকুরের কথা জানি না। কিন্তু আমাদের জড়িয়ে এ সম্বন্ধে যে বক্তব্য অন্য সাক্ষীদের মুখে আনা হয়েছে হাবু মিয়ার বক্তব্যে তা পরস্পর বিরোধী হয় না কি?

সে যাই হোক, হাবু মিয়া আমাদেরকে নাকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ দেখেন। ক্যাবিনেট মিটিং ব্যতিরেকে তার সঙ্গে যেখানে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই, সেখানে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আবিষ্কার করে নিজের দোষ স্খালনের প্রচেষ্টা করেন। নিজে ঘনিষ্ঠ না হলে অন্যদের ঘনিষ্ঠতা দেখার সুযোগ কোথায়!

এখানে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ব্যতিরেকে অন্য কেউ মোশতাকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেননি। তাদের সে সুযোগ ছিল না। সৈয়দ সাহেব ও তাজউদ্দীনের কথা জানি না। কিন্তু শুনেছি কামরুজ্জামান সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হলে সে একপায়ে খাড়া

www.pathagar.com

ছিল মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মোশতাক সাহেবের মনোভাব আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বোধগম্য কারণেই সে মনসুর আলী সাহেবের বিষয়ে উৎসাহিত ছিল। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে তার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। এই চার নেতার বাইরে এমন একজনকে দেখা যায়নি যে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অস্থির না ছিল। আবদুল মোমিন তালুকদার সাহেব ছাত্রজীবনে একসময় আমাদের নেতা ছিলেন। সেই সুবাদে সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে স্ত্রী-পুত্র পাঠিয়ে বারংবার আমাকে উপরোধ-অনুরোধ করেছেন যাতে প্রেসিডেন্টের কাছে তার জন্য একটু সুপারিশ করি। জবাবে তাকে জানিয়েছিলাম, পরিস্থিতির আলোকে আমাদের এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নেই। প্রেসিডেন্টকে বলার মতো অবস্থা আমাদের নয়।

আমাদের এলাকার কোরবান আলীর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতানৈক্য হত। তিনিও তার লুকিয়ে থাকা আস্তানা থেকে টেলিফোন করে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছিলেন তাকে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়ে যেন আমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করি। লোক পাঠিয়েও একই অনুরোধ করেন। তাকেও জানাই, আমার এ বিষয়ে কিছুই করার নেই। পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলার সুযোগ নেই। কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে না। অবস্থাদৃষ্টে আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলার পরিবেশও বিদ্যমান নয়। আজ অনেকেই অনেক বিপ্লবী সেজে মুজিব কোট পরিধান করে লম্ফ-ঝম্প দিতে পারে, কিন্তু সেদিন সকলেরই সাদা প্যান্ট পেছন দিকে খাকী হয়ে গিয়েছিল!

হাবু মিয়ার কথায় আসা যাক। তিনি আরও বলেন মোশতাক সাহেব নাকি এমপিদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে আমাদেরকে নিয়োজিত করেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি বঙ্গভবনে এমপিদের যে সভা হয় তাতে নাকি আমাদেরকে খুব তৎপর দেখতে পান। হাবু মিয়ার দিব্যচক্ষু খুলে গিয়েছিল বা তৃতীয় নয়নের যোগ হয়েছিল। হুইপ আবদুর রউফ তখন চীফ হুইপের দায়িত্ব পালন করছিল। সভায় সারাক্ষণ আমরা চুপচাপ বসেছিলাম। একটি কথাও বলিনি। কারো সঙ্গেই যোগাযোগ করিনি। তারপরও তিনি আমাদেরকে খুবই তৎপর দেখতে পান!

আইওর উদ্যোগে এ ধরনের কত মিথ্যাচার লিখিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইদ তার রচিত পুস্তকে লেখেন, 'চীফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং হুইপ

www.pathagar.com

আবদুর রউফের আচরণ আমাদের নিকট বাড়াবাড়ি বলে প্রতীয়মান হয়। আমরা দু'জন নাকি তাদেরকে হুমকি প্রদান করি। অথচ সারা দুনিয়া জানে আমি তখন চীফ হুইপ নই। পদাবনতি হয়ে প্রতিমন্ত্রী। সারাক্ষণ সভায় চুপ করে বসেছিলাম। হুইপ আবদুর রউফই সভা পরিচালনা করছিল। একই পুস্তকে সে অবশ্য উল্লেখ করে, 'অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন এবং রফিকউদ্দীন ভূইয়ার দ্বৈত ও দালালির ভূমিকার কারণে ও কতিপয় এমপির আগ্রহে এমপিগণ বঙ্গভবনে গমন করে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভবনে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নে সকল ন'টায় তেজগাও এমপি হোস্টেলে এমপিরা সমবেত হয়েছিল।'

কই, সেখানে তো আমরা ছিলাম না। তার পুস্তকই এ কথার প্রমাণ দেবে। তবুও আজ যত দোষ নন্দ ঘোষ!

সেদিন ঢাকার শামসুল হক সাহেব যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন। আরও কেউ কেউ বক্তব্য রাখে। কিন্তু কাউকেই সরাসরি মোশতাকের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে শুনা যায়নি। সেটা দোষের নয়। সে পরিবেশে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা না হলেও আজ হাবু মিয়া জীবন সায়াহ্নে হাবুডুবু খেতে খেতে কিছু নির্জলা মিথ্যা কল্পকাহিনীর আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন না! এখনও কি অপেক্ষায় আছেন হাসিনা তাকে ডেকে নিয়ে নিজের ক্ষমতার আঁচলের নিচে আশ্রয় দেবেন!

পুলিশের কাছে তিনি আরও বলেন, ৩-১১-'৭৫ তারিখে জেল হত্যার খবর পেয়ে তিনি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ বঙ্গভবনে মোশতাক সাহেবের কক্ষে গিয়ে আমাদেরকে সেখানে দেখতে পান এবং প্রেসিডেন্ট তার চাপের মুখে স্বীকার করেন সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য নাকি জেলখানায় নেতাদের হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না! সর্বৈব মিথ্যা এই বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় নূরে আলম সিদ্দিকীও হাবুর সঙ্গে সেসময় বঙ্গভবনে যায়। সেক্ষেত্রে সেও প্রেসিডেন্টের স্বীকারোক্তির একজন প্রত্যক্ষ্য সাক্ষী। কিন্তু কাগজপত্রে তার কোন জবানবন্দি দেখা যায় না।

হাবু মিয়া পুলিশকে আরও জানান আমরা নাকি পদত্যাগ করিনি! বিষয়টি সম্যক প্রতিষ্ঠিত হবে যখন মন্ত্রীদের সেই পদত্যাগপত্র কোর্টে উপস্থাপনা করা হবে। জানি না মূল এজাহারের মতো সেটিও এক্ষনে লাপাত্তা কিনা বা তার উপরও নতুন করে আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে কিনা। বেশ কয়েকজন সাক্ষীর মুখে সেই পদত্যাগের উপরে বক্তব্য

www.pathagar.com

চাপানো হয়েছে। কাজে কাজেই সেই পদত্যাগপত্র অবশ্যই কোর্টে উপস্থাপন করতে হবে। যদি সেটিও জালিয়াতির খপ্পরে না পরে থাকে তা হলে আমাদের বক্তব্য দিবালোকের মতো ভাস্বর হয়ে উঠবে।

বঙ্গভবনের আর এক টেলিফোন অপারেটরকে যোগাড় করা হয়েছে। মোঃ ইয়াকুব হোসেন। আইওকে সে আমাদের নাম উল্লেখ করে জানায় আমাদেরকে বঙ্গভবনে দেখা যেত। ক্যাবিনেট মিটিং হলে বা প্রেসিডেন্ট ডেকে পাঠালে বা কোন অনুষ্ঠান থাকলে মন্ত্রীরা অবশ্য সেখানে যাবেন। কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে জবানবন্দি করান গেল, সে এই মামলার আসামি প্রতিমন্ত্রীদের বঙ্গভবনে দেখেছে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী সম্বন্ধে তার বক্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করার কিছু নেই। কেননা, সেখানে তার একটি অফিস ছিল এবং একথা অনস্বীকার্য, ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক ১৫ই অগাস্ট প্রত্যুষ থেকে সে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের অত্যন্ত কাছে থেকে কাজ করছিল। কিন্তু আমাদের কথা কেন বলা হল? আমাদের বিরুদ্ধে এ মামলায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে হবে। কাজে কাজেই আমাদেরকে ঘন ঘন সেখানে দেখতে হবে। টেলিফোন সংযোগ প্রদানকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে এসব কিছুই দেখার কথা নয়। ডিউটি কালীন সর্বক্ষণ তাকে নিজের কক্ষে টেলিফোনের সম্মুখে বসে থাকতে হয়। কখন ভিভিআইপি'র টেলিফোন বেজে ওঠে বা কখন সংযোগ দিতে বলেন। টেলিফোন অপারেটারের পক্ষে এসব বেহুদা কথাবার্তা পুলিশের প্রয়োজনে অবশ্যই থাকতে হবে! সে আরও বলে, মেজরদের আলোচনা থেকে সে জানতে পারে ষড়যন্ত্র করে জেল হত্যা ঘটানো হয়েছে। যে কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এই সাজানো সাক্ষীর মুখের প্রস্তুতকৃত জবানবন্দির অসারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

মানিক নামে আর এক মানিকরতন সংগ্রহ করা হয়েছে। সাত রাজার ধন এক মানিক বলে কথা! সে নাকি ঘটনার সময়ে বঙ্গভবনে খেদমতগারের কাজ করত। খেদমতগার সাহেব কিছু লোকের নাম উল্লেখ করে বলে সে তাদেরকে বঙ্গভবনে দেখে। খুব ভালো কথা! দেখতেই পারে। প্রেসিডেন্টের খেদমতগার! সে সব কাজকর্ম রেখে কেবল গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছে বঙ্গভবনে কে এল, আর কে গেল! আর কারো কথা বলে না, মামলার স্বার্থে সে কেবল বিশেষ ব্যক্তিদের দেখতে পায়! খুবই ভালো কথা!

www.pathagar.com

সে আরও চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা করে। ২রা নভেম্বর রাত ১২ টায় রাষ্ট্রপতির বসার ঘরে জেল হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য নাকি এক সভা বসে! প্রায় দেড় ডজন ব্যক্তির নাম সে গড় গড় করে প্রকাশ করে বলে সে সভায় আরও কিছু আর্মী অফিসার ছিল। সে সবাইকে বেশ উত্তেজিত দেখতে পায়। রাষ্ট্রপতি মোশতাক এক ধুরন্ধর ব্যক্তি বলে পরিচিত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর চাইতে বুদ্ধিহীন ব্যক্তি দ্বিতীয়টি নেই। খেদমতগারকে শুনিয়ে রাখার জন্যই তিনি জিজ্ঞেস করে জেলখানায় কারা যাবে?

উত্তরে ঘাতকদের নামও বলা হয়। খেদমতগারকে যে সব স্পষ্ট শুনে রাখতে হবে এবং পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর যে সাক্ষ্য দিতে হবে। মোশতাক সাহেব মোক্ষম সময়টিই বেছে নেন! ঠিক যখন খেদমতগার মানিক সেখানে উপস্থিত তখনই তিনি জেল হত্যার ষড়যন্ত্রের মূল বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন। তা না হলে মানিক শুনবে কি করে! তার শোনার স্বার্থেই অতি ধূর্ত বলে পরিচিত মোশতাক সাহেব সেদিন বোকার হদ্দ বনেন। তার বক্তব্য মতে মিটিং রাত দেড়টা অবধি চলে এবং সভা শেষে রাষ্ট্রপতি কয়েকজনকে নিয়ে তার বেডরুমে ঢুকে যায়। নিশ্চয়ই আরো ক্লোজ-ডোর কোন ষড়যন্ত্র বাকী। আরও কত কত লোককে হত্যা করতে হবে। আফশোশ! মহামতি খেদমতগারের শোবার ঘরে প্রবেশ করতে সুযোগ পায় না। চা দেওয়া হবে কিনা বা কোন খাবার পরিবেশন করতে হবে কিনা এসব জিজ্ঞেস করার অজুহাতে কান খাড়া করে নিদেনপক্ষে একটি বার তার সেখানে প্রবেশ করা উচিত ছিল! তার অনুপস্থিতিতে যে ষড়যন্ত্রের তথ্য সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়! সারারাতই তার প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। রাত তিনটায় একদফা সব দেখতে হবে। ভোর ছটায়ও অনেক কিছু দেখা ও শোনার আছে! পরদিনও ডিউটি ছাড়তে পারে না! উপরোক্ত আর্মী অফিসারদের পারস্পরিক আলোচনায় সে বুঝতে পারে যে, জেলখানায় নেতাদেরকে উল্লেখিত আর্মী অফিসারগণ অন্যান্যদের সাথে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে। সে পরবর্তী রাত পর্যন্ত একটানা ডিউটি করে আরও অনেক কিছু জানতে পারে।

এইসব জবানবন্দি আলোচনা করতেও স্পৃহা হয় না। জেলখানায় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে এটা সকলেই জানে এবং পুলিশের মতে যারা হত্যা করেছে তারাও নাকি তা স্বীকার করে। হত্যাকারীরা কস্মিনকালেও ঘুণাক্ষরে কোন ষড়যন্ত্রের কথা না বললেও তদন্তকারী

www.pathagar.com

কর্মকর্তার আবিষ্কৃত এইসব সত্যবাদী আমদানী করা হয়েছে যাতে তারা তার শেখানো বুলি ঠিক ঠিক আউড়ে যেতে পারে।

পূর্বেই বলেছি নভেম্বর মাসে একবারই বঙ্গভবনে যাই এবং সেটা চার তারিখের ক্যাবিনেটের সভায়। বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেল হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সেনা সদস্যদের এহেন বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখ খুলে সে রাতে অনেকের বিরাগভাজন হয়ে সঙ্কটে পতিত হই। বঙ্গভবনে প্রতিটি মানুষের আনাগোনার রেকর্ড থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে এই বানোয়াট ও মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সেসব কোর্টে প্রমাণ করতে হবে। এমএসপি'র সহকারী পিএ বা খেদমতগার বাহাদুরদের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে কি উদ্দেশ্যে উপস্থাপনা করা হয়েছে সেটা আর কারো অবিদিত নেই।

আরেক অভ্যর্থনাকারী মোঃ আলী ওরফে অলক। আর্মীরা ১৫ই অগাস্টের পর তাকে তার বোনের বাসা থেকে ধরে এনে মোশতাকের ডিউটিতে লাগায়। সেও যথারীতি বঙ্গভবনে শলাপরামর্শ করতে দেখতে পায়। ২রা নভেম্বর রাতে সে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির টেলিফোন ডিউটিতে ছিল। কেউ কেউ নাকি প্রেসিডেন্টের ফোনে লাইন লাগিয়ে বিভিন্ন স্থানে কথা বলে। অন্য অনেক কথার সাথে এই বিষয়টি তার বক্তব্যে নতুন সংযোজিত হয়। টেলিফোন সংযোগকারীরা যে ঘর থেকে বের হয় না এটা মামলায় সাক্ষী হবার সার্থে বেমালুম ভুলে গেছে। সে, এতটাই বিভ্রান্ত সাক্ষী যে কোর্টে দাড়িয়ে সে বলে সাইফুর রহমান এবং আবদুস সালাম তালুকদার মোশতাক মন্ত্রী সভায় অর্ন্তভুক্ত ছিল। এরা অনেক পরে বিএনপি সরকারের মন্ত্রী হয়।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর পুত্র বর্তমানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম হাসিনার মতোই পিতার অবর্তমানের একজন বড় সুবিধাভোগী। পিতার অমন করুণ পরিণতি না হলে তার আজকের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া ঘটত না। পিতার রাজনীতির বিপরীতে ছাত্রজীবন থেকে অবস্থানকারী এই পুত্র পিতার ক্ষমতা অপব্যবহারপূর্বক হেন অপকর্ম নেই যা সে পাবনা অঞ্চলে সংঘটিত করেনি বলে শোনা যায়। লোকশ্রুতি এরূপ যে, পাবনার সংখ্যাতীত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও তার কোন না কোন সম্পৃক্ততা ছিল। আজ সে ক্ষমতাধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সত্য-মিথ্যা যা খুশি বললেও তাকে নিবৃত করার কেউ নেই।

www.pathagar.com

আমরা সুস্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার করেছি, আমাদের বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সংবাদ পাঠালে আমরা তাঁর সাথে দেখা করি এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে তাঁর হেয়ার রোডের বাসায় রেখে আসি। নাসিমের খালুর বাসার খবর আমরা রাখি না। সেখানে ওবায়েদ এবং আমি গিয়েছিলাম বলে যে গল্প সে ফাঁদে তা নেহায়েতই মিথ্যা। তার সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের প্রশ্নই নেই। ওবায়েদের বক্তব্য বলে সে যা প্রকাশ করে সেটাও স্বকল্পিত। সবই তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক প্রসূত। সে আরও একটি মিথ্যা বক্তব্য রাখে। ২০শে অগাস্ট আমরা তিন জন আইজি পুলিশ নূরুল ইসলামসহ নাকি তার পিতাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যাই। আইজি তাকে নিয়ে গিয়ে ছিল বলে শুনেছি। আমাদের কথা সর্বৈব মিথ্যা। তার বক্তব্য মতে তার পিতা গৃহবন্দী ছিলেন। কোন বন্দীকে অন্যত্র নিতে হলে তা কেবল পুলিশই পারে। কোন সিভিলীয়ান পারে না। এই নাসিমকে আমরা চিনতাম না, জানতাম না। সে একজন সুবিধাভোগী, নব্য আওয়ামী লীগার এবং হাসিনার আস্থাভাজন পরবর্তী অন্যতম ক্ষমতাবান ব্যক্তি। ক্ষমতার দাপটে ধরাকে সরা জ্ঞান করে মুখে যা আসে তাই বলা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বের আমলে বাংলাদেশের পরিচয় ঘটেছে সন্ত্রাসের দেশ হিসাবে। দুর্নীতিতে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছে এই দেশ। দলীয় ক্যাডারদের প্রত্যক্ষ কর্মকুশলতায় দেশে আজ খুন, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ, ছিনতাইসহ সকল বড় অপরাধ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এই নির্লজ্জ মন্ত্রী তারপরও দাঁত বের করে বলে, সকল সন্ত্রাস বিদূরিত হয়েছে। অসত্য ভাষণ ও মিথ্যা বক্তব্যের জন্য কোন বিশ্বরেকর্ডের ব্যবস্থা থাকলে সেও একটা খেতাব পেতে পারত! তার নেতৃত্বে হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের যে লাঠি মিছিল বের হয়, সভ্যতার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই!

সেই নাসিম ক্ষমতার মদমত্ত হয়ে কি বলল, আর কি বলল না তাতে কিছু যায় আসে না। এই মামলা শুরু হবার প্রাক্কালেই ক্ষমতার আসন থেকে সে এবং তার নেত্রী আমাদের দোষী ঘোষণা করে যে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়, তার ফলে বিচারাধীন বিষয়ে যে অহেতুক প্রভাব বিস্তার হয়ে সুবিচারের অন্তরায় সৃষ্টি হয় তা বুঝার জ্ঞান তাদের আছে কিনা জানা নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতায় আসীন হয়ে পিতৃ হত্যার বিচারে অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার এবং পদত্যাগ না করে সাক্ষ্য প্রদানের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টায় একদিন নিশ্চয়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সত্যিকার অর্থে কোনদিন বিচার হলে এসব প্রশ্নের মীমাংসা না করে বিচারকার্য পরিচালনা করলে তা হবে চাপের মুখে প্রভাবান্বিত অবিচার। আমরা এখনও এই বিভাগের প্রতি আস্থাহীনতায় ভুগছি না।

আলী আশরাফ নামীয় সে সময়ের এক সংসদ সদস্যকে সাক্ষী বানিয়ে তার মুখে কতকগুলো অকথ্য বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে দেখলে হয়ত চিনতে পারব। এত আপাঙতেয় ব্যক্তি যে নামে চিনতে পারছি না। পুলিশকে সে জানায়, ১৯৭৫ সালে দেশে কোন নির্বাচন না হলেও সে নাকি সে বছর কুমিল্লার চান্দিনা এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। সাল বলতে গিয়ে গুবলেট করে ফেলেছে যেমনি করেছে মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়ে। তার এ ধরনের অযাচিত বালখিল্য বক্তব্যে কিছু হবার নয়। আলোচনা করতে মন চায় না। দলীয় স্বার্থে কিছু বিরূপ মন্তব্য সংযোজন করার উদ্দেশ্যে ভেড়ার পাল থেকে একজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমরা তিন জন নাকি এমপি হোস্টেলে যাই এবং তাদেরকে নানাভাবে ফুসলাই। চার নেতা গ্রেপ্তারের পর নাকি আমি তার কাছে যাই এবং মোশতাক সাহেবকে সমর্থন দানের জন্য তাকে ইংরেজি বাংলায় নানা ধমক-ধামক দেই! বেটাই একখান!

চিনি না, জানি না, কোথাকার কোন আশরাফ কে জানে! সবাইকে ফেলে তাকে গিয়ে ধমকাবার কি হেতু থাকতে পারে আমার মস্তিষ্কে আসে না। ঘটনার সাথে তার কি সম্পৃক্ততা তাও বোধে আসে না। সে আরও বলে এমপিদের বঙ্গভবনের মিটিং এ আমরা নাকি চারদিকে ঘুর ঘুর করছিলাম। অর্বাচীনের এটা জানা নেই যে প্রেসিডেন্টের সভায় কারো ঘুর ঘুর করা চলে না। একটা কিছু বলতে হবে, বলে দিল। কত্রীর ইচ্ছায় কীর্তন।

বাদী পক্ষের সাক্ষী হিসাবে কুমিল্লার এই আলী আফরাফ ১৯-১০-০২ তারিখ কোর্টে জবান বন্দী দেয়। তার জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ে যাই। '৭০ সালের ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় মন্ত্রী সভার শপথ অনুষ্ঠান হয় একথা সে জানে না। আমি যে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে পদাবনতি পাই তাও জানে না। সেদিন দেশের চীফ হুইপ কে ছিল তাও তার অজানা।

আর একজন টেলিফোন ধরার লোক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী একই সুরে বলে কারা অহরহ বঙ্গভবনে আসা যাওয়া এবং সলা পরামর্শ

www.pathagar.com

করত। তার বক্তব্যে প্রণিধানযোগ্য যে, পরদিন সে পূর্বরাতে কৃত হত্যাকাণ্ডের কথা তার সহকর্মীদের কাছে জানতে পারে এবং সেনা সদস্যদের নিজেদের আলোচনায় জানতে পারে তারাই আগের রাতে জেলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং এই ষড়যন্ত্রে করেছে।

সবকিছুরই রেকর্ড আছে। মিথ্যারও একটা ভিত্তি থাকার কথা! কিছু গাঁজাখোরী কথা ঢুকিয়ে দিলেই শোনা বক্তব্যে বিচারকার্যে গ্রহণযোগ্য হয় না। পরদিন ডিউটিতে গিয়ে সে সব শুনতে পেল এবং ঘাতকদের মুখ থেকেই সব জানতে পারল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে সেদিনই অনেক দেন-দরবারের পর আপস ফর্মূলা হিসাবে এইসব সংশ্লিষ্ট আর্মী অফিসারদেরকে খালেদ মোশাররফ ও সাফায়াত জামিলরা নিরাপদে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়! রিসেপশনিস্টের কাছে এত গাল-গল্প করার সময় এবং সুযোগ তারা কোথায় পেল জানি না। আইও এবং সাক্ষী জানে। তাদেরকে যে জানতেই হবে! কর্তায় বলেছে শালার ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই।

আর এক কীর্তিমান বরেণ্য পুরুষ মোহাম্মদউল্লাহ্। তার নামের আগে-পিছে আর কিছু আছে বলে জানি না। নোয়াখালীর ছোটখাটো নির্জীব মানুষটি কথাবার্তা কম বললেও কপালগুণে সে একজন 'ছুপে হুয়ে রোস্তম'। তিনি আজ পরপারে। কোর্টে তার সাক্ষী দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু শেষ বিচারের দিনে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে কি বলেন দেখার বড় ইচ্ছা!

জেলখানায় বসেই তার মৃত্যুর খবর পাই। মন এত বিষিয়ে ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে ইন্নালিল্লাহ্ পড়া হয়ে ওঠে না। নিজেকে ভর্ৎসনা করে পরক্ষণেই অবশ্য তা করি।

একসময় যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত সাত চরে মুখ না খোলার গুণে গুণান্বিত এই ব্রীফ্‌লেস উকিলকে শেখ সাহেব মাসিক ভাতায় দলের অফিস সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাধ্য হয়ে কলিকাতায় আশ্রয় নিয়ে কর্মহীন মোহাম্মদউল্লাহ এক কোণায় বসে সারাক্ষণ কুট কুট করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার হোতা ছাত্র তরুণদের চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতেন। দেশ স্বাধীন হলে ভাগ্যগুণে তিনি পরপর ডেপুটি স্পিকার, স্পিকার, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ সদস্য হন। থানার দারোগার পদটি ছাড়া বাকি সব পদই কোন না কোন সময় কব্জা করেন। তার মতো বশংবদ শেখ

www.pathagar.com

সাহেব যেমন পাননি, খন্দকার মোশতাকও পাননি। বরং মোশতাকের আমলেই তিনি ছিলেন দেশের দু'নম্বর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। মোশতাকের সকল কর্মের দোসর এবং প্রধান পরামর্শ দাতা। ক্ষমতা থেকে বের হয়েও তিনি মোশতাকের রাজনীতিই করেন। মোশতাকের অবর্তমানে ডেমোক্রেটিক লীগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হন। এমনকি ১৫ই অগাস্ট 'নাজাত দিবস' হবে, না 'শোক দিবস' হবে এই প্রশ্নে দল যখন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় তখন তিনি মোশতাকের সমর্থক রূপে নাজাতীদের সঙ্গে থাকেন। তারপর একসময় সুবিধা বুঝে বিএনপি'তে যোগ দেন। পরে আবার আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়াস পান।

প্রয়াত এই বহুরূপীর পুলিশের কাছে দেয়া জবানবন্দির আজ কোন মূল্য নেই। কিন্তু সেটি যখন পড়ি, অবাক হয়ে যাই। মানুষ এতটা নিচে নামতে পারে কী করে!

১৫ই অগাস্টের গোলাগুলি শুনে তিনি মনে করেন, 'বরিশাইল্যা' ঝগড়া। পদত্যাগ পত্রে তিনি আমাদের স্বাক্ষর খুঁজে পান না। পদত্যাগপত্র নিয়ে আমরা যে তার বাসায় যাই তাও চমৎকারভাবে বিস্মৃত হয়েছেন। বঙ্গভবনের শেষ ক্যাবিনেট মিটিং নিয়েও কত কি বলেন। তার ভাগ্য ভালো তিনি সময়ে কেটে পড়েছেন। তা না হলে তাকে কাঠগড়ায় একবার পেলে খন্দকার মোশতাক কৃত প্রতিটি কাজের প্রধান দায়-দায়িত্ব বহন করে কেন তাকে সাক্ষীর স্থলে আসামিদের কাঠগড়ায় স্থানান্তরিত করা হবে না তা নিয়ে জোর লড়াই হত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এইসব কপট, মিথ্যাবাদী ও বক-ধার্মীকদের সঠিক বিচার করবেন। কিছুই বলা যায় না, মোহাম্মদউল্লাহরা কিভাবে কিভাবে যেন ম্যানেজ করে নেন!

পরপারেও কি নোয়াখালীর তুলশি বনের বাঘ মোহাম্মদউল্লাহ এমনি করে একের পর এক ছাড় পেয়ে পার পেয়ে যাবেন!

প্রয়াত উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্ত্রীর জবানবন্দিতে বলা হয়েছে ২২শে আগস্ট দিবাগত রাত্রে মঞ্জু এবং ওবায়েদ তার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানের অনুরোধ জানায়। বিষয়টি সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত এবং তদন্তকারীর ইচ্ছানুযায়ী বিবৃত।

একমাত্র জনাব নজরুল ইসলামকেই আমরা সর্বদা স্যার সম্বোধন করতাম। শেখ সাহেবকে অধিকাংশ সময় নেতা, বঙ্গবন্ধু এবং একান্তে

www.pathagar.com

মুজিব ভাই বলে ডাকলেও স্যার বলা হত না। সৈয়দ সাহেবের বাসায় প্রায়ই আমরা যাতায়াত করতাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাঁর স্ত্রী হয়ত পর্দানশীন ছিলেন। কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। তদন্তকারীর শেখানো কথামতো কেন তিনি এ মন্তব্য করেন জানি না। কখনও বলছেন মোশতাক সাহেব তার স্বামীকে উপ-রাষ্ট্রপতি করতে চেয়েছিল, কখনও বলছেন মন্ত্রী করতে চেয়েছে। যা-ই চেয়ে থাকুন এবং তাদের মধ্যে যে কথাই হয়ে থাক আমাদের তা কিছুই জানা ছিল না। জানার কথাও না।

তার অন্যান্য বক্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। আমার সব সময়ই মনে হয়, সাক্ষীদের কোন বক্তব্যই তাদের সেচ্ছাকৃত নয়। তদন্তকারী এসব তাদের মুখে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে তারা এ ধরনের নির্লজ মিথ্যা কিছুতেই বলতে পারবে না। তিনিও আজ লোকান্তরিতা। কোর্টে দাড়াবার প্রশই আসে না।

সরকারের প্রতিমন্ত্রী এবং সিপাহীদের হাতে নিহত খালেদ মোশাররফের ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ কেবলমাত্র মামলার স্বার্থে কতকগুলো কথা বলে। তার অন্যসব বক্তব্যও একই প্রকারের ভিত্তিহীন, অসত্য ও বানোয়াটই হবে। সেসব সম্বন্ধে নয়, কেবল আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্বন্ধেই আলোচনা কর যায়।

১৯৬৬ সালে রাশেদ মোশাররফ আমাদের সঙ্গে কারাভোগ করে। 'নিত্য কারাগারে' তার উল্লেখ আছে।

রাশেদ মোশাররফের সঙ্গে কখনওই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত না। সে পুলিশকে নির্বিবাদে বলে দিল আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর আমি এবং মঞ্জু নাকি তার বাসার যাই। কোথায় তার বাসা, কোথায় সে থাকে ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। প্রয়োজনও ছিল না। সে বলে দিল আমরা গিয়ে তাকে বলি, 'সব চুকাইয়া দেওয়া হয়েছে, সব শেষ করে দেওয়া হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কী ডাহা মিথ্যা আর কী সব অদ্ভুত ডায়ালগ! যার সঙ্গে কখনওই দেখা হয়নি, কোন অন্তরঙ্গতা বা হৃদ্যতার প্রশ্নই আসে না, তার বাসায় স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে গিয়ে ধমকা-ধমকি করে এলাম! কি তার মানসিকতা!

শুধু তাই নয়। আরেকদিন আমরা তিন প্রতিমন্ত্রী তাহের ঠাকুরের বাসায় গিয়ে নাকি তাকে ডাকিয়ে এনে আর একদফা ধমকাই। আমি

www.pathagar.com

নাকি বলি, খালেদ মোশাররফের চাল-চলন ভালো না, তাকে সাবধান হইতে বলবেন।

১৯৬৬ সালের রচনা 'নিত্য কারাগারে', যা বাংলা একাডেমী ছাপিয়েছে, পড়লেই অনুধাবন করা যাবে, তাকে আমি তুমি বলে সম্বোধন করতাম। আর এক্ষণে ধমক দেওয়ার প্রয়োজনে সে 'আপনি' হয়ে গেল। তার চাইতে তার ভাই খালেদ মোশাররফের সঙ্গে বরং আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজে ঢুকে তাকে ছাত্র সংসদের প্রমোদ-সম্পাদক হিসাবে পাই। সে বছর সে যখন বিদায়ী ছাত্র তখন আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। কলেজে আমাদের নির্বাচনী দল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠনে সে প্রভূত সহায়তা করে। সেই থেকেই তার সাথে সম্পর্ক।

ছোট ভাইকে ডেকে এনে 'আপনি-আজ্ঞে' করে বড় ভাইকে সতর্ক করে দেওয়ার হেতু ছিল না। তাও এমন আর একজনের বাসায়, যেখানে জীবনে কোনদিন যাইনি, যাবার প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তবুও ভূমি-প্রতিমন্ত্রীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে কতকগুলো অদ্ভুত বক্তব্য বেরিয়ে এল। বুঝি, কিছুই অহেতুক নয়। কোর্টে কাঠ গড়ায় দাড়িয়ে চক্ষু লজ্জায় সে বলে, শাহ্ মোয়াজ্জেম সাহেব ঢাকা কলেজ থেকে আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। ঠাকুর এবং ওবায়েদও নাকি একই ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। সে নাকি সেসব কথা খালেদ মোশাররফকে জানায়। মন্ত্রী মান্নান সাহেবকেও জানায়।

ওদের মুখে সবই মানায়!

সে স্বীকার করে ৩রা নভেম্বর তার ভাইয়ের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা বলে প্রকারান্তরে সে ১৫ই অগাস্টের ঘটনাকে অভ্যুত্থান বলে আখ্যায়িত করে। তার ভাই যে ১৫ই অগাস্টের নায়কদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয় তাও স্বীকার করে। পরদিন সে তার ভাইয়ের কাছে শোনে প্রেসিডেন্ট এবং বিদেশে প্রেরিত আর্মী অফিসাররা ঘাতকদের জেলখানায় প্রেরণ করে নেতাদের হত্যা করে। কথাটি আর একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বলা প্রয়োজন ছিল নাকি? পূর্বদিন সকল অঘটনের হোতা সেই আর্মী অফিসারদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে বড় ভাই বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকাণ্ডের খুনিদের যে ছত্রছায়া দেয়, ছোট ভাই তা নিজের অজান্তেই স্বীকার করে।

www.pathagar.com

'মন মন কহিয়ো, ভেদ না কহিয়ো। ভেদ কহিয়ো তো মারা যাইয়ো।'

আর এক সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান।

আইওকে বলেন, ১৫ই আগস্ট অপরাহ্নে আর্মী অফিসাররা তাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যায়। সকলকেই একইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি আমাদের খুবই ব্যস্ত দেখতে পান। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার ইচ্ছানুযায়ী এই মিথ্যা কথাগুলো মান্নান সাহেব না বললেও পারতেন। বস্তুত আমরা তিন জনই সকলের শেষে নীত হই। গুরুত্ব অনুযায়ী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদেরকে প্রথমে নেওয়া হয়।

মান্নান সাহেবের বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করি। তিনিও সাংঘাতিকভাবে তার নেত্রীর কোপানলে পতিত। মোশতাক মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকেই বর্তমান আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়নি। অভিজ্ঞ ও প্রবীণ প্রায় সকলকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপরও ভীত-সন্ত্রস্থ এইসব তথাকথিত বীর পুঙ্গবেরা শাড়ির আঁচলের কোণা চেপে ধরে 'বাঁচাও মা, বাঁচাও' করছে।

সহবন্দি টাঙ্গাইলের অধিবাসী ও মান্নান সাহেবের কাছের মানুষ এসি আকরামের মুখে শুনেছি, এই মামলায় মান্নান সাহেবকেও জড়াবার কথা ছিল। সে সময় আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলের উপদলীয় কোন্দলের কারণে কাদের সিদ্দিকী তাকে এই মামলায় আসামি করার জন্য প্রকাশ্যে আন্দোলন করে। দুনিয়ার সকলেই একথা জানে। ভীতশংকিত মান্নান সাহেব আরও জোরে আঁচল চেপে ধরেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সে অসুস্থতার অজুহাতে পিজি হাসপাতাল ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা-তদবির সফলকাম হয় এবং মামলায় সরকারের ইচ্ছামতো সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়ে গ্রেপ্তার এড়ান।

মান্নান সাহেবের সঙ্গে সব সময়েই আমাদের সুসম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে আমার সঙ্গে। তার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে যেতাম। টাঙ্গাইলও যাই। কখনও একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতাম। কোনদিনই তার সঙ্গে কোন মন কষাকষি হয়নি। বুঝতে পারি, মামলার আসামি না হওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন। নিজে বাঁচলে পিতার নাম।

www.pathagar.com

তার জীবনের অনেক কথাই জানি। আজ কাঠগড়ায় মুখোমুখি অবস্থান নিলেও সৌজন্যের স্বার্থে আমি সেসব প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নই। দ্বিতীয় বিবাহজনিত পারিবারিক অশান্তির মাঝে অকথ্য রাজনৈতিক নিগৃহতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে সেদিনের ক্ষমতাধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ কেঁচোতে পরিণত হয়েছেন। নিজের মুক্তির বিনিময়ে নিরপরাধ সাবেক সহকর্মীদেরকে অনায়াসে মিথ্যা অভিযোগে জড়াতে তার বিবেকে বাঁধে না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে তাঁর গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মোশতাক সাহেব নির্দেশ দেন। মওলানা সাহেব তাকে অপছন্দ করে বিধায় অসুস্থতার অজুহাতে মান্নান সাহেব সেখানে যেতে চান না এবং আমাকে গিয়ে কাজটি করতে অনুরোধ করেন। আমি সে অনুরোধ রক্ষা করি। আজ অহেতুক ভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করার মানসিকতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। সব জেনে-শুনেও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি কী করে বলেন আমাদেরকে মোশতাক সাহেব এমপিদের সমর্থন আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা।

আজ মান্নান সাহেব সত্যের অনেক দূরে অবস্থান করছেন। তারা স্বীকার করবেন না জানি। কিন্তু মান্নান সাহেবের স্মরণ থাকার কথা আর্মী অফিসাররা যখন রক্ষী বাহিনীকে উস্‌কানি দেওয়ার অভিযোগে রাজ্জাক ও তোফায়েলকে তাদের হস্তে সোপর্দ করার জন্য প্রেসিডেন্টকে চাপ দেয় তখন আমিই প্রেসিডেন্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম সে কাজটি না করার জন্য। রাজ্জাক এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। সেদিন মান্নান সাহেব আমাকে অনেক পিঠ চাপড়িয়ে প্রশংসা করেছিলেন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। আমার এবং মান্নান সাহেবের উভয়েরই। তাই আজ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছেন! তিনিও ১৬ই অক্টোবরের এমপিদের সভায় আমাদের তৎপর দেখেন। সব ক'জন সাক্ষীর ভাষা এবং বর্ণনা মনোযোগের সঙ্গে পড়লে সহজেই ধরা পড়বে এসবের রচয়িতা একজন। এর সুর অভিন্ন। সবই আইওর তেলেছমাতি। মান্নান সাহেবের মুখে রাসেদ মোশাররফের মিথ্যা বক্তব্যেরও সাফাই তুলে ধরা হয়। ঠাকুরের বাসায় আমরা নাকি রাসেদকে ধমকাই, সে মান্নান সাহেবকে

www.pathagar.com

তা জানায়। মান্নান সাহেব তাকে সতর্ক থাকতে বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তার সঙ্গে আমাদের এত সখ্যতা থাকার পরও কোনদিন সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। করবেন কী করে? কথাগুলো যে ১৯৯৮ সালে আমাদেরকে গ্রেপ্তারের পর তদন্তকারী কর্মকর্তার কৌশল ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফসল!

তিনিও পূর্বসুরীদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেন আমরা পদত্যাগ করিনি বা সেটি নিয়ে মোহাম্মদউল্লার বাসায় যাইনি। পদত্যাগ পত্রটি যথাসময়ে কোর্টে উপস্থাপিত হলেই এইসব ধামাধরা মহাজনদের বক্তব্যের অসারতা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত হবে। মান্নান সাহেবের মতো একজন মানুষ কি করে বলতে পারেন উল্লেখিত ক্যাবিনেট মিটিং এ আমরা জেল হত্যার বিষয়ে মোশতাককে সমর্থন করে বক্তব্য রাখি। তিনি আমাদেরকে আটক করা সম্বন্ধেও মনগড়া বক্তব্য রাখেন। অপেক্ষার আছি, কোর্টে এসে আমাদের মুখের সম্মুখে কী বলেন দেখার জন্য।

শুনেছি ময়মনসিংহের আরেক মন্ত্রী জনাব আবদুল মোমিনকেও পুলিশ অনেক চাপ সৃষ্টি করেছিল। তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে দিয়েছেন, যা খুশি করতে পারেন। ওদের কোনই ভূমিকা ছিল না। ওদের চাইতে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব আমাদের বেশি ছিল। ওরা দায়ী হলে আমরা অধিকতর দায়ী।

কাহার আখন্দরা হতাশ হয়ে ফিরে আসে। সে সময়ের আর এক মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের নিকট তদন্তকারী গেলে তিনি রাগতস্বরে বলেন, আপনারা ভাবলেন কী করে যে এই বয়সে আমি আপনাদের কথামতো মিথ্যা সাক্ষ্য দেব!

কিন্তু অন্যরা সত্য ভাষনে নিদারুণ ভয় পায়। অসত্যে কোন কুণ্ঠা নেই।

জেলে যাবে, না মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে?

মিথ্যা সাক্ষ্য দেব। যা বলেন তাই করব। কিন্তু এই বয়সে জেলে যেতে চাই না! মা জননী রক্ষা করো।

জেল এড়িয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অচিরেই যে এক বৃহত্তর এবং আরও ভয়ঙ্কর ও চিরস্থায়ী বিচার অপেক্ষায় রয়েছে তা বিস্মৃত হবেন না!

সাখাওয়াত হোসেন নামীয় আর এক খেদমতগারকে সাক্ষী তৈরি করা হয়েছে। সে কাউকে কাউকে বঙ্গভবনে দেখে। না দেখাটাই বরং

www.pathagar.com

আশ্চর্যজনক হত! সে ও তার সহকর্মী অন্য খেদমতগারের মতো ২রা নভেম্বর রাতে আর্মী অফিসারও অন্যান্যদের নিয়ে প্রেসিডেন্টকে সভা করতে দেখে। চা পরিবেশন করতে গিয়ে হত্যার বিষয়ে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ শুনতে পায়! একই কথার চর্বিত চর্বণ বলে সেসব উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা দেখছি না।

কর্নেল সাফায়াত জামিল এই মামলায় পুলিশকে এক দীর্ঘ জবানবন্দি দেয়। তার নামই শুনেছি, কখনও পরিচয় হয়নি। কেউ বলে না দিলে আজও তাকে চিনব না। তার বক্তব্যের উপসংহারে আমাদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে সে যা বলেছে সেটি ব্যতিরেকে অন্যসব বক্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'৭৫-এর ১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থান এবং ১লা নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনাপঞ্জী সে তার দৃষ্টিকোন থেকে ব্যক্ত করেছে। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।

এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে এবং খালেদ মোশাররফ প্রথম থেকেই পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় ছিল। তারা সময়ের অপেক্ষায় দিন গুণছিল। তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সব জেনেও নীরব ছিল। শফিউল্লাহর কথা না বলাই ভালো। মেরুদণ্ডহীন এই নামধারী সেনাপতির মুখের উপরে নিম্নস্থরা বিদ্রোহের ঘোষণা প্রদান করলেও তার কিছু করার সৎসাহস ছিল না। জিয়াউর রহমানের কাজকর্ম ছিল বানরের পিঠা ভাগের মতো। তিনি এমনি একটি পরিস্থিতিরই অপেক্ষায় ছিলেন। দু'দলে লড়াই করে একদল দেশ ছাড়া আর একদলের নেতা নিহত। মাঝখান থেকে ক্ষমতা তার কুক্ষিগত।

খন্দকার মোশতাকও সে সময়ে প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। তা না হলে এই সব বিদ্রোহের গুঞ্জন ও পদধ্বনির সূচনায় চুপ করে থাকেন কেন! অথবা হয়ত তিনি ক্ষমতাহীন ছিলেন। তাই দিনে দিনে মেঘ জমে একদিন প্রবল বারিপাত ঘটায়।

সাফায়াত জামিল তার বক্তব্যে সেসবই তুলে ধরে।

ক্যাবিনেট মিটিং-এ যখন সশস্ত্র আর্মী অফিসাররা ঢুকে পড়েছিল তখন অনেকেই কারণ বারির নিমিত্তে বেসামাল ছিল। যে সমস্ত ভাষা তারা ব্যবহার করে এবং যে আচরণ করে সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তার কাছে অপ্রত্যাশিত। সাফায়াত জামিল সেখানে দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের

www.pathagar.com

ঘোষণা দেয়। কিন্তু পরে তাকে আর পুলিশে সোপর্দ করে না। কারণ সহজেই অনুমেয়।

আমাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল, কোন কারণ দেখাতে পারে না। সাফায়াত জামিল যে কারণের কথা এখন বলে সেটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে এনে পুলিশ আমাদের নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। সারারাত পর আর্মীদের ইচ্ছানুযায়ী তারা দু'জনকে বাসভবনে নিয়ে গৃহবন্দি করে এবং ঠাকুর ও আমাকে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে কারাগারে পাঠায়। পুলিশ অফিসারগণ বার বার নিবেদন করে, স্যার, আমাদের কিছুই করার নেই। আপনাদের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্ষমতাসীন সেনা কর্মকর্তাদের আদেশ-নির্দেশ অবহেলা করা সম্ভব নয়।

দু'দিন পরই অবশ্য সেনাবাহিনীর লোকেরাই আমাদেরকে মুক্ত করে আনে। সেটা '৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের ঘটনা। সেটা ছিল তৃতীয় অভ্যুত্থান এবং মূলত সিপাহীদের দ্বারা সংঘটিত।

আর এক প্রতিমন্ত্রী সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজীও সাক্ষী। তার জবানবন্দি পড়ে সেই পুরনো কথাই আবার মনে পড়ে, চোরের মা'র বড় গলা। গড্ডালিকা প্রবাহের মতো পুলিশের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি আরও কিছু সংযোগ করেন।

মোশতাকের সঙ্গে তিক্ততা প্রমাণের জন্য এক অভিনব প্রসঙ্গের অবতারণা করেন এবং আমাদের সম্বন্ধেও নাহক কতগুলো মিথ্যা এবং পুলিশের উদ্ভাবিত বক্তব্য সংযোজন করে নিজের দোষ স্খালনের প্রয়াস পান।

পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পর সরকারের প্রতিমন্ত্রীরূপে তাকে সঙ্গে নিয়েই শেষ কাজটি সম্পন্ন করি সিলেটে গিয়ে। সেখান থেকে ফিরে এসে বিমানবন্দরেই জানতে পারি পাল্টা অভ্যুত্থান আসন্ন। অবস্থাদৃষ্টে আমরা যার যার বাসভবনে চলে যাই।

খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে তার ছিল অতিশয় হৃদ্যতার সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধুর সময়ে মোশতাক সাহেব যখন বাণিজ্যমন্ত্রী তখন তিনি ফরিদ গাজীকে তার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীরূপে পান। ফরিদ গাজী ছিল মোশতাক সাহেবের অতি প্রিয়ভাজন।

একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই সব বোধগম্য হবে। সকল মন্ত্রীর

www.pathagar.com

অফিসই সচিবালয়ে অবস্থিত। উপ-রাষ্ট্রপতিও সেখানে বসেন। মোশতাক সাহেব প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন দু'বার সচিবালয়ে আসেন। উপরাষ্ট্রপতি বা অন্যকোন সিনিয়র মন্ত্রীর কক্ষে না গিয়ে দু'বারই তিনি তার স্নেহধন্য প্রতিমন্ত্রী ফরিদ গাজীর অফিসে এসে বসেন। চা পান করে গল্প-গুজব করে খোশহালে বঙ্গভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। কখনও বঙ্গভবনে কার্যব্যপদেশে গেলে প্রায় সময়ই তাকে সেখানে দেখা যেত। প্রেসিডেন্টের প্রিয়ভাজন বলে ডিএফ গাজী সাহেব সর্বত্র বিশেষ সমাদর লাভ করতেন। তার কদরই ছিল পৃথক! সরকারী সাক্ষী মোখলেসুর রহমান বঙ্গভবনে সে সময় কার্য্যরত ছিল। সে ২৭-৬-০২ তারিখে সাক্ষ্য দেয়, দেওয়ান ফরিদ গাজী সব সময় মোশতাকের সঙ্গে ওঠা বসা করতেন।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় এই মামলায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ্যযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিরুক্তি হলেও প্রণিধানযোগ্য।

(১) মামলার মূল এজাহার নথি থেকে অবৈধভাবে চুপিসারে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তার কারসাজি।

(২) সেটি ৯-৯-'৯৬ তারিখে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ফটোকপি হলেও মূল এজাহার ব্যতীত ফটো সংগ্রহ অসম্ভব।

(৩) ১৯৭৫ সালে কোন অফিসে ফটোস্ট্যাট করার মেশিন ছিল না।

(৪) মূল এজাহারে কোন আসামির নাম ছিল না। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে ডিআইজি প্রিজন কর্তৃক জেল অভ্যন্তরে প্রবেশকারী বহিরাগত সশস্ত্র নয় জন ঘাতকের নাম উল্লেখ সম্ভব ছিল।

(৫) নিজেদের কৃত অপরাধ গোপনের উদ্দেশ্যে এবং ঘাতকদের সহায়তা করার ঘটনা অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য একটা দায়সারা এজাহার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

(৬) এই এজাহারের কপি এসপি, ডিসি, আইজি, পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়েছিল। সেসব একই সঙ্গে উধাও হওয়া সম্ভব নয়।

(৭) পরবর্তীতে অসৎ উদ্দেশ্যে একটি জাল ফটোকপি প্রস্তুত করে নথিভুক্ত করা হয়। জাল এবং প্রতারণা দুটিই সংঘটিত হয়, একই উদ্দেশ্যে একজন আসামির নাম সেখানে উল্লেখ করা হয় যাতে

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তার সাথে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে ইচ্ছা মাফিক অন্য লোকদের জড়ানো যায়। এটাও তদন্তকারীর দূরভিসন্ধি। '৭৫ সালের এফআই আর ফর্মের সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি সম্যক ধরা পড়ে।

(৮) তদন্ত হাতে নিয়ে নানা বিধি বহির্ভূত পন্থায় আইও এই মামলায় ক্রমাগত অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চার বার মেমো অব এভিডেন্স কোর্টে দাখিল করেছে। একবারও কোথাও আমাদেরকে অভিযুক্ত করেনি। তদন্ত শুরুর পর ৭৫০ দিন অর্থাৎ দু'বছরের ঊর্ধ্বকাল পরে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামি গ্রেপ্তার হলেও এবং সাক্ষীদের তথাকথিত জবানবন্দিতে নাম থাকলেও কেন গ্রেপ্তার করে না? দু'বছর পর নিশ্চয়ই কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নির্দেশে আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের ইঙ্গিতে প্রস্তুতকৃত জবানবন্দি পিছনের তারিখ দিয়ে কোর্টে দাখিল করে। এটা অবশ্যই জালিয়াতি।

(৯) দণ্ডবিধির ১২০ ধারার অপরাধের মামলায় সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন বা Sanction নিতে হবে। সেটা করা হয়নি।

(১০) ম্যাজিস্ট্রেটকে বিধি মোতাবেক উপরোক্ত ধারার মামলার আমলে নিতে হবে অর্থাৎ Cognizance নিতে হবে। সেটাও নেওয়া হয়নি।

(১১) অনির্ধারিত তারিখে আসামিদের অনুপস্থিতিতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তেমনি আর এক অনির্ধারিত তারিখে সেটা গৃহীত হয়েছে। মামলার নথি একই পদ্ধতিতে দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২) নথির সঙ্গে অবশ্য প্রেরণীয় দলিলাদি পুলিশ তাদের হেফাজতে রেখে দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করেছে।

(১৩) আরেক অনির্ধারিত তারিখে কিছু কাগজপত্র দায়রা আদালতে প্রেরণ করে নথিভুক্ত করেছে।

(১৪) প্রতারণা ও ছলচাতুরি প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে কাগজপত্রের সইমোহরকৃত নকল বিবাদীপক্ষকে দেওয়া হয় না। কাজটি বিধি বহির্ভূত।

(১৫) উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন অন্য মামলার কিছু দলিলাদি বে-আইনিভাবে এই নথিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

(১৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক নিজহস্তে সাক্ষীদের জবানবন্দি না নিয়ে বিভিন্ন লোক দিয়ে লিখিয়েছে। কিন্তু প্রতারণাপূর্বক লিপিবদ্ধকারী রূপে নিজেকে দেখিয়েছে। হাইকোর্ট ও বিচারাধীন কোর্টের পুনঃপুন নির্দেশে ২৭-৬-২০০০ সালে অন্য তিন জন লিপিবদ্ধকারীর নাম প্রকাশ করে।

(১৭) অন্তত ৩৫টি জবানবন্দিতে তদন্তকারীর স্থলে জনৈক এ.বি.এম. ফজলুল করিমের দস্তখত পাওয়া যায়। এটা বিধি বহির্ভূত। নকল বিভাগের কর্মচারীদের গাফিলতি বলে বিষয়টি ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

(১৮) এই মামলায় প্রথম থেকে আজ অবধি তদন্তকারী কর্মকর্তা যেসব অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দূরভিসন্ধিমূলক কাজ করেছে তাতে প্রতারণা ও জালিয়াতির দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোন বিচার চলতে পারে না।

(১৯) আইওর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের নিষ্পত্তির পর মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২০) আইও সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক বিঘোষিত নয় জন ঘাতকের মধ্যে আট জনকেই আসামি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

(২১) হত্যাকর্মে সহায়তাদানকারী কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আসামি না করে তাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে আইও গুরুতর অপরাধ করেছে।

(২২) জেলখানার সংশ্লিষ্ট লোকদের আসামি না করে এই মামলা চলতে পারে না।

(২৩) মামলায় প্রথম দফা সশস্ত্র ঘাতকদের নেতা বলে কথিত রিসালাদার মোসলেমকে এক্ষনে আসামি করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফার নেতা এ. আলী রেহাই পেতে পারে না।

(২৪) নির্যাতন-নিপীড়নপূর্বক এক আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে তার বলে বলীয়ান হয়ে সেই সুরে মিথ্যা ও বানোয়াট সাক্ষী তৈরি করে নিরপরাধ লোকদের জড়িত করার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তথাকথিত সেই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেও একত্রে বসে কোন বৈঠকে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এমন কথার উল্লেখ নেই। আইন ব্যক্তিক্রোধ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। আইও ক্ষমতাসীনদের খুশি করার মানসে এই গর্হিত অপরাধ করেছে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখিত হল মামলার সূত্রপাতে যেসব বিধি বহির্ভূত ও আইনের বরখেলাপ মূলক কাজ হয়েছে তা বুঝাবার জন্য।

সকল ন্যায়-নীতি ভঙ্গ করে এবং দূরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা যে সমস্ত সরকার দলীয় স্বার্থান্বেসী সাক্ষী যোগাড় করেছে বা ছল চাতুরি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে সে সময়ের যে গুটি কয়েক অতি নিম্নস্তরের কর্মচারি জুটিয়ে শিখণ্ডী সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের পুলিশে প্রদত্ত জবানবন্দি খানিকটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে অতি সংক্ষেপে সেইসব সাক্ষীদের জবানবন্দির বৈশিষ্ট্যের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত রাখা আছে।

১। জেলখানার অভ্যন্তরে বা অকুস্থলের যেসব সাক্ষী তাদের বক্তব্যে আমাদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকার কথা নয় এসব সাক্ষীর বক্তব্য আলোচনা না করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু মামলার স্বার্থে এটা অনস্বীকার্য যে, সত্যিকারের বিচার করতে হলে, এদেরকে অবশ্যই তাদের অন্যান্য সহযোগিদের সাথে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

২। বাদীর দায়েরকৃত এজাহার মূলে জেল অভ্যন্তরে সরাসরি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কথা রয়েছে। হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় পড়ে। তাদের রূপান্তরিত এজাহারে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কারা কিভাবে হত্যা করেছে। কাজেই এখানে কোন সন্দেহ বা সংশয়ের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে এজাহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলায় অন্যান্য ধারা, যথা একত্র যোগসাজসে ষড়যন্তপূর্বক অপরাধ সাধিত হয়েছে এসব বলার কোন সুযোগ বা যুক্তি থাকে না। কাজে কাজেই ১২০বি ধারা সেখানে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা প্রযোজ্য নয়।

৩। বিভিন্ন টেকনিক্যাল বা পদ্ধতিগত সাক্ষীদের বিষয় আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। বিচারের মূল পর্যায়ে যদি তারা আসে এদের দ্বারা তখন অনেক জটই খুলে যাবার সম্ভাবনা।

৪। আমাদের সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত সরকার দলীয় স্বার্থবাদী সাক্ষীর 'ব্যাক ডেটেড' জবাববন্দি উপস্থিত করা হয়েছে তারা হয় আওয়ামী আমলে ক্ষমতাসীন নয় তাদের দোসর একই দলভুক্ত। তাদের সকল জবানবন্দিই সরকারের কোন একটি কেন্দ্রে বসে তাদের ইঙ্গিতে লিখিত হয়ে অনেক পরে প্রতারণাপূর্বক নথিভুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মাণ হয় এসব জবানবন্দির স্থানে স্থানে ভিন্ন কালিতে এমন সব কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলো তারা বলেছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন। হাইকোর্টের রায়ের পর এবং দায়রা আদালতের বিচারকের পুনঃপুন নির্দেশের পর ২৭-৬-২০০০ তারিখে 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে' অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনটি অজানা নাম কোর্টে দাখিল করে বলে, এসব জবানবন্দি তাদের হাতে লিপিবদ্ধ। তার পূর্বের সকল বক্তব্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। অবশ্য এটাও একটা নতুন মিথ্যা। সেক্ষেত্রে এইসব পেছনের তারিখ দেওয়া স্বার্থান্বেসী মহলের সাক্ষের কোন মূল্য থাকে না। থাকার কথা না। কিন্তু তারপরও তাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি? যদিও তারা আগাগোড়া বানোয়াট বক্তব্যই রেখেছে তবুও সেসব কি প্রমাণ করে একবার পরীক্ষা করা যাক। তারা বলার চেষ্টা করেছে আমরা তৎপর ছিলাম, এমপিদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা করেছি, বঙ্গভবন বা প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ ছিলাম এবং জেল হত্যাকাণ্ডের পরে পদত্যাগ করিনি। কথাগুলো যদিও সর্বৈব মিথ্যা এবং সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছুই নয়, তবুও বলব যদি যুক্তির খাতিরে এগুলোকে যথার্থ বলেও ধরে নেওয়া হয়, এসব কার্যাবলী দণ্ডবিধির কোন ধারায় বর্তায়? একটি কাজও অপরাধমূলক নয়। ওদের মিথ্যা ভাষণ মতে যদি ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করার মানসে বঙ্গভবনে নিয়ে থাকি সেটাও অন্যায় নয়। বরং তার কল্যাণ কামনায়ই করা হয়েছে বা খালেদ মোশাররফকে তার ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে সতর্ক করে থাকলে তার মঙ্গল চিন্তায়ই করা হয়েছে। অন্যায়টা হয়েছে কোথায়?

তর্কের খাতিরে বলা চলে সেসব কথা শুনলে খালেদ মোশাররফের এই করুণ পরিণতি হত না। মামলার রেকর্ড নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এইসব জবানবন্দি অনেক পরে, আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার পরে অতি উচ্চ মহলের নির্দেশে তদন্তকারীর মস্তিষ্কপ্রসূত। এক বৈঠকে তাদের ইঙ্গিতে তাদের লোক দ্বারা লিখিত।

৫। হত্যার ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্য উদ্ভট সাক্ষী যোগাড় করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবের সহকারি পিএ বলছে ঘটনার রাত্রে আমাদেরকে বঙ্গভবনে দেখা গিয়েছে।

কথাটা একান্তই অবাস্তব। পরিস্থিতির কারণে প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট ভবনে অবশ্যই যেতে পারেন।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে তাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে হয়। প্রেসিডেন্টের কোন একজন এডিসি তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েটিং রুমে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানায় এবং যথা সময়ে এডিসি বা প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব তাদেরকে প্রেসিডেন্টের কক্ষে নিয়ে যায়। এখানে মামলার স্বার্থে চার জন প্রতি মন্ত্রীকে একসঙ্গে সামরিক সচিবের কক্ষে অপেক্ষারত দেখানো হয়। সে তখন তার সহকারী পিএকে ডেকে এনে সে রাত্রে তাদেরকে দেখে রাখার সুযোগ করে দেয় এবং সেই সহকারী পিএ'র সম্মুখেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে তার কাছে প্রেরণ করে। কথাগুলো শুধু ডাহা মিথ্যাই নয়, সেসব নিয়ম বহির্ভূত এবং আইও'র কল্পনাপ্রসূত।

সেই সামরিক সচিব আজ বেঁচে নেই। যা খুশি বলার এখন সুযোগ রয়েছে।

দুনিয়ার সকলে জানে '৭৫ সালের ১লা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানের পর এবং ২রা নভেম্বর সকালে তাদের বঙ্গভবন দখলের পর সেখানে কোন বেসামরিক ব্যক্তির প্রবেশের কোন সুযোগ ছিল না। ১ তারিখ থেকেই একজন সিভিলিয়নও সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। আমরা টেলিফোনেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। এক সহকারী পিএ এনে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে দু'তারিখের রাত্রে আমরা বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলাম। সহকারী পিএ বা টেলিফোন অপারেটর সর্বক্ষণ তার কক্ষে অবস্থান করবে এটাই সত্যসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু মামলার স্বার্থে তাকে ডেকে নেওয়া হয়। সে সব দেখে ও শোনে। কথাগুলো এত অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য যে চিন্তা করলেও হাসি পায়।

তারচাইতেও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দু'খেদমতগার সরাসরি প্রেসিডেন্টের আহুত ষড়যন্ত্রের সভায় চা পরিবেশন করতে প্রবেশ করে সব দেখে এবং শোনে। তাদেরকে আগামীতে সাক্ষী করা হবে সেই বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে জেল হত্যা সম্বন্ধে কর্নেল রশীদের সঙ্গে কথা বলেন। কি সুদূর প্রসারী চিন্তা এবং অভিনব সাক্ষী!

বাদী পক্ষের বক্তব্য যদি তর্কের খাতিরে সত্য বলে ধরেও নেওয়া যায় তারা কি আমাদেরকে কোন কথা বলতে, কোন আলোচনায়

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করতে বা কোন সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছে? ১৬১ ধারার জবানবন্দিতে তারা সে ধরনের একটি কথাও বলেনি।

ষড়যন্ত্র মামলার মূল প্রতিপাদ্য হতে হবে, একই উদ্দেশ্যে একত্রে বসে একটি আলোচনা হবে, তাতে উপস্থিত সকলের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং সেই মর্মে অপরাধ সংঘটিত হবে। এখানে মোশতাক সাহেব ও রশীদের বাক্যালাপে কেবলমাত্র মোসলেমের নাম উল্লেখ হয়েছে। এছাড়া আর কারো কোন বক্তব্যের উল্লেখ নেই। অন্য কেহ একটি শব্দ উচ্চারণ করেছে বলেও কোন কথা নেই। তা হলে ষড়যন্ত্রে অন্যদের সম্পৃক্ত করা যায় কী প্রকারে!

একমাত্র ক্ষমতার দাপটে এবং আরও ক্ষমতাধর তদন্তকারীর অকাট মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমেই আজ আমাদেরকে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হয়রানির শিকার করা হয়েছে। দণ্ডবিধির ষড়যন্ত্রের ধারায় যেসব উপাদানের প্রয়োজন তার বিন্দু বিসর্গও এইসব মিথ্যাশ্রয়ী ও বানোয়াট সাক্ষীদের জবানবন্দিতে নেই। তা হলে সেই ধারায় কৃত অপরাধ বিবেচনায় আসে কী প্রকারে!

মোদ্দা কথা, প্রসিকিউশনের সাজানো মামলায়ও আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরও রেহাই নেই!

২রা নভেম্বর রাতের অন্ধকারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার নিন্দার ভাষা আমাদের জানা নেই। একথা পূর্বেও বহুবার বলেছি, এখনও বলছি। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারও আমরা সর্বদা দাবি করেছি। কিন্তু এক জঘন্য অপরাধের বিচারের নামে আর এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছে এই প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার। তাদের নেত্রীর বক্তব্যমতে আমরা তিন জন তাদের রাজনীতি বর্জন করেছি বলে আজ তারা প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। তাই অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একটি মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে অসত্য ও বানোয়াট জবানবন্দি প্রস্তুত করে বেআইনি ও বিধিবহির্ভূতভাবে মামলায় সন্নিবেশিত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে আজ মূল মামলাই প্রশ্নের সম্মুখীন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যেসব প্রতারণা, জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে, সেসব নিষ্পত্তি না করে মামলা নিয়ে অগ্রসর

www.pathagar.com

হলে বিচার বিভ্রাট ঘটা অসম্ভব নয়। যদি একসময়ে দেখা যায় অভিযোগসমূহ সত্য এবং প্রমাণিত হয় যে, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ দায়েরকৃত অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সেক্ষেত্রে তখন যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয় তা হলে তার দ্বারা কৃত অপরাধ আশ্রয়ী মামলা ধোপে টিকবে না। সবচাইতে বড় কথা, জালিয়াতি ও প্রতারণা আশ্রয় করে যে মামলা দাঁড় করান হয়েছে সেটা আদৌ বিচার্য হতে পারে না। তার প্রস্তুতকৃত বেআইনি দলিল ও জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে যদি কোন আসামির সাজা হয়ে যায় এবং তার পরে তদন্তকারীর অবিমৃশ্যকারীতা প্রমাণিত হয় তা হলে বিচারের নামে ঘোরতর অবিচারই অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু মিথ্যাচার হাইকোর্ট এবং বিচারাধীন কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে।

অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সিপাহী বিদ্রোহের পথ ধরে ক্রমান্বয়ে যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব সর্বোতভাবেই সেনা সদস্যদের উপরে বর্তায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট এদেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সে অভ্যুত্থানে তদানীন্তন সরকার প্রধান এবং আরও কেউ কেউ নিহত হন। একুশ বছর পর সেই নিহত সরকার প্রধানের কন্যার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে প্রতিহিংসার অনল তাদের বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আজ তাদের মুখনিসৃত বক্তব্যই সকলকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। সেদিনের সামরিক অভ্যুত্থান আজ নিছক হত্যাকাণ্ড বলে আখ্যায়িত হচ্ছে।

কিন্তু সেদিন এটি ছিল পট-পরিবর্তন বা সরকার পরিবর্তন। সামরিক অভ্যুত্থান কোন নতুন ঘটনা নয়। বিশ্বের অন্যত্রও এটা পরিদৃষ্ট হয়। ঘটনার পর পরই আজকের সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী সেই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে তাদের পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাকে' যে সম্পাদকীয় লিখেছিল সেটা বিলক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। গরজ বড় বালাই বলে তারপরও সে সরকারের অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর খুব কাছের মানুষ।

অভ্যুত্থান কখনও রক্তক্ষয়ী আবার কখনও সেটা রক্তপাতহীন হয়। কিন্তু অভ্যুত্থান অভ্যুত্থানই। সেটা সফল হল না বিফল হল সেটাই বিচার্য। সফল হলে ক্ষমতা, বিফল হলে শাস্তি ভোগ। ইংরেজিতে বলে, Throne or throat.

'৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থান যতই শোকাবহ হোক এবং

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগারগণ আজ তাকে যে নামেই আখ্যায়িত করুক সেদিন সেটা সকল অর্থেই ছিল সফল। অভ্যুত্থানের পক্ষে বা রক্তক্ষয়ী ঘটনার সাফাই গাইবার জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি না, ইতিহাসের বিশ্লেষণে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেদিনের ঘটনা সর্ব সংজ্ঞাতেই ছিল একটি স্বার্থক অভ্যুত্থান। দেশ-বিদেশ থেকে স্বীকৃতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অভ্যুত্থানের নায়করা সাবেক সরকারেরই একজনকে প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত করে। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তার যথাবিধি শপথ পরিচালিত হয়। একের পর এক সকলে এসে সেই পরিবর্তীত সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সশস্ত্র তিন বাহিনীর প্রধান, বিডিআর প্রধান, পুলিশের আইজি সকলেই আনুগত্য প্রকাশ করলে সন্ধ্যায় নতুন প্রেসিডেন্ট সাবেক মন্ত্রিসভার প্রায় সকলকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সরকারের সকল কাজ-কর্ম যথাবিধি চলতে থাকে।

অভ্যুত্থান হলে পাল্টা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা থেকেই যায়। কোন কারণ বা যথার্থতা ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন নেই। ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটাই এখানে উল্লেখ্য।

১লা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। উচ্চাভিলাষী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। অন্যসব তথ্য বাদ দিলেও তার অতি নিকটতম ব্যক্তি কর্নেল সাফায়াত জামিলের যে জবানবন্দি এই মামলায় প্রদত্ত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা করলেই এ কথার যথার্থতা উপলব্ধিতে আসবে। নভেম্বরের প্রথম তারিখেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয় এবং বঙ্গভবনে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ভবন পরিত্যাগপূর্বক ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন করে ঘটনার দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটায়। ২রা নভেম্বর সকাল থেকে বঙ্গভবন সম্পূর্ণ রূপে খালেদ মোশাররফদের নিয়ন্ত্রণে। ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১লা তারিখে তার মা এক শোভাযাত্রা সহকারে শেখ সাহেবের ভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সেদিন থেকেই সকল সিভিলীয়নের জন্য বঙ্গভবন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। টেলিফোনেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না।

পরের রাতে জেলখানার মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে। সেনা সদস্যদের হাতেই ঘটে। সহায়তা করে জেলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এখন প্রশ্ন কে বা কারা এই হত্যার উদ্যোক্তা? খন্দকার মোশতাক

www.pathagar.com

ও তাঁর সঙ্গে বঙ্গভবনে বসবাসরত রশীদগং হওয়াটা অসম্ভব নয়। বরং সেটাই বেশি সম্ভবপর। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা ও গবেষণামূলক পুস্তাকাদিও সে কথাই বলে। কিন্তু তারপরও একটি সন্দেহের ধূম্রজাল রয়ে যায়। সেদিনের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক যেমন তাঁর সম্ভাবনাময় প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করে দিতে চাইতে পারেন, তেমনি করে উদীয়মান আর এক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি খালেদ মোশাররফও তার সম্ভাবনাময় প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে।

কথায় বলে, জিনিস যায় যার ইমান যায় তার। আমরা আমাদের চার নেতাকে হারিয়েছি। সন্দেহ দানা বাঁধতেই পারে। এ ঘটনার সমর্থন আরও মিলে যখন দেখা যায়, ১৫ই অগাস্টের হোতা এবং তাদের অভিমতানুযায়ী জেল হত্যাকাণ্ডেরও হোতা সেইসব সামরিক অফিসারদেরকে খালেদ মোশাররফই পরদিন বিদেশে প্রেরণ করে দেয়। তাদের আটক না করে ভবিষ্যতে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচারে সোপর্দ করার ব্যবস্থা না করে নির্বিঘ্নে বিদেশে প্রেরণ করার পশ্চাতে নিজের ক্ষমতায় আরোহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাই হোক বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক, কাজটি নিঃসন্দেহ অতি গহির্ত। সে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত না থাকলেও হত্যাকারীদের বিদেশে পাচারে অবশ্যই জড়িত। তাছাড়া আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মোট দুটি ঘাতক দল জেল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় দল যে খন্দকার মোশতাক প্রেরিত তার কোন প্রমাণ নেই। তবে কি এই দ্বিতীয় ঘাতক দল খালেদ মোশাররফ প্রেরিত? কে জানে!

খালেদ মোশাররফ কতটা দায়ী তা আজ আর বিচারে আসবে না। ৭ই নভেম্বর সিপাহীদের আর এক বিপ্লবে তার দু'দিনের ক্ষমতা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তাকেও সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

ঘটনাক্রমে আমরা তখন বন্দি। তা না হলে তার ছোট ভাইয়ের মতো কেউ ক্ষমতায় বসে আবার একটি হত্যা মামলা চালু করে আবদুল কাহার আখন্দের মতো অতি আগ্রহী তদন্তকারী যোগাড় করে আমাদের মতো মানুষদের অবলীলাক্রমে হয়রান করতে পারত। খালেদ মোশাররফের ছোট ভাই প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্ভট জবানবন্দিতে তো তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেই রেখেছে। আমরা নাকি তার মাধ্যমে তার ভাইকে

www.pathagar.com

পূর্বেই হুমকি দিয়ে রেখেছি! আর একটি মামলা সাজানো খুব কষ্টকর হ'ত না। বন্দি থাকলেও পূর্বাহ্নে ষড়যন্ত্রে অসুবিধা কোথায়। আর কিছু পিয়ন-চাপরাশি সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে।

৭ই নভেম্বর কিভাবে এই সিপাহী জনতার বিপ্লব ঘটল এবং কোন অবস্থায় কাদের হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই সিপাহসালার প্রাণ হারাল সেটাও দেখা প্রয়োজন বৈকি! তাতে পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসীন কোন সেনাপতির হাত আছে কিনা তাও দেখা প্রয়োজন। সেই সেনাপতি বেশ কিছুদিন রাজত্ব করার পর তার যে পরিণতি হয় সেটাও নতুন করে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। তাকে যে হত্যা করে, তাকে আবার কে হত্যা করে সেসবও উদ্ঘাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহন এবং ক্ষমতায় বসে হত্যা করা বা এক কথায় হত্যার রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী হিসাবে এটা আমাদের একান্ত কাম্য।

২৭শে জুন, ২০০০ সাল। আজ সেশন আদালতে আমাদের মামলার চার্জ-শুনানি গেল। সরকার পক্ষ ঢালাওভাবে সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হত্যা এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করে এবং কী ধরনের সাক্ষ্য তারা প্রদান করবে তার একটি ছক প্রদান করে। সিনিয়র প্রসিকিউটারের অনুপস্থিতিতে তার আইনজীবী পুত্র আজ এ কাজটি করে।

প্রায় সকল অভিযুক্তের পক্ষ থেকেই এই মামলার অন্তসারশূন্যতা এবং তাদের সম্পৃক্ততার প্রাথমিক অভিযোগ দাঁড়ায় না বলে তারা সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে। অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ মুন্সী সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখে। আমার আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন পরবর্তী তারিখে বক্তব্য রাখবে বলে চয়ে যায়।

সকলের বক্তব্যেই যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে। কিন্তু সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টি আকর্ষক বক্তব্য রাখে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পলাতক আসামি মোসলেমউদ্দীনের কৌশুলী অ্যাডভোকেট মোঃ হানিফ। ঢাকা কোর্টে প্র্যাকটিস করাকালীন অ্যাডভোকেট হানিফের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সে বেশ রসিক লোক। তার বক্তব্যে সে বলার চেষ্টা করে, বুঝতে পারছে না সে কার খালু। তাকে জনৈক মোসলেমউদ্দীনের পক্ষে সরকার তাকে কৌশুলী নিয়োগ করেছে। তাদের এজাহারেও একমাত্র এই ব্যক্তির

www.pathagar.com

নামই ঘাতক হিসাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই মোসলেমের পরিচয় উন্মোচিত হয়নি। অর্থাৎ মোসলেমকে সনাক্ত করা হয়নি। মামলার কাগজপত্র খুলে দেখা যায় কোথাও সে ক্যাপটেন মোসলেম, কোথাও রিসালাদার মোসলেম এবং অন্যত্র সুবেদার মোসলেম। সশস্ত্র বাহিনীতে একই সঙ্গে এক ব্যক্তির তিনটি পদবী থাকা অচিন্তনীয়। কাজেই মোসলেম কে এ প্রশ্নই উদ্ঘাটিত হয়নি। মূল আসামির আইডেন্টিফিকেশন ব্যতিরেকে মামলা অচল। দ্বিতীয়ত, তার প্রকৃত নামই বা কী? কখনও দেখা যায় মোসলেম, কখনও মুসলেমউদ্দীন আহমদ বা কখনও মোঃ হিরণ খান। এতগুলো ওরফে নিয়ে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করা যায় না। তৃতীয়ত, এখন সে কোথায়? সেকি পলাতক? কেউ বলে সে মৃত, জিয়াউর রহমানের আমলে তার ফাঁসি হয়েছে। কেউ বলে সে মুর্শিদাবাদে নামাজ পড়াচ্ছে। কেউ বলে দেশের অভ্যন্তরেই ঘাপটি মেরে আছে। অন্যরা তা অস্বীকার করে। প্রকৃতাবস্থায় এই মোসলেম কে, কী তার প্রকৃত নাম এবং তার কী পদ-পদবী বা প্রকৃত হদিসইবা কী আজ পর্যন্ত জানা যায়নি!

সে কারণে তার পক্ষের সরকার নিয়োজিত আইনজীবী দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, এই আসামির কোনই পরিচিতি সুস্পষ্ট নয় বিধায় কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ গঠন করা হবে সেটা বিবেচনায় আসতে পারে না। যেহেতু মূল আসামির বিরুদ্ধেই আইনানুগ অভিযোগ গঠিত হতে পারে না সেক্ষেত্রে সুদূর সন্দেহের কারণে তার সাথে ষড়যন্ত্র করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে এই মামলায় জড়িয়ে চার্জ আনয়ন করলে বিচারের স্থলে অবিচারই হবে।

আমরা তার বক্তব্য প্রণিধান করি। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়েও সে কতকগুলো মূল্যবান ও যৌক্তিক বক্তব্য রেখেছে।

পরবর্ত্তী তারিখেও চার্জের শুনানি সমাপ্ত হতে পারে না। অন্যতম অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মেজর (অবঃ) বজলুল হুদার অসুস্থতার কারণে শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। একসময় এইসব অভিযুক্তের শ্রেণী বরাদ্দ ছিল। কিছুদিন পূর্বে তাদের ডিভিশন কেটে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এইসব আসামিদেরকে কনডেম সেলে রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে কারাভ্যন্তরে কোনই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। অতি নিম্নমানের খাদ্য তারা খেতে পারে না। থাকা-খাওয়ার যা অবস্থা তা তাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। তাদেরকে

www.pathagar.com

নিজেদের অর্থে কোন কিছু ক্রয় করতেও দেওয়া হয় না। মেজর বজলুল হুদার আইনজীবী মাহবুবুর রহমানের বক্তব্যে জানা গেল, দীর্ঘদিন যাবৎ নামমাত্র আহার করে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে করে সে নির্জীব হয়ে পড়েছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার দেহে নেই। কোর্টে আসার জন্য প্রস্তুতির লগ্নে দাঁড়ান অবস্থা থেকে পড়ে যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে তার পক্ষে কোর্টে যাওয়া সম্ভব নয়। অ্যাডভোকেট তার চিকিৎসা ও মনুষ্য উপযোগী খাদ্য প্রদান করার জন্য আদালতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়।

ঢাকা জেলা জাতীয় পার্টির অন্যতম সদস্য অ্যাডভোকেট সরফুদ্দীন আহমেদ মুকুলের সঙ্গে ঢাকা কোর্ট থেকেই আমার হৃদ্যতা। সে এখন তাহের উদ্দীন ঠাকুরের আইনজীবী। সেদিন সে কোর্টে বলে, জেল হত্যা মামলার চার্জগঠনের শুনানির জন্য নথি প্রস্তুত নয়। প্রসিকিউশন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আলামত আদালতে প্রদর্শন করে। সেই আলামতের মধ্যে ৪২, ৪৩, ৪৭ এবং ৪৮ নম্বর আলামত জেল হত্যা মামলায় চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি উচ্চতর আদালতে চলছে। সে সমস্ত আলামত এই আদালতে আনা না হলে চার্জ গঠনের শুনানি হতে পারে না।

আইনজীবী আরও জানায়, ১৯৯৬ সালের ২৬শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে ঢাকার অতিরিক্ত সিএমএম হাবিবুর রহমানের আদালতে হাজির করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার পর তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। আর কোন মামলায় ঠাকুরের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়নি। কিন্তু একই দিনে জেল হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা কী করে সম্ভব? বেলা আড়াইটায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় জবানবন্দি রেকর্ড করার পর বিকাল পাঁচটায় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তা হলে একই দিন তিন ঘণ্টা সময় দিয়ে দ্বিতীয় জবানবন্দি কখন রেকর্ড করা হল? ম্যাজিস্ট্রেটের সেদিনের আদেশ আদালতে পাঠ করে শুনিয়ে সে এই ব্যাপারটি আদালতের বিবেচনার বাইরে রাখার আবেদন জানায়।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তথাকথিত এই স্বীকারোক্তিতেও যথেষ্ট ঘাপলা রয়েছে। বহু অঘটনের নায়ক আইও এখানেও তার দু'নম্বরী পন্থা প্রয়োগ করেছে। এক মামলায় একটি জবানবন্দি সংগ্রহ করে পরে

www.pathagar.com

সেটিকে রূপান্তরিত করে এই মামলায়ও ফিট করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে জবানবন্দির এক স্থানে ছোট হস্তাক্ষরে যে বক্তব্যটি এসেছে, সেটিও উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরে সংযোজিত। জালিয়াতি আর প্রতারণার যে নগ্ন চিত্র এই মামলার নথির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে তার কোন দৃষ্টান্ত কোন সভ্য দেশের বিচার্য বিষয়ে আজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বলে কেউ বলতে পারে না।

বেশ কয়েকটি তারিখ পার হয়েছে। একে-একে সকল অভিযুক্তের কৌশুলীদের বক্তব্য জজ সাহেব শুনলেন। খন্দকার মাহবুব হোসেন আমার পক্ষে তার বক্তব্য রাখে। আরও অনেককিছু বলার থাকলেও তার মতে এই পর্যায়ে ডিফেন্সের কেস প্রকাশের প্রয়োজন নেই বিধায় সে দীর্ঘ বক্তব্য থেকে বিরত থাকে। বাদী কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সে তার বক্তব্য রাখে। সরকারের পক্ষের অভিযোগের অসারত্ব প্রমাণ করে সে নিবেদন করে, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন আমার নেতা। চিরদিন স্পষ্টবাদী হিসাবে সুপরিচিত। সত্যকথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলে এসেছেন। উচিত কথা বলতে তিনি কোনদিন দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনে শেখ সাহেবকেও ছেড়ে কথা বলেননি। আজ তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। শেখ সাহেবের অরাজনৈতিক কন্যার নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেননি বলেই আজ তার বিরুদ্ধে এই শত্রুতামূলক হুয়রানি। অন্য দু'জন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। জেল হত্যা মামলায় কোনদিক থেকেই তাদেরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ নেই। তবুও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করে তাদেরকে ধ্বংস করার মানসে এই জঘন্য অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। যার কোন ভিত্তি নেই। বানোয়াট, মিথ্যা ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হিংস্র প্রয়াস ব্যতীত এটা আর কিছুই নয়। আমি তার এবং তাদের অব্যাহতি প্রার্থনা করি।

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান তার দু'দিন ব্যাপী বক্তব্যের সমাপ্তি টানে। সে মূলত মেজর (অবঃ) বজলুল হুদার আইনজীবী হলেও এই মামলার মূল ধরে সে নাড়া দেয়। তার বক্তব্য ছিল প্রণিধানযোগ্য। সে একটি একটি করে সরকারি পক্ষের প্রতিটি বক্তব্য কেবল খণ্ডনই করে না, ধূলিস্মাৎ করে দেয়। যুক্তির জালে সে এক-এক করে নিবেদন করে, এই মামলার কোন এজাহার নেই। বোধগম্য কারণেই মূল এজাহার গায়েব করা হয়েছে। ফটোকপি দিয়ে

www.pathagar.com

মামলা শুরুর পর সে ফটোকপিও লাপাত্তা। জাজ্জ্বল্যমান জালিয়াতির মাধ্যমে ফটোকপিটি সরিয়ে হাতে গড়া আর একটি মিথ্যা এফআইআর প্রস্তুত করে নথিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা তার মনিবকে খুশি করার মানসে একটা ভিত্তিহীন মিথ্যার কাহিনী গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছে। এজাহারের মতো সাক্ষীদের জবানবন্দিতে অপর্যাপ্ত কারসাজি করা হয়েছে। নিজে না লিখে ভাড়াটে লোক দিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়ে আইনের সুস্পষ্ট বিধান কেবল লঙ্ঘন করেনি, হাইকোর্ট পর্যন্ত সর্বত্র মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও পার পায়নি। সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির মধ্যে চক্রান্ত বিদ্যমান। ঘটনার নয় জন ঘাতকের মধ্যে পরবর্তীতে তৈরী এজাহারে অসৎ উদ্দেশ্যে কেবল একজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত মোটেই সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ হয়নি। সর্ব বিবেচনায় এই হত্যাকাণ্ডের দোসররূপে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের তদানীন্তন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই মামলায় অভিযুক্ত হবে। তা না করে তাদেরকে সাক্ষীরূপে আনয়ন করা হচ্ছে। এটা বিচার নয়, বিচারের নামে প্রহসন।

অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান একের পর এক প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরে তিনটি মূল আবেদন রাখে, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেবার প্রয়াস নস্যাৎ করে এই আসামিদের অব্যাহতি দিয়ে পুনঃতদন্তের মাধ্যমে প্রকৃতি অপরাধীদেরকে বিচারে আনয়ন, জেলকর্তৃপক্ষের তৎকালীন ব্যক্তিবর্গকে মামলায় অভিযুক্তরূপে আনয়ন এবং সর্বোপরি জালিয়াতি ও বিচারাধীন রেকর্ডে যথেচ্ছা কারচুপির অভিযোগে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

আইনজীবীগণ সঠিকভাবেই এই মামলার মূল ধরে নাড়া দেয়। আমরা সকলেই অভিনিবেশ সহকারে তাদের বক্তব্য শুনি। বার বারই মনে হয়, এরপর জজ সাহেব আমাদেরকে চার্জ করবেন কি প্রকারে! তারপরই মনে হয়, যে প্রকারে কর্ত্রীর ইচ্ছায় এ পর্যন্ত গড়িয়েছে সে প্রকারেই আরও অপকর্ম সাধিত হওয়া বিচিত্র নয়!

২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ সাল। আজ চার্জ গঠনের জন্য শেষ শুনানির দিন ছিল। আইনজীবীদের সকলের বক্তব্যের শেষে আমরাও জজ সাহেবের অনুমতি নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য রাখি। আইনে সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

বিধান রয়েছে আইনজীবী এবং অভিযুক্তদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট অভিযোগ বিদ্যমান সেক্ষেত্রে তিনি তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবেন। অন্যথায় তাদের রেহাই দেবেন। কিন্তু চার্জ গঠনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় দৃশ্যত কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বলে জজ সাহেব আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আগ্রহান্বিত নন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে আমরাও বক্তব্য না রেখে পারি না। তিনি অনুমতি প্রদান করেন ও অনুরোধ করেন, আমরা যেন রাজনৈতিক বক্তব্য না রাখি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করি, এই মামলাটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কারণেই আজ এই বয়সে আমাদেরকে বিগত দু'বছরের উপরে বিনা অপরাধে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই আমাদের বক্তব্যে কেবল আইনের কথাই থাকবে এটা আশা করা বিধেয় নয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির কিছু বক্তব্যও চলে আসবে। তবুও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব রেকর্ডের বহির্ভূত বিষয়সমূহের বিশেষ অবতারণা না করতে। ওবায়েদ ও মঞ্জুর বক্তব্যের পর আমি দ্বিতীয়বার দাঁড়াই এবং আবেগ ও যুক্তির আলোকে তিনটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করি।

মামলার অন্যতম সাক্ষী সাফায়াত জামিলের জবানবন্দি উল্লেখ করে নিবেদন করি, তদানীন্তন সেই সামরিক কর্মকর্তার বক্তব্যানুযায়ীই '৭৫ সালের ১লা নভেম্বর থেকে সেনাপতি খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বরের দু'তারিখ প্রত্যুষ থেকে বঙ্গভবনের আধিপত্য কেন্দ্র করে একদিকে ট্যাঙ্ক বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী এবং অন্যদিকে বিমান বাহিনীর সশস্ত্র মহড়া চলতে থাকে। চারদিকে যুদ্ধের ঘনঘটা। খালেদ মোশাররফের দল সকাল থেকেই বঙ্গভবন দখল করে নিয়েছে। দু'দলের মধ্যে একদিকে লড়াইয়ের তুমুল প্রস্তুতি অন্যদিকে সমঝোতার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কোন বেসামরিক ব্যক্তির পক্ষে বঙ্গভবনে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্গভবনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন। তারপরও সরকার পক্ষ এই মামলা সাজাবার প্রয়োজনে ২রা নভেম্বর রাত্রে বঙ্গভবনে একটি ষড়যন্ত্রমূলক সভা আবিষ্কার করে। সেই সভায় নাকি আমরা উপস্থিত ছিলাম। দেখেছে কে? টি-বয় বা খেদমতগার শ্রেণীর কেউ কেউ। এত

www.pathagar.com

বড় ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ ধরনের মামলার সূত্রপাত হতে পারে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু পারে। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কীর্তনে পারদর্শী পুলিশের উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার পক্ষে সবই সম্ভব।

জজ সাহেবের নিকট নিবেদন করি, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীরা যে সে লোক নয়! টি-বয় বা খেদমতগার এবং মিলিটারী সেক্রেটারীর পিএর সহকারি। কথায় বলে, আমি কি কম ক্ষমতাবান! দারোগার নায়ের যে মাঝি, তার যে বাঁধে কাছি, তার বাড়ির কাছে আছি। আমিও সরকারি লোক বৈকি!

সাক্ষীদের বৈশিষ্ট্য প্রায় এ ধরনেরই। এইসব তথাকথিত সাক্ষীদের মিথ্যা বানোয়াট একটি অবাস্তব ও অপ্রতুল বক্তব্য ধরে আমাদের মতো ব্যক্তিদের হয়রানি করা শুধু আইনের অপপ্রয়োগই নয়, অমানবিকও বটে।

দ্বিতীয়ত, এই চার জন নেতাকে কারাভ্যন্তরে হত্যার করার ষড়যন্ত্র জড়িত থাকায় আমাদের উদ্দেশ্য বা মোটিভ কি হতে পারে! তারা পরলোকে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পদটি আমাদের কারো উপরে বর্তাবে না। এই চার জনের একজনও বেঁচে থাকলে হাসিনা আজ সরকার প্রধান হন না। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী জীবিত থাকলে তার ছেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারে না। কাজেই বেনিফিসিয়ারী আমরা নই বরং আজকের সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই প্রত্যক্ষভাবে বেনিফিসিয়ারী। এর কার্যকারণ অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। ১৫ই অগাস্টের পট-পরিবর্তনের পর আমার পদাবনতি ঘটেছিল। ছিলাম চীফ হুইপ, ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের পর্যায়ে ছিল আমার প্রটোকল। করা হল একজন প্রতিমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়ে আছে তাঁর বাসভবনের সিঁড়িতে। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তখন কোন প্রতিবাদ করবে! বিজ্ঞ আদালতে আরও নিবেদন করি, এই মামলায় আমাদেরকে ডিসচার্জ করার সাথে সাথে পুনঃতদন্তের মাধ্যমে জেলখানার যেসব কর্তৃপক্ষ এই হত্যাকাণ্ডের সহযোগিতা করেছে, সেই সব সংশ্লিষ্ট তথাকথিত সাক্ষীকে অবশ্যই আসামির কাঠগড়ায় আনয়ন করতে হবে এবং এই মামলায় যথেচ্ছা জাল-জুয়াচুরি, প্রতারণা ও বিধি বহির্ভূত কাজ করার অপরাধে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে বিচারে সোপর্দ্দ করার জন্যও আমি জোর আবেদন জানাই। জজ সাহেব এক পর্যায়ে কারা কর্মকর্তাদের আসামির কাঠগড়ার আনয়নের আবেদনের প্রেক্ষিতে হঠাৎ করেই বলে ওঠেন, ওরা আসবে বৈকি।

www.pathagar.com

ওটা কি সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া না তার সুচিন্তিত অভিমত বুঝতে পারি না। কথাটা অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলেছিলেন, অনেকেই শুনতে পায়নি। আমি অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে আনন্দিত হয়ে উঠি। দেখা যাক তার কথা ও কাজের মধ্যে কতটা মিল পাওয়া যায়।

আমরা যে এই চার নেতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলাম সে কথা তুলে ধরে আরও বলি, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আমরা সর্বদা বিচার চেয়ে এসেছি। এমন সভা-সমাবেশ কম ছিল যেখানে আমরা এ প্রশ্নে মুখর ছিলাম না।

আমাদের গ্রেপ্তার করে রিমাণ্ডে নেওয়ার পর আমাদের পদত্যাগের কথা অনুধাবন করে তদন্তকারী কর্মকর্তা কয়েকজন সরকার দলীয় সাক্ষীর মুখে তার বিপরীত কথা তুলে দেয়। '৯৬ সালে তাহের ঠাকুরের তথাকথিত একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির বলে এই মামলার সূত্রপাত। তদন্তকারী কর্তৃক সেখানে পরে কারসাজির মাধ্যমে আমাদের তিন জনের নাম সন্নিবেশিত হয়। যদি অপরাধীই হতাম, তা হলে তারপরও দীর্ঘ দু'বছরে আমাদের কেন গ্রেপ্তার করা হয় না! তদন্তকারী চার বার কোর্টে মেমো অব এভিডেন্স দাখিল করেছে। একবারও সেখানে আমাদেরকে আসামি হিসাবে দেখানো হয়নি! কেন? কেন?

বঙ্গবন্ধুর মামলা চালু হলে ঠাকুরের গ্রেপ্তারের পর এক শ্রেণীর খবরের কাগজে কাঠের টাইপের বোল্ড হেডিং-এ সংবাদ পরিবেশিত হয়, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও ওবায়দুর রহমানের নামে গ্রেপ্তারী পারোয়ানা জারি হয়েছে।

আমি তখন দলীয় কার্যোপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলাম। আত্মীয়স্বজনের সকল উপরোধ-অনুরোধ-নিষেধ উপেক্ষা করে আমি ঢাকা ফিরে এসে সেই তদন্তের মুখোমুখি হই আজকের তদন্তকারী অফিসার এই কাহার আখন্দের বরাবর। সেদিন কোনভাবেই আমাদেরকে জড়াতে সমর্থ না হয়ে অনেক বিলম্বে সরকারের ঊর্ধ্বতম মহলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই মামলায় জড়ানো হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আমাদের গ্রেপ্তারের পর যেসব বক্তব্য দেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই আমাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ করেন, এরা আওয়ামী লীগ করে না, কাজেই এরা ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। এ ধরনের মেঠো যুক্তি কি করে সরকার প্রধানের মুখ থেকে

www.pathagar.com

নিঃসৃত হতে পারে আমাদের বোধগম্য হয় না। তার বক্তব্য বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করারই নামান্তর। আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে যখন এসব বক্তব্য দিচ্ছিলাম তখন কোর্টে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। বক্তব্য শুরু হতেই চারদিক থেকে অসংখ্য পুলিশ, মহিলা পুলিশ, সাদা পোশাকের পুলিশ, অন্যান্য কর্তব্যরত কর্মচারীবৃন্দ, উভয় পক্ষের আইনজীবীগণ গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করছিল। অতি উৎসাহী সরকারি কৌশুলীগণ বিবাদীপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্যের সময় টিকা-টিপ্পনী কেটে বাধা প্রদানের চেষ্টা করলেও আমার বক্তব্যের সময় একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। সম্ভবত প্রতিটি কথাই সকলের মনের গভীরে দাগ কাটে। জজ সাহেব কেবলই সংক্ষিপ্ত করার তাগিদ দিলে মনের অনেক অকথিত বক্তব্য অপ্রকাশিত রেখেই আসন গ্রহণ করতে হয়। আমাদের ধারণা হয়, এসব শোনার পর বিজ্ঞ আদালত আমাদেরকে এই ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ থেকে রেহাই না দিয়ে পারবেন না।

উপসংহারে একটি নিবেদন রাখি। বলি, অত্র মামলার এক শত ভাগের মধ্যে আমাদের তিন জনের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে যদি এক ভাগ অভিযোগও দেওয়া যায় তা হলে আমাদের চার্জ করুন। আর যদি শতকরা এক শত ভাগই আমরা নির্দোষ হই তা হলে আমাদেরকে এই জঘন্য অপবাদ থেকে রেহাই দিন।

সরকার পক্ষ থেকে আমাদের একটি কথারও জবাব ওরা দিতে পারে না। দেখা যাক, আদালত কি করেন!

১২ই অক্টোবর, ২০০০ সাল। আজ চার্জ গঠন হয়ে গেল। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতার অদৃশ্য সূতার টানে কিনা জানি না, জজ সাহেব অন্যান্য সকল আসামির সঙ্গে আমাদেরকেও হত্যার সহযোগিতা ও ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে চার্জ করেন। আমাদের সকল অকাট্য যুক্তি, মামলার এফআইআরের লাপাত্তা হয়ে যাওয়া এবং জুয়াচুরির মাধ্যমে অনেক পরে হাতে তৈরি একটি জাল এফআইআরের ফটোকপি বানিয়ে মামলা সাজান, তদন্তকালে শত কারচুপি, অনিয়ম ও বিধিবহির্ভূত কার্যসম্পাদন, আইও কর্তৃক যথেচ্ছা প্রতারণা, জাল ও জালিয়াতীর আশ্রয় গ্রহণ, আইনের সুস্পষ্ট বিধি লঙ্ঘণ, জেল হত্যার সহযোগী তদানীন্তন কারা কর্মকর্তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাক্ষীর তালিকাভুক্তিকরণ, সাক্ষীদের জবানবন্দি

www.pathagar.com

এবং স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তদন্তকারীর বেআইনি হস্তক্ষেপসহ অজস্র বিষয় জজ সাহেবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পরও তিনি চোখ বুজে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। বুঝি, সুতার টানে ঘুড়ি ওঠা-নামা করে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেবল কাঁদেই না, আজ তা আর্তনাদ করে অভিশাপ জানায়।

আইনজীবীগণ হতবাক। তারা উচ্চতর আদালতে যাওয়ার সঙ্কল্প ব্যক্ত করে। কিন্তু কোন আশার আলো দেখছি না। একই মামলায় বার বার হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টের দরজা খটখটিয়েও জামিনের প্রার্থনা বিবেচিত হয়নি। পূর্বের সেসব জুজুর ভয় ছিল, সেসব এখনও একইভাবে বিদ্যমান। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, একটার পরিবর্তে দশটা লাশ ফেলে দাও। ফলশ্রুতিতে সারা দেশে খুন-খারাবী বেহিসাবে বেড়ে গেছে। প্রতিদিন হত্যা আর হত্যা। আদালত প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য দিব্যলোকে শত শত লোকের উপস্থিতিতে আইনজীবীকে হত্যা করা হয়েছে। কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। ছাপোষা মেট্রোপলিটান সেশন জজ ক্ষমতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিতার নেপথ্য ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে সাহস না পেলে কতটা দোষারোপ করা যায় জানি না।

নির্দোষ, নিরপরাধ আমরা এ মামলায় কারাগারে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছি। জানি না পালন কর্তার কি ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হোক। মানুষের কতটুকুইবা করার আছে।

আজ কোর্ট থেকে বড়ই বিমর্ষ চিত্তে কারাগারে প্রত্যাবর্তন করি। অন্যান্য দিন সালেহা আমাকে কত সাহস দেয়, উৎসাহ যোগায়। আজ জজ সাহেবের আদেশ শোনার পর সে নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমাদেরকে গাড়িতে উঠিয়ে পুনঃ কারাভ্যন্তরে প্রেরণ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। বেচারার চোখে অবিলম্বে আস্রোপচারের প্রয়োজন। এই তারিখের দিকে সে তাকিয়ে ছিল। নিরাশার আকুল আঁধারের মাঝেও সে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করছিল। আজ সব ধৈর্য নিঃশেষ।

চারদিকে পুলিশের ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কেবলই কাঁদতে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে নিষ্ফল বেদনায় আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে

www.pathagar.com

ওঠে। প্রবোধ দেওয়ার কোন ভাষা খুঁজে পাই না। আনোয়ারকে বলে আসি, তোর ভাবীকে সান্ত্বনা দে। আল্লাহ্ সবই দেখছেন।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

হাইকোর্ট সেশন জজের বরাবরে অনেকগুলো নির্দেশ দিয়েছিল। আইওর সম্বন্ধে উত্থাপিত অভিযোসমূহের সুরাহার আদেশ দিয়েছিল। জবানবন্দিতে অপর্যাপ্ত কারচুপির উপরে তদানুষ্ঠানের পরামর্শ দিয়েছিল। জজ সাহেব সেসব আদেশ-নির্দেশ সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করেননি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জেল হত্যার সত্যিকারের অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচারে সোপর্দ করার কোন আন্তরিকতা সরকারের নেই। তাদের অভিপ্রায় একটিই, যেন-তেন প্রকারে আমাদের প্রতি তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করনার্থে আর কালক্ষেপণ না করে ক্ষমতায় থাকতে থাকতেই ঝুলিয়ে দেওয়া যায় কিনা। জেল হত্যার বিচার আমরা সব সময় চেয়ে এসেছি। এখনও চাই। একটি নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অনুষ্ঠিত হলে প্রকৃত আসামিরা যেমন বিচারে সোপর্দ হত, তেমনি করে নিরপরাধ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার যে হীন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তাও দিবালোকের মতো ভাস্বর হয়ে উঠত। সর্ব বিচারেই মামলাটি সেন্ট ডাউন হয়ে পুনঃতদন্তানুষ্ঠান হবার যোগ্য বিষয় হলেও অদৃশ্যের কারসাজিতে উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপাবার সকল প্রয়াস অব্যাহত রইল।

২০০০ সাল গত হয়ে নতুন বছরের আগমন ঘটেছে। '৯৮ সালে ওরা গ্রেপ্তার করে এনেছে, এটা ২০০১ এক সাল। ২৪শে জানুয়ারি ছিল চার্জগঠনের পরে সাক্ষ্যগ্রহণের ধার্য দিন। মাঝে একটি তারিখ গিয়েছে সরকার পক্ষ বাদীকে কোর্টে আনতে সক্ষম হয়নি। আজ দেখা যাচ্ছে এজাহার দায়েরকারী বাদী ঢাকা জেলার তদানীন্তন ডিআইজি কে.এ.আউয়াল কোর্টে উপস্থিত। বয়স হয়েছে, মাঝে নানা কথা শোনা গিয়েছিল। আজ সব ভ্রান্তির অপনোদন হল। পাকা দাঁড়ি নিয়ে বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত আউয়াল সাহেব সন্দীপ থেকে এসে উপস্থিত। সরকার পক্ষে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নেই। কিন্তু একজন অভিযুক্তের অসুস্থাবস্থায় জেল হাসপাতাল শয্যাগত বিধায় তাকে কোর্টে আনা সম্ভব না হওয়ায় মামলা আবার ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখে পিছিয়ে যায়।

www.pathagar.com

চার্জের বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষের দরখাস্ত এখনও হাইকোর্টে বিবেচনাধীন। বিচারাঙ্গনের যে অবস্থা, সেখানে কি হবে বোধগম্য হচ্ছে না। মনে হয় মামলা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরও তিনটি তারিখ পরে। ৪ঠা, ১২ই এবং ২০ শে। কিন্তু নানাবিধ জটিলতায় মামলা শুরু হয় না।

১২ই এপ্রিল, ২০০১ সাল। শেষ পর্যন্ত আজ এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বাদী আবদুল আউয়ালের জবানবন্দি গ্রহণের মাধ্যমে। আমাদের নিকট আজও শুনানি শুরু করা আইনানুগভাবে বিবেচনাপ্রসূত মনে হল না। ৯, ১০, ও ১১ই এপ্রিল তিন দিন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ৯ই এপ্রিল মামলার দিন ধার্য ছিল। হরতালের মধ্যে জজ সাহেব ঢাকা জজকোর্ট ভবনে তার খাস কামরায় বসে হরতালের পরদিনই পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেন।

এই মামলা সম্বন্ধীয় যে কোন আদেশ এই কোর্টের এজলাসে বসে দেওয়াটাই সমাচীন। সে নিয়ম লঙ্ঘন করে হরতাল শেষ হবার পরদিনই তারিখ নির্ধারিত করার মধ্যে সরকারি অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় মিলে। সরকার পক্ষ তাদের প্রভাব খাটিয়ে এটা করেছে বলে আমাদের ধারণা হয়। ফলশ্রুতিতে আমাদের অনেকের আইনজীবীগণ আদালতে উপস্থিত হতে পারে না। অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ মুন্সী বরিশালে থাকে। তার পক্ষে কোর্টে উপস্থিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা জজ সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরলাম। নিবেদন করলাম, আমাদের অ্যাডভোকেটদের অনুপস্থিতিতে শুনানি গৃহীত হলে অভিযুক্ত হিসাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব। আমাদের আইনজীবীগণ সাক্ষীর আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করতে না পারলে জেরার সময় অসুবিধা ভোগ করবে। আমরা মুলতবীর আবেদন জানালাম। জজ সাহেব আমাদের সব বক্তব্য মন দিয়ে শ্রবণ করলেও কোথাও একটা বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে হল। আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হল। বাদী তদানীন্তন ডিআইজি (প্রিজনস) কাজী আবদুল আউয়াল তার জবানবন্দি দেওয়া শুরু করে। ৮৪ বছরের বৃদ্ধের কথা আমরা শুনতে বা বুঝতে পারছিলাম না। অত্যাগ্রহী পিপিরা তাকে প্রম্পট করে, লিড করে সাক্ষী দেওয়াচ্ছে। আমরা পুনঃপুন আপত্তি জানাবার পরও তা অগ্রাহ্য হয়। ভাব দেখে মনে হয়, বিচার-আচার ছাড়াই ওরা আমাদেরকে ঝুলিয়ে দিতে পারলে অধিকতর খুশি হয়।

www.pathagar.com

২০শে এপ্রিল পরবর্তী দিন ধার্য হয়। সেদিন বাদীর অবশিষ্ট জবানবন্দি গৃহীত হবে এবং তার জেরা শুরু হবে।

সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী বাদী, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের তদানীন্তন ডিআইজি কাজী আবদুল আউয়াল জেরায় স্বীকার করে হত্যাকারীরা তার অনুরোধ ভিজির্টার্স বইতে নাম লেখায়। তার একথায় প্রথমত প্রমান হয় তার সাথে হত্যাকারীদের সুসম্পর্ক ছিল কেননা তার অনুরোধ তারা রক্ষা করে। দ্বিতীয়ত: একথাও প্রমান হয় যে সকলের নাম ধাম জানা থাকা সত্ত্বেও সে পরদিন এজাহারে কোন আসামীর নাম উল্লেখ করে না। সে স্বীকার করে, এজাহার করার সময় সে ভিজিটার্স বই যাচাই করে নাই। সে আরও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে টেলিফোনের বার্তা পালনে জেল কোড ক্ষমতা দেয় না। এবং জেল কোড বহির্ভূত কোন কাজ করতে কারা কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়। জেল কোড বহির্ভূত কোন কান্ড সংঘটিত হলে তা হবে বে-আইনী। সে জানায় জেল কোডে মৌখিক ভাবে আদেশ দানের কোন বিধান নাই। বাদী আউয়াল জেরায় স্বীকার করে তারা জেলগেট খুলে না দিলে হত্যাকান্ড সংঘটিত হত না।

সে জানায় হত্যাকারীরা তাকে বলে জেলের ঐ লোকদের গুলী করিয়া হতা করিবার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হত্যাকারীর দল বেয়নেট দ্বারা খোচাইয়া খোচাইয়া দুই জনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। বাদী আরও বলে, মোসলেম বঙ্গভবনের লোক বলিয় তার কাছে পরিচয় দেয় নাই। সে হত্যাকারীদের পরিচয় Ascertain করে নাই এবং সেনা সদরে অনুসন্ধান করে তাদের identification ও নেয় নাই।

মনের মাঝে বিড় বিড় করে পড়ছি পবিত্র কোরানের সেই অমোঘ বাণী, ওয়া আল্লাহুল মোস্তাআনু আলা মা তাছিফুন—তোমরা যে যা-ই বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

পরপর কয়েকদিন ধরে বাদীকে আইনজীবীগণ জেরা করে। সে জানায় জেলখানার প্রশাসনিক ব্যাপার তার কোনই কর্তৃত্ব নেই, তার কেবল আর্থিক দিকের আংশিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সে অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিল না বলে দাবি করে। তবুও মামলার বাদী সে-ই হয়। জেরায় অনেক অসংলগ্নতা ও তদন্তকারী কর্মকর্তার অনেক অপকর্ম ও জালিয়াতি বের হয়ে আসে।

www.pathagar.com

সরকার পক্ষের পরবর্তী সাক্ষী আসে তদানীন্তন জেলার আমিনুর রহমান। সে স্বীকার করে, জেলর হিসাবে সে ছিল প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং জেল প্রশাসনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তার জেরায় বের হয়ে আসে দুষ্কৃতিকারীরা জেল অভ্যন্তরে ঢুকে কতিপয় আসামি ছিনিয়ে নিতে পারে বলে বঙ্গভবন থেকে পূর্বাহ্নে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলেও তারা সশস্ত্র হত্যাকারীদের সাদরে গেট খুলে দিয়ে রাতের অন্ধকারে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় এবং সে, ডিআইজি ও আইজি মিলে ঘাতকদের অকুস্থলে নিয়ে যায়। আইজির নির্দেশে চার নেতাকে একঘরে একত্র করে দেয়। ঘাতকরা প্রথমবার গুলি করে তাদের সম্মুখেই নেতাদের হত্যা করে। পরে আর একদল ঘাতক এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত করে। দু'বারই তারা সাথে ছিল। ঘাতকদেরকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। পথ দেখিয়ে এনেছে এবং হত্যাকাণ্ডের পরে তাদেরকে বিনা বাধায় জেল থেকে বের হয়ে যেতে দিয়েছে। এলার্ম দিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছিল। শত শত নিয়মিত কারারক্ষীরা ব্যতীত গেটেই তাদের সশস্ত্র প্রহরা ছিল। বিডিআর মোতায়েন করা ছিল এবং ছিল রিজার্ভ পুলিশ। তদুপরি জেল সংলগ্নই লালবাগ থানা অবস্থিত। সবকিছু হাতের সামনে প্রস্তুত থাকলেও জেলের দুটি বড় ফটক খুলে আরও বহু গেট এবং তালা খুলে ঘাতকদের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সরে পড়তে সুযোগ করে দেয়। জেলের প্রত্যেকেই ঘাতকদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। তবুও তারা এই হত্যা মামলায় আসামি নয়। তারা সাক্ষী!

জেলর অবলিলায় বলে হত্যাকারীদের সকলকে রিসিভ করিয়া সকলের দস্তখত গেট রেজিষ্টারে নিয়া তাহাদেরকে ডিআইজির অফিসে নিয়া যায়। সে আরও বলে অকুস্থলে যাইয়া আইজি চার নেতাকে একঘরে একত্র করর নির্দ্দেশ দেয় এবং সে তা পালন করে। একত্র করার পরই ওরা গুলি করে হত্যা করে।

জেলর এবং অন্য জেল কর্মকর্তারা জানায়, পূর্ব থেকেই জেলে পাগলা ঘণ্টা বাজিতে ছিল। জেরায় জেলর স্বীকার করে, পাগলা ঘণ্টা চলাকালীন জেলের ২০০ গজের মধ্যে প্রহরীদের গুলী করিবার বিধান জেল কোডে আছে।

জেলর স্বীকার করে, ঘটনার পর সে অকুস্থলে গিয়া দেখে নাই কে মারা গেছে বা কে জীবিত আছে। সে বলে, সেদিন বিকেলে একজন

www.pathagar.com

সামরিক কর্মকর্ত্তা সে সময় বন্দী এবং এই মামলায় সাক্ষী সাবেক এস, পি মাহবুব উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায় এসেছিল।

জেলর আরও একটি মারাত্মক তথ্য প্রদান করে। সে বলে, '৭৫এর ২রা নভেম্বর রাত্রে সেনা বাহিনীর উচ্চাভিলাশী কর্মকর্তাগণ ও সেনাসদর হইতে হত্যা কারীদের সহায়তা দানের জন্য ডিআইজিকে নির্দ্দেশ দেয়া হয়।

তার এই বক্তব্যে বঙ্গভবনের সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ব্বতন বক্তব্য অসার বলিয়া প্রতিপ্রন্ন হয়।

তোতা পাখীর মতো জেলর বার বার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বলতে থাকে এরা বহিরাগত নয়। এরা বঙ্গভবন থেকে মোশতাক সাহেবের নির্দেশে এসেছে–তাই আমরা সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছি।

জেল কোড দেখিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়, দিন-রাত্রির কোন সময়ই সশস্ত্র ব্যক্তিদের জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার পর এবং রাত্রিতে কারা রক্ষীরা ব্যতীত কেউ ভিতরে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও ঘাতকদের সশস্ত্রাবস্থায় ঢুকতে দিয়ে তারাই নেতাদের হত্যার সহযোগিতা করেছে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব তারা অস্বীকার করতে পারে না। কোন বেআইনী নির্দেশ যদি কেউ প্রদানও করে তা তারা মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু গোপালগঞ্জ নিবাসী এবং আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রমোশনপ্রাপ্ত এই অফিসার কেবলই বলে, ভয়ে এবং বঙ্গভবনের থেকে আসার কারণে তারা সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছে। জেরায় সে স্বীকার করে জেল কোডে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে কোন উল্লেখই নেই। জনাব মাহবুবুর রহমান, মজিদ মুন্সী, আলি আকবর, নজরুল ইসলাম, শরফুদ্দীন আহমেদ মুকুল, মোহাম্মদ হানিফ এবং সৈয়দ মিজানুর রহমান প্রমুখ আইনজীব-গণ ভালো জেরা করে। খন্দকার মাহবুব হোসেন এক পর্যায়ে এসে এদের জেরা এডাপ্ট করে যায়। তৎকালীন জেলরের বার বার 'বঙ্গভবন থেকে ওরা এসেছে' এই উক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম সাহেব জিজ্ঞেস করে, আপনি কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

সে দৃশ্যত বিপন্ন বোধ করে এবং ভেবে ভেবে জবাব দেয়, আমি আইজি সাহেবের কাছে শুনেছি, সে টেলিফোনে সংবাদ পায়।

ঘটনার সময় যে দেশে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আর এক সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল এবং জিয়াউর রহমান ও মোশতাক

www.pathagar.com

সাহেবকে গৃহবন্দি করে খালেদ মোশাররফ ও সাফায়াত জামিলগং ক্ষমতা দখল করে এবং তাদের সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ছদ্ম পরিচয়ে লোক পাঠিয়ে জেলখানার বন্দি জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে এবং সেই হত্যাকাণ্ডে জেলের কর্মকর্তাগণ পূর্ন সহযোগিতা করে এই সাজেশান সাক্ষী গ্রহণ করে না। তাদের সহযোগিতার কথা স্বীকার করে এবং খালেদ মোশাররফের ক্ষমতা দখলের কথা সে বলতে পারে না বলে জানায়।

এই দু'সাক্ষীর জবানবন্দিতে তারা আইজিকে যেমন জড়াবার প্রয়াস পায় তেমনি করে নিজেদের কর্তব্যের অবহেলা এবং বেআইনী কাজে সহযোগিতা প্রদান করে এরূপ একটি জঘন্য অপকর্ম সম্পন্ন করার দায়দায়িত্ব এড়াতে পারে না। নিজেদের অপকর্ম অন্যের ঘাড়ে চাপাবার অপচেষ্টায় এই মামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আসামির কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে তারা আজ সাক্ষী! ঘাতকদের সহযোগীরা অভিযুক্ত নয়! আজ অভিযুক্ত কিছু নিরীহ, নিরপরাধ ব্যক্তিগণ! রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দাবানলে তারা আজ জ্বলছে। বিচারের প্রহসন আর কাকে বলে।

বেশ কয়েকদিন ধরে আইজি নুরুজ্জামান সাহেবের সাক্ষ্যও গৃহীত হল। এই নুরুজ্জামান সাহেবকে আমি ছাত্রজীবনে ঢাকায় জেলর হিসাবে পেয়েছি। পরবর্তী সময়ে তার প্রমোশন হয়েছে, আমার সঙ্গে বার বার জেলখানায় দেখাও হয়েছে। সুপার এবং ডিআইজি হিসাবেও তাকে পেয়েছি। তার সাথে সর্বদাই আমার সুসম্পর্ক ছিল। আমি যখন চীফ হুইপ তখন সে প্রায়ই আমার অফিসে আসত। তার ছোট ভাই নুরুল হককে আমরা সংসদ সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়েছিলাম। নুরুল হক অবশ্য অল্প দিন পরই দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হয়।

নুরুজ্জামান সাহেব আমার কাছে যেত তাকে আইজির প্রমোশনের তদবিরের জন্য। আমি যেন শেখ সাহেবকে অনুরোধ করি। করেছিলামও। সে আইজিও হয়েছিল। এবং এরপরও প্রয়োজন পড়লেই সে আমার স্মরণাপন্ন হত এবং আমিও সাধ্যানুযায়ী তাকে সহযোগিতা দিতাম।

আজ সে সব তার মনে পরে কিনা জানি না। আমি বিস্ময় ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করি। বয়স হয়েছে, দাড়ি রেখেছে, লাঠি হাতে নিয়ে চলে। সযত্নে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে শেখানো বক্তব্য বলে যায় বলে আমার মনে হয়।

www.pathagar.com

ডিআইজি এবং জেলর তাদের জবানবন্দিতে যেভাবে তার উপর দায়িত্ব চাপনোর চেষ্টা করেছে, সে কারণেই হয়ত সে সবকিছুর জন্য সরকারের শেখানো মতে বার বার বঙ্গভবন ও খন্দকার মোশতাকের উপর দায়-দায়িত্ব প্রদানের চেষ্টা করে। তাকে নাকি বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছে, ঘাতকদের প্রেরণ করে নেতাদের হত্যা করা হয়েছে। বেআইনী নির্দেশ, সত্য হলেও, পালনীয় নয় এবং প্রতিরোধের সকল সুযোগ এবং ব্যবস্থা থাকা সত্বেও তারা যে ঘাতকদের সাথে সহযোগিতা করে অপকর্ম ঘটিয়েছে, এই দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। বিষয়টা প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু তাকে একটু বেশি উৎসাহী সাক্ষ্য বলে মনে হয়। তার ভাই আওয়ামী লীগের এমপি ছিল। সে আমলেই তার সর্বোচ্চ প্রমোশন ঘটে। আওয়ামী লীগের মন-মানসিকতার একটা ছাপ তার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সত্য কথা না বলে, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কেবল বঙ্গভবন ও মোশতাক আহমেদের দোহাই দিয়ে নিজের দায়-দায়িত্ব এড়াতে চায়।

আমাদের মতে এই মামলার প্রধানতম মদদ দাতা হিসাবে যার অভিযুক্ত হওয়ার কথা সেই আইজি নুরুজ্জামান বাদী পক্ষের ৩ নং সাক্ষী হিসাবে কোর্টে দাড়িয়ে অনেক কথা বলে। তাকে বিস্তারিত জেরা করা হয় এবং সে নানাবিধ উত্তর দেয় যার সার কথা এই দাড়ায় যে সে এবং তাহারা সকলেই বঙ্গভবন হইতে তথাকথিত টেলিফোনিক বার্ত্তা পেয়ে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হতে দেয়। তার দুর্বলতার কথা অস্বীকার করতে পারে না। জেল থেকে আসামী ছিনাইয়া নেয়া হবে বলে বঙ্গভবন থেকে তাকে সতর্ক করে দেয়া হলেও সে কোন ব্যাবস্থা গ্রহন করে না। সে লালবাগ থানা, স্বরাষ্ট্র সচিব বা স্বরাষ্ট মন্ত্রীকে কিছু জানায় না। পুলিশ হেড্ কোয়ার্টার, কন্ট্রোল রুম, এসপি, ডিএম, বা বিডিআর কাউকে কিছু জানায় না। কাউকে সে কোন ম্যাসেজ দেয় না এবং কাহারো কোন সাহায্য কামনা করে না। সবই সে জেরায় স্বীকার করে।

এমন কি হত্যা সংঘটিত হওয়ার পর একটি বারও অকুস্থলে যায় নাই এবং একজন ডাক্তারও প্রেরণ করে নাই বলে জেরায় স্বীকার করে।

সবচাইতে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার এই ধরনের সীমাহীন ব্যর্থতা, চরম ঔদাসিন্য, কর্তব্যে অবহেলা এবং হত্যাকারীদেরকে প্রত্যক্ষ সহায়তাদান কোন সভ্য দেশেই বিচারের সম্মুখীন না হয়ে পার পেতে পারে না।

কিন্তু এদেশে সবই সম্ভব। বিশেষ করে যারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে বিশেষভাবে শায়েস্তা করার মানসে বিশেষভাবে মামলা সাজায় তাদের হাতে সবই সম্ভব।

দুই দল সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পরিক্রমায় জেলের অভ্যন্তরে এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যা অনুষ্ঠিত হয়, এই সম্ভাব্য সাজেশান সে গ্রহণে সম্মত হয় না। নুরুজ্জামান একজন ঘড়েল সাক্ষী। এই বয়সে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় তার পক্ষে সত্য স্বীকার করা কষ্টসাধ্য বৈকি! কিন্তু আগ বাড়িয়ে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে সত্যের সঙ্গে অধিকতর মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দায়িত্ব এড়ানর প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে ওঠে। আওয়ামী দুঃশাসনের যুগে এই বৃদ্ধের পক্ষে অন্য কথা বলাও হয়ত সহজ নয়। কিন্তু সময় তো শেষ হয়ে এল। একদিন পাড়ি জমাতে হবে। সত্য-মিথ্যার চুল চেরা বিচার একদিন অনুষ্ঠিত হবে। আজকে পার পেয়ে গেলেও, সেই মহা বিচারে কি করে পার পাবেন নুরুজ্জামান সাহেব জানি না!

মাঝে আর একটি তারিখ পড়েছিল সাক্ষী গ্রহণের জন্য। সেদিন হরতাল থাকার কারণে পরবর্তী তারিখ পড়ে ২৩শে জুলাই, ২০০১ সাল।

এর মধ্যে আরও দুটি তারিখ পড়ে এবং আরও দু'জন কারা কর্মচারী তাদের গতানুগতিক মুখস্ত বুলি আউড়ে যায়। জেল কর্মচারী বাদী পক্ষের ৪নং সাক্ষী মহবত আলী দ্বিধাহীনভাবে জানায়, আইজি, ডিআইজি, জেলর বাহিরের দুস্কৃতিকারীদের জেলে প্রবেশের অনুমতি না দিলে আমরা তাদেরকে ঢুকিতে দিতাম না। প্রায় একই কথা সাবেক ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুনঃপুন বিবৃত করছে। নিজেদের দোষ স্খালনের সর্বময় প্রচেষ্টা তাতে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পরবর্তী তারিখ পড়েছে ৮ই অক্টোবর ২০০১ সাল। দেশের সাধারণ নির্বাচনের পর। ওবায়েদ নির্বাচন করছে। ওর অবস্থা ভালো। মঞ্জুও করছে দায়ে পরে। হাইকোর্টে জামিন পেতে যদি সুবিধা হয় এই কারণে আমার পক্ষেও মনোনয়ণপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বেলটে নাম উঠবে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে নির্বাচন করছি না। দু'মহিলার এক দশকের রাজত্বে ৯ বছরই আমি দেশে যেতে পারিনি। বিএনপির আমলে পাঁচ বছর বিক্রমপুর আমার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। পর পর দশ বার প্রাণে মেরে

www.pathagar.com

ফেলার জন্য আক্রমণ করেছিল ওরা। আর এবার আওয়ামী শাসনে বিগত চার বছর সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও মিথ্যা অভিযোগে কারা যন্ত্রণা ভোগ করছি।

নির্বাচন করব কি প্রকারে! মাঝখান থেকে জামিনও হল না। হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্টে কি এখনও আওয়ামী প্রেতাত্মা ভর করে আছে! পুনরায় তারিখ ধার্য হল ২৪ শে অক্টোবর।

ইতিমধ্যে দেশের সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। আওয়ামী দুবৃত্তরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট দুই তৃতীয়াংশের উর্ধ্বে আসন লাভ করেছে। ওবায়েদ পুনর্নির্বাচিত হয়ে পিজিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সরকারে ওর একটি স্থানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ধার্য দিনে সে কোর্টে আসেনি। বিএনপি এই মামলার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আমাদের মুক্তি দাবি করে আসছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সাজানো অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

এখন তারা সরকারে এসেছে। সকলের সঙ্গে আমরাও প্রচণ্ড আশাবাদী। দেখা যাক, আল্লাহ্ তা'আলা কি করেন!

নতুন সরকার কায়েম হয়েছে ১০ই অক্টোবর ২০০১ সাল। তারপর দু'সপ্তাহ কেটেছে। আজ ২৪শে অক্টোবর মামলায় দু'জন সাক্ষীর জবানবন্দি হল। আমাদের জামিনের বিষয় এখনও অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে মঞ্জুও পিজিতে চলে গেছে নুতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধরে। বিষণ্ন মন নিয়ে কোর্ট থেকে ঘুরে এলাম। সালেহা, আনোয়ার ওরা সকলেই আশাবাদী। সুপ্রীমকোর্টের ফুল বেঞ্চে ওবায়েদের জামিনের শুনানি শীঘ্র হবার সম্ভাবনা। পরিবর্তীত অনুকূল পরিস্থিতিতে ওর জামিনের সম্ভাবনা প্রবল এবং পরপরই আমাদের বিষয় বিবেচনার কথা। দেখা যাক কি হয়।

১২ই নভেম্বর, ২০০১ সাল। এক মাসের ওপর হয়ে গেল বিএনপি সরকার গঠন করেছে। আজও আমাদের বিষয়ে কোনই সিদ্ধান্ত হল না। ওবায়েদ তাদের একজন সংসদ সদস্য। দলের স্থায়ী কমিটিরও সে সদস্য। একটা অবৈধ মামলায় বানোয়াট অভিযোগে চার বছর ধরে কারারুদ্ধ থাকার পর জেলখানা থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেও পূর্ববৎ আটক রয়েছে। এরা আছে যার যার নিজের তালে। কে মন্ত্রী হবে, কে বড় পদ পাবে, বাড়ি গাড়ির কি ব্যবস্থা হল, আখের গুছাবার ধান্দা আর প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রতি পূর্বতন স্টাইলে প্রতিহিংসার রেওয়াজ চালু হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের বিষয়টা সেভাবে দেখে একটা বিহিত করার কারো কোন গরজ দেখা যাচ্ছে না। সাক্ষী চলছে। কোর্ট তড়িঘড়ি করছে উপরের নির্দেশে। আমরা অধৈর্য মনে ধৈর্য ধরার বৃথা চেষ্টা করছি।

১লা ডিসেম্বর, ২০০১ সাল, সুপ্রীমকোর্ট বিলম্বিত শুনানির পর ওবায়েদের জামিন মঞ্জুর করেছে আগামি বছরের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত। এর মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করারও নির্দেশ দিয়েছে। সেটা যদি সম্ভব না হয় তা হলে পরবর্তীতে ট্রায়ালকোর্ট জামিনের সময়সীমা বাড়াতে পারবে বা স্বাধীনভাবে জামিন মঞ্জুর করতে পারবে। বিদেশ যেতে হলে অবশ্য কোর্টের অনুমতি প্রয়োজন হবে।

দীর্ঘ চার বছর পর আর এক সরকারের আমলে এসে বরফ কিছুটা গলার লক্ষণ দেখা গেল। এই আদেশের ফলশ্রুতিতে যদি আমাদের বিষয় বিবেচনা লাভ করে সেই আশায় উজ্জীবিত হয়েছি। মামলার পরবর্তী তারিখ পরেছে ২০শে জানুয়ারি ২০০২ সাল।

৫ই ডিসেম্বর, ২০০১ সাল। গতকল্য নুরুল ইসলাম মঞ্জুর জামিন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ। আমার দরখাস্তের শুনানি সম্ভবত ১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। আল্লাহ্ চাহে তো সুসংবাদ আশা করছি।

১১ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে আমার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। দুপুরে বারান্দায় টেবিলে লেখালেখির কাজ করছিলাম। উল্লসিত জুবায়ের দৌড়ে এসে খবর দেয়, চাচা! আপনার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এই মাত্র বিবিসিতে বলল খায়রুজ্জামান সাহেবেরও জামিন হয়েছে। ঢাকার সাবেক ডেপুটি মেয়র জাহাঙ্গির মোহাম্মদ আদেলের পুত্র জুবায়ের তখন এক তথাকথিত হত্যামামলায় আসামী হয়ে আমাদের সঙ্গে কারাগারে। তাকে স্নেহ করি। সে আমাকে প্রচন্ড শ্রদ্ধা করে। তার আনন্দ দেখার মত।

ছাব্বিশ সেলের সকলের আনন্দ উল্লাস স্তিমিত হলে অজু করে দু'রাকাত শোকরানার নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

জেল সুপার সঙ্গোপনে একই খবর পাঠায়। সন্ধ্যার পূর্বে জেলর সশরীরে এসে খবর জানায়। কম-বেশী সকলেই আনন্দিত।

বেইল বন্ড জেলখানায় পৌঁছলে মুক্তি পাব। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আজ রমজান মাসের ২৫শে চলছে। রোজা প্রায় শেষ হয়ে এল।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ চাহে তো আমার দীর্ঘ কারাবাসের কালও অবসান হতে যাচ্ছে।

আদালতের এবং অন্যত্র জটিলতা কাটতে সময় লেগে গেল। ঈদের পর ১৯শে ডিসেম্বর ২০০১ সাল সন্ধ্যার অনেক পরে প্রায় চার বৎসর পর কারাগারের দরজা খুলে গেল। বাইরে অগনিত বন্ধু-বান্ধব অনুরাগী সহকর্মীগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত। মুর্হুমুহু স্লোগান শোনা যাচ্ছে। ফটক পার হতেই সালেহা এবং দিনা দৌড়ে এসে দুদিক থেকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ ও আবেগে সশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল। তাদের আলীঙ্গন থেকে ছাড়া পেতে সময় লাগল। তার পরই বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সোল্লাশ জিন্দাবাদ ধ্বনি, আলীঙ্গন, করমর্দন ও মাল্যভূষণের মাঝখানে টিভি চ্যানেলের মাইক্রোফোন এগিয়ে এল আমার তাৎক্ষনিক অভিব্যক্তি গ্রহণের জন্য। শুধু বললাম, আল্লাহ্ তা'লাকে অনেক শুকরিয়া। সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ আমার জীবন থেকে যারা চারটি বছর কেড়ে নিল আল্লাহ্ নিশ্চয়ই একদিন তাদের বিচার করবেন।

কয়েকদিন পর আমার বাসায় যে দোয়া অনুষ্ঠান হয় তাতেও একই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলাম। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত বক্তৃতা হয় না। কিন্তু উপস্থিত বিশাল অভ্যাগত ও সাংবাদিকদের মনোভাব অনুধাবন করে অনুষ্ঠান পরিচালক গুলশান এক নম্বর জামে মসজিদের সুযোগ্য ইমাম এবং আমার বিশিষ্ট শুভাকাঙ্খী হাফেজ হাফিজুর রহমান সাহেব আমার হাতে মাইক গুজে দিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানালেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে মাইক নিয়ে দাঁড়ালাম। দীর্ঘ চার বৎসর পর আনুষ্ঠানিক কথা বলতে গিয়ে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হযে ওঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সেদিন বললাম, নীপিড়ন নির্যাতনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। যারা আমার জীবন থেকে চারটি বৎসর কেড়ে নিয়েছে ক্ষমতার অন্ধ দাপটে তাদের বিচার একদিন হবে। বিচার শুরুও হয়ে গেছে।

উপস্থিত সূধীজন সকলেই সম্যক উপলব্ধি করলেন আওয়ামী জুলুমবাজদের সাম্প্রতিক পতন অতি নিকটকালীন ঘটনা। সে অনুষ্ঠানে নির্বাচনে অনেক অঘটন ঘটিয়ে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের প্রাক্কালে দেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত এরশাদ সাহেবের জন্যও দোয়া করা হয়। প্রথমে চারদলীয় জোট, মাঝে চরমোনাই পীরের সঙ্গে ঐক্য এবং পরে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দান করার জটিলতায় নির্বাচনের

www.pathagar.com

পর দলের নেতা-কর্মীদের মনোবল যখন শূন্যের কোঠায়, দলীয় নেতৃত্বের বিভিন্ন অবিমৃশ্যকারীতায় জর্জরিত তারা যখন চরম হতাশা ও নৈরাজ্যে ভুগছে সেই মুহূর্তে আমার উপস্থিতি এবং দলীয় সম্বর্ধনা ও অন্য কয়েকটি সমাবেশে আমার সময়োপযোগী বলিষ্ঠ বক্তব্যে দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

ফোনে এরশাদ সাহেবকে বললাম, দেশে প্রত্যাবর্তন করুন, তা না হলে চিরদিন বিরূপ সমালোচনায় ভুগবেন। এরশাদ সাহেব বললেন, দেশে আসলে হয়ত আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

বললাম, তখন আমরা আপনার মুক্তির জন্য আন্দোলন করব। আপনি সে অবস্থায়ও জনগণের মাঝে বেঁচে থাকবেন। বিদেশে নির্বাসিত থাকলে আপনার ক্ষতি, দলেরও ক্ষতি।

তিনি কথাগুলির মর্মার্থ অনুধাবন করলেন। বললেন, আপনি মুক্তি পেয়ে বাইরে এসেছেন, এখন অনেকটা বল পাচ্ছি। শীঘ্রই ফিরে আসব।

একদিন তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করলেন। বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নতুন আশা-আকাঙ্খায় বুক বেধে কর্মীগণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠল। এরশাদ সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দলকে পুনর্গঠনের কাজে ব্যাপৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পার্টিকে পুনরায় এক সূত্রে গাথার জন্য তিন জাতীয় পার্টির ঐক্য প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করি। জাতীয় পার্টিতে এমন সদস্য কমই পাওয়া যাবে যারা আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাড়া দেবে না। চারদিকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

এক অংশের নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু চিরদিন আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। আমিও তাকে অকৃত্রিম স্নেহ করি। সে এসে বলল, বস্ আপনি ডাকলে না এসে পারি না। কিন্তু আপনি কি চাচ্ছেন জাতীয় সংসদের ভিতরে আমি মিসেস এরশাদের নেতৃত্বে চলব, আর বাহিরে এসে এরশাদ সাহেবের?

তাকে বললাম, আগে তুমি আস পরে একটা পন্থা বের করা যাবে। কাজী জাফর সাহেবও আমার বাসায় এসে মঞ্জুকে একই আশ্বাস দেন।

প্রায় সব আয়োজন সম্পূর্ণ। তারিখ নির্ধারণ করা হল ঐক্য বৈঠকের। সকলে আমার বাসায় আসবে। সালেহাকে বললাম সকলের জন্য সেদিন যেন নৈশভোজের ব্যাবস্থা থাকে। দল একত্রিত হবে, সে

www.pathagar.com

অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সব আয়োজনে লেগে যায়।

কিন্তু এরশাদ সাহেব নিজেই সব ভেস্তে দিলেন। অনেকদিন থেকেই কানাঘুষা শুনছিলাম, পার্শ্ববর্তী এক দেশের গোয়েন্দা সংস্থা নাকি এক মহিলা দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। সে সময় জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের সদস্য এবং জেলহত্যা মামলায় আমার কৌশুলী খন্দকার মাহবুব হোসেন বহু পূর্বেই আমাকে এ ইঙ্গিত করেছিল। কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায়নি। এরশাদ সাহেবের বয়স হয়েছে। সে প্রায় অশীতিপর বয়স্ক। তার আর মেয়ে মানুষের কী প্রয়োজন।

কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে ঐক্য বৈঠকের ঠিক পূর্বের দিন তিনি একটি ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে এক অত্যন্ত চিহ্নিতা মহিলাকে নিয়ে সাংবাদিকদের নিকট তার নুতন বিবাহ এবং সন্তান লাভের ঘোষণা দিলেন।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিয়ে ও সন্তানের ঘোষণার টাইমিংটা তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটি দিন পরে হলেই ঐক্য সাধিত হয়ে যায়। তাহলে কি উল্লেখিত সংস্থার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিমোট কন্ট্রোলেই সব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ দেশে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পার্টি তাদের কাম্য নয়। অনেকেরই কাম্য নয়।

সকলের সব আশার মূলে ছাই পরল। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু খবরের কাগজে মন্তব্য করল, খোদা মেহেরবান, আমি পূর্বাহ্নে তার সাথে ঐক্য করি নাই।

ফোনে এরশাদ সাহেবকে অনেক কথাই বললাম। রাগ করলাম, এ আপনি কী করলেন? এই বয়সে এভাবে লোক হাসাবার কি প্রয়োজন পরল? তিনি ছুটে আমার বাসায় এসে আমার হাত চেপে ধরলেন, মোয়াজ্জেম! এবার আমাকে Salvage করুন।

লোকটির দু'একটি মারাত্মক দুর্বলতা থাকলেও অনেক গুণও আছে। ভালমন্দে মিশ্রিত মানুষ। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ সেবায়, দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে তার অবদান অনস্বীকার্য। নেতা হিসাবে যেমন তাকে মান্য করেছি, ব্যক্তি হিসাবেও তার প্রতি ভালবাসার অভাবও বোধ করিনি। মন নরম হয়ে এল। কিন্তু তাকে আমি চিনি। তাই বললাম, এক শর্তে আমি আবার আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারি। আপনার এই স্ত্রীকে কখনোই দলীয় ব্যাপারে টানবেন না এবং তাকে রাজনীতিতে আনবেন না। আপনার মনে থাকার কথা, আপনার প্রথমা স্ত্রীকে যখন

www.pathagar.com

রাজনীতিতে আনেন, আমি বাধা দিয়েছিলাম এবং আপনার সেদিনের বান্ধবী জীনাতকে যখন রাজনীতিতে নিয়ে এলেন সেদিনও আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেছিলাম। আপনি মানেন নি। আজ আপনাকে কথা দিতে হবে, এই মহিলাকে নিয়ে যথেচ্ছা ঘর-সংসার বা সামাজিক মেলামেশা করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু কস্মিনকালেও তাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করবেন না।

এরশাদ সাহেব সম্মত হলেন। সুস্পষ্ট রূপে কথা দিলেন, তিনি তার এই স্ত্রীকে রাজনীতিতে নামাবেন না।

আমি পুনরায় দলের কাজকর্ম শুরু করলাম। কিন্তু বেশী দিন অতিবাহিত হল না। তিনি তার ওয়াদা বিস্মৃত হলেন এবং ধীরে ধীরে এই মহিলাকে রাজনীতির অঙ্গনে পদচারণা করাতে থাকলেন।

যেদিন আমাকে একান্তে প্রস্তাব করলেন, মোয়াজ্জেম, আর পারা যাচ্ছে না। ওকে রাজনীতিতে আনতে হয়। আমি বেঁকে বসলাম। কোথায় সূতার টান জানি না। কেন এ ধরনের একজন মহিলাকে রাজনীতিতে আনতেই হবে আমার বোধগম্য হল না।

অগত্যা তার সঙ্গে সক্রীয় রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকা ছাড়া আর গত্যান্তর রইল না। সেভাবেই চলছে।

ইতিমধ্যে আমার এলাকার দ্বিতীয় বারের মত উপ-নির্বাচন হল। একদিন বড় খোশ হালে বেগম খালেদা জিয়া আমাদের ওখান থেকে নির্বাচিত ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি হয়ে দলের সব স্থানীয় নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে তিনি নিজের অরাজনীতিক পুত্রকে সাংসদ বানিয়ে আনেন। চৌধুরী সাহেবকে বাহ্যিকভাবে চেনা কঠিন। ভাল চিকিৎসক সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ হিসাবে বা একজন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা রাজনীতিক হিসাবে তিনি কেবল অতি সুবিধাবাদীই নন, সর্বোতভাবেই একজন ক্ষমতালোভী মানুষ। তার মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার বালাই নেই। তার পিতাও রাজনীতি করে জেল খেটেছিলেন। বি.এন.পির অনেক নেতা-কর্মীই কম-বেশী কারাভোগের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু দলের এক সময়ের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি হয়েও তিনি ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে থাকার মন্ত্র জানেন।

রাষ্ট্রপতি হযে তার মনে হল 'আমি কী হনু রে'! তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে, তাকে আর পায় কে! রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রচুর অর্থ ব্যয়ে যখন যেখানে খুশী অহেতুক এবং নিজেকে জাহির করার প্রবণতায় যত্রতত্র

www.pathagar.com

প্রোগ্রাম করতে থাকেন। ক্রমে নেত্রীর কাছে এবং দলের কাছে গলার কাটায় পরিণত হন।

যে খালেদা জিয়ার অনুকম্পায় একদিন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন সেই নেত্রীর নির্দেশেই আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হন। অত্যন্ত অপমানজনক পথে তাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিদায় নিতে হয়। তার পুত্র যথাসময়ে দল ও সংসদ থেকে পদত্যাগ করে পিতাকে নিয়ে এক বিকল্প ধারা চালু করার প্রয়াস পায়। এখানেও বিএনপির অসহিষ্ণু কর্মকাণ্ড বাপ-বেটার বিকল্প প্রচেষ্টাকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় সামায়িক হলেও কিছুটা দাঁড় করাবার সুযোগ করে দেয়।

চৌধুরীর পুত্র এলাকার মানুষের পিতৃ-অবমাননার সহানুভূতী ভাঙ্গিয়ে পুনরায় নির্বাচনে কৃতকার্য্য হয়। বিএনপি ভুল লোককে অর্থের বিনিময়ে মানোনয়ন দিয়ে আরও বড় ভুল করে।

এলাকার অনেক শুভানুধ্যায়ী এবং সংশ্লিষ্ট লোকজন সে সময় আমার কাছে এসেছিল, নির্বাচনে দাঁড়ান। প্রয়োজনে ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়ান।

আমি সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। এই বয়সে দল পরিবর্তন সম্ভব নয়। যদি কখনো পরিস্থিতির উন্নতি হয়, জাতীয় পার্টিই করব। সম্ভব না হলে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিষ্ক্রীয়ই থাকব। তাই আর নির্বাচনে দাঁড়াই নি।

আমার কিছুটা অভিমানও আছে। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী। সমগ্র বিক্রমপুরে বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকায় যত কাজ হয়েছে, প্রায় সবই হয়েছে আমার উদ্যোগে। জনগণ তা জানে এবং স্বীকার করে।

কিন্তু ভোটের সময় তারা অন্যত্র ভোট দেয় কী করে! একবারও কি তাদের বুক কাঁপে না! ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এক প্রবীণ জননেতা আবদুল গনি খাঁন নির্বাচনের দাঁড়িয়ে ঘরে বসে আছেন। সাংবাদিকগণ এসে প্রশ্ন করল, আপনি ভোট চাইতে যাচ্ছেন না কেন?

তিনি জবাব দেন, জঙ্গল কেটে রাস্তা করে দিয়েছি, নদী-নালার উপর দিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়েছি, মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আজ আমাকে তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করতে হবে?

www.pathagar.com

তিনি অনেক ভোটে জয় লাভ করেন। কৃতজ্ঞ নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে বিস্মৃত হয় না।

আমার বেলায় কেন এমন হয়! নিশ্চয়ই আমার মধ্যে বড় কোন ত্রুটি বিদ্যামান।

অতি সংক্ষেপে কথা কয়টি না বলে পারা গেল না।

ইতিমধ্যে জেল হত্যা মামলা নিয়ে সরকার এবং বিরোধী শিবিরে ভালই জট পেকেছে।

দিন, মাস, বৎসর যথাসময়ে অতিবাহিত হচ্ছে। সাক্ষী সাবুদ এবং বিচারের প্রক্রিয়া চলছে মন্থর গতিতে। এর মধ্যেও নানা বাধা-বিঘ্ন এবং প্রতিকুলতার চাপ এসে মামলার স্বাভাবিক গতিকে শ্লথ করে দেয়।

বিষয়টি না বললেই নয়। সরকার পরিবর্তনের ছাপ পরেছে সর্বত্র। কোর্ট-কাচারিতেও পিপি, জিপি এবং এটর্নীদের পরিবর্তন ঘটেছে। আওয়ামী লীগের পরিবর্তে সর্বস্থানে বিএনপির লোকজন জাকিয়ে বসেছে।

কেবলমাত্র জেল-হত্যা মামলাটি এর ব্যতিক্রম। কেউ কেউ বলে, বিএনপির চরম সুবিধাবাদী আইনমন্ত্রী যেমনি দ্রুত দল পরিবর্তনে পারদর্শী তেমনি সে আগাম ভেবে ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনে রাজনৈতিক ছায়া লাভের আশায় চিন্তা-ভাবনা করে এগোয়। আগামীতে যদি আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতার আসে তাই সে তাদেরকে চটাতে চায় না, হাতে রাখতে চায়।

কারো কারো ধারণা, ওবায়েদের কারণে সরকারের আইনমন্ত্রী মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির বিরোধী। কেস শেষ হলে এবং নির্দোষ প্রমাণিত হলে ওবায়েদ সরকারে একটি ভাল স্থান পেতে পারে এবং সেটি আইনমন্ত্রীসহ আরও অনেককে ডিঙ্গিয়ে। তাই আইনমন্ত্রী মামলাটি ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে।

অন্যদিকে আওয়ামী শিবির চায় তারা পুনরায় ক্ষমতায় এসে এটি ইচ্ছামত নিষ্পত্তি করবে। উদ্দেশ্য ঐক্যমত লাভ করে। ওবায়েদ বার বার তাদের নেত্রীকে বিষয়টি জানায়। ব্যস্ত নেত্রী তাকে আইনমন্ত্রীর স্মরণাপন্ন হতে বলেন।

এমনি প্রেক্ষিতে ওরা দু'জন আমাকে অনুরোধ জানায় একবার

www.pathagar.com

তিনজন মিলে আইনমন্ত্রীকে সব বলে আসার জন্য। ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মত হই। আমার দ্বিধা ছিল। মওদুদকে সেই স্কুল জীবন থেকে জানি। ১৯৫৪ সালে আমি যখন ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক তখন সে সেই সংসদে প্রমোদ সম্পাদক। সরকার থেকে নেমে আসার পর এই প্রথম সচিবালয়ে প্রবেশ করি। মওদুদ জিজ্ঞাসা করে, মামলার বিষয়ে তোমরা কী চাও?

বললাম, আমরা মামলাটি সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করে নেয়ার পক্ষপাতী নই। তাহলে চিরদিন মানুষের মনে একটা সন্দেহের বীজ থেকে যাবে। আমরা অনেক ভুগেছি। মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি আমাদের কাম্য। আইনমন্ত্রী হিসাবে সেটি দেখা তোমার দায়িত্ব।

সে প্রতিশ্রুতি দেয় মামলা শীঘ্র নিষ্পত্তি হবে। ইতিমধ্যে মামলার সরকার নিযুক্ত স্পেশাল পিপি জনাব সিরাজুল হক পরলোকে গমন করলে তার পুত্র এবং অন্যান্য আইনজীবীগণ পূর্ববৎ মামলা পরিচালনা করতে থাকে। কোর্টে তারা সর্বদা সরকারী অসহযোগিতার অজুহাত তুলে নানা কারণ দর্শিয়ে কেবলই বিলম্ব ঘটাতে প্রয়াস পায়। প্রয়াত সিরাজুল হক সাহেব ছিলেন একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী, তদস্থলে তার অনভিজ্ঞ পুত্র বা অন্যান্যরা আমাদের নিকট অগ্রহণীয় ছিল না। বরং সেটা অভিযুক্তদের জন্য সুবিধাজনকই ছিল।

একদিন আইনমন্ত্রনালয় থেকে এক আদেশে ঢাকার নুতন পিপিকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ইতিমধ্যে কোর্ট পূর্বতন সব স্পেশাল পিপিকে নিহতদের স্বজনদের দরখাস্তে তাদের পক্ষে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ দান করে। তারা কথায় কথায় নানা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে নানা তালবাহানায় মামলার গতিকে মন্থর করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নিহতদের স্বজনদের পক্ষ থেকে মিসেস তাজউদ্দীন আহমেদ হাইকোর্টে রীট করে মামলা স্থগিত করে দিতে সক্ষম হয়।

অনেক কাঠখর পুড়িয়ে বৎসরাধিককাল পরে হাইকোর্ট সে রীট খারিজ করে দিলে পুনরায় মামলা শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে, সুবিচার পাওয়া যাবে না বলে তাড়স্বরে আওয়াজ উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে গোপন আঁতাতের ফলশ্রুতি হিসাবে কিনা জানি না, পালামেন্টের বিরোধী দলের উপনেতার দেয়া একটি আইনজীবীদের লিষ্ট অনুসারে আইনমন্ত্রী এই

www.pathagar.com

মামলায় স্পেশাল পিপি নিয়োগ করে। বিরোধী দলের উপনেতা কোনভাবেই এই মামলার কোন বিষয়ে সম্পৃক্ত নয়। পুনরায় শুরু হয়ে যায় কোর্টের মধ্যে দ্বৈত পরিচালনার টানাপোড়েন। মামলার গতি আরও মন্থর হয়ে পরে।

ওবায়েদ বার বার প্রধানমন্ত্রীকে সমস্যাটি জানায়, তিনি কি আশ্বাস দেন বুঝা যায় না। আইনমন্ত্রী দুকুল রক্ষার ব্রতে ভালই পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। তার সম্বন্ধে রাজনৈতিক মহলের কারো কারো ধারণা, He always serves the future govt. রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, সে যখন জিয়ার সঙ্গে ছিল তখন এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত, আবার যখন এরশাদের সঙ্গে ছিল তখন পুনরায় বেগম জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং এখন বিএনপিতে থাকাকালীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলে। শেষ পর্যন্ত সে আরও একটি বিভ্রান্তিমূলক আদেশ জারী করে, পিপিরা মামলা পরিচালনা করবে আর স্পেশাল পিপিরা সাহায্য সহযোগিতা করবে। কেবল এই একটি ক্ষেত্রে বিএনপি আওয়ামী লীগের সহ-অবস্থানের এক অসম্ভব নয়া ফর্মূলা জারী হয়। কিন্তু আদেশটি খবরের কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে স্পেশাল পিপি বা পিপিগণ তার কপি পায় না। তার মধ্যে কী রয়েছে পরিষ্কার বোধগম্য হয় না।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবার হাইকোর্টে যায়। কিন্তু এবার তারা অনেক চেষ্টা করেও মামলার স্থগিতাদেশ আনতে সক্ষম হয় না। উচ্চতর আদালত আওয়ামী কৌশল ধরে ফেলে। আওয়ামী স্পেশাল পিপির দল হতাশ হয়ে মামলা থেকে একযোগে পদত্যাগ করে।

পুনরায় মামলাটি স্বাভাবিক গতি ফিরে পায় এবং নুতন উদ্যমে জজ সাহেব সাক্ষ্য গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন।

মোট পঁচাত্তর জন সাক্ষীর মধ্যে ৬৪ জন সাক্ষী কোর্টে উপস্থিতি হয়ে জবানবন্দী প্রদান করে। এদেরকে চারভাগে ভাগ করা যায়। জেলখানার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, বঙ্গভবনের কতিপয় কর্মচারী, আওয়ামীপন্থী কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি যাদের মধ্যে কয়েকজন ঘটনার সময়ে বন্দী ছিলেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সাবেক মন্ত্রী খুলনার শেখ আজিজকে সাক্ষী করা হলেও আমাদেরকে অন্যায়ভাবে আসামী করায় তিনি কিছুতেই মামলায় সাক্ষী দিতে যান না। বাকীরা নিহতদের আত্মীয়-স্বজন বা নিজেদের সম্পৃক্ততা

www.pathagar.com

প্রদর্শনের প্রায়স পায় এবং চতুর্থভাগে রয়েছে অফিসিয়াল বা টেকনিক্যাল সাক্ষী।

আমাদের সর্বদাই বক্তব্য ছিল, জেলখানার তদানীন্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তারা কেহই এই হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব কোনভাবেই এড়াতে পারে না।

কারগারের আইজি, ডিআইজি, জেলর এবং জেলখানার অন্যান্য প্রায় সকলেই এই মামলায় সরাসরি অভিযুক্ত হওয়া ছিল অতীব বাঞ্ছনীয় এবং আইনের প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বে বার বার উল্লেখিত হয়েছে প্রকৃত অপরাধী বা তাদের সহযোগীদের শাস্তি বা বিচারে প্রেরণ আওয়ামী সরকারের মনোবাঞ্ছা ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কী করে আমাদের তিনজনকে ঘায়েল করা যায়। আমরা তিন জন ব্যতীত অন্য সকলেই বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামী ছিল। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুদণ্ডসহ অন্যান্য দণ্ড ভোগ করছে। অধিকাংশই পলাতক রয়েছে। এই মামলার দোষী হলেই বা কি নির্দোষী হলেই বা কি! তাদের জন্য ফলাফল সমান। ফাঁসি দু'বার হয় না। জেলখানার এই সব তথাকথিত সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত কর্নেল (অবঃ) ফারুক, মেজর (অবঃ) খায়েরুজ্জামান এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরের আইনজীবীগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করে। আমাদের এডভোকেট আবদুল মজিদ মুন্সীও চমৎকার জেরা করে। পলাতক আসামীদের সরকার নিয়োজিত আইনজীবীগণও প্রচুর জেরা করে প্রচুরতর তথ্য সংগ্রহ করে। সব কিছু দৃষ্টে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই সব জেল কর্মকর্তাগণ যদি সেদিন হত্যাকারীদেরকে অনৈতিক, অবৈধ এবং জেলকোড বহির্ভূত অন্যায় সহযোগিতা না দিত তা হলে ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। মাত্র কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী কারাগারের অভ্যান্তরে প্রবেশ করে মানব ইতিহাসের এত বড় নক্কারজনক হত্যাকাণ্ড ঘটাতে কিছুতেই সক্ষম হত না। এদেরকে শুধু সহযোগী বললে অনেক কম বলা হয়, এরা ছিল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের দোসর, ঘটনার সহায়ক শক্তি এবং প্রত্যক্ষ মদদদানকারী। সর্ব বিবেচনাতেই এদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত ছিল। কিন্তু উচিত কাজ ক'জনা করে? কেনইবা তা করবে? তাদের উদ্দেশ্য যে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

'বুঝহ সুজন যে জান সন্ধান।'

আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে। আমার পক্ষ থেকে সকল ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ভিন্নভাবে জেরার প্রয়োজন ছিল না। উপরোক্ত আসামীদের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের অনেক জেরাকেই আমরা Adopt বা গ্রহণ করে নিই।

সর্ব বিবেচনায় যারা এই মামলায় আসামীর কাঠগড়ায় থাকার কথা তারা যখন চা-নাশস্তায় আপ্যায়ীত হয়ে রাহা খরচ নিয়ে বহাল তরিয়তে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুলিশের প্রস্তুতকৃত বক্তব্য আউড়ে যায় তখন এইসব চেনা মানুষগুলোকে অচেনা মনে হয়। তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেও মানসিক কষ্ট অনুভব করি।

এরা অবশ্য কোন অবস্থাতেই কাঠগড়ার উপস্থিত বর্তমান আসামীদের কারো নামই উল্লেখ করে না বা কাউকে সম্পৃক্ত করে না। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এই সব দু'নম্বরী ব্যক্তিদের দু'নম্বরী বক্তব্য শুনে যাই।

বাদী পক্ষে মামলার প্রয়োজনে এদের বক্তব্য দরকার হলেও আমাদের ডিফেন্সের জন্য এদের বক্তব্যের তেমন একটা প্রয়োজন অনুভব করি না।

ইতিমধ্যে ২০০৩ এর অক্টোবরে সরকার দায়রা জজ জনাব আহমেদ জামিল মোস্তফার স্থানে আলহাজ মোঃ মতিউর রহমানকে এই আদালতে প্রেরণ করে। তাকে একজন ধীর-স্থির আইনী মনোভাবাপন্ন বিজ্ঞ বিচারক বলিয়া সকলের ধারণা জন্মে। প্রতিহিংসামূলক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবসানে একজন সত্যিকারের বিবেকবান বিচারকের হাতে মামলা নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনায় আমরা স্বস্তি অনুভব করি।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত চার প্রকারের সাক্ষীদের মধ্যে জেল প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং ঘটনাকালীন সময়ে যারা কর্মরত ছিল তাদের অপকর্মসমূহের কিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্বাহ্নে প্রদান করেছি। মামলায় তারা কি সাহায্য করেছে জানি না, তবে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ওরা না হলে জেল হত্যাকাণ্ড ঘটত না। কয়েকটি মূল প্রতিপাদ্য তুলে ধরছি।

প্রথমত: ওরা পূর্বাহ্নে একটি অঘটনের সতর্ক সংবাদ পেলেও সতর্কতামূলক কোন ব্যবস্থা নেয় না। তখন পর্যন্ত তারা বঙ্গভবনের তথাকথিত নির্দেশ পায় নি। পূর্বাহ্নে সর্তকতা প্রদানের পর হত্যা করা অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত : ওরা এ ঘটনার কথা বেমালুম চেপে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের হেডকোয়াটার এবং কন্ট্রোল রুম, এসপি, ডিএম, পার্শ্ববর্তী লালবাগ থানা বা বিডিআরকে ওরা কিছু জ্ঞাত করে

www.pathagar.com

না।

তৃতীয়ত: ওদের লোকজনের সাক্ষ্যেই প্রমাণ হয় যে, ওরা অনুমতি দিয়ে গেট খুলে না দিলে দুষ্কৃতিকারীরা কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারত না।

চতুর্থত : আরও প্রমাণ হয় যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন আতাতায়ীকে শত-সশস্ত্র প্রহরী, পুলিশ ও বিডিআরের পক্ষে অস্ত্রহীন করে তাদেরকে আটক করে আইনে সোপর্দ করা মোটেই অসাধ্য ছিল না।

পঞ্চমত : ওরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে, গেট রেজিষ্টারে নামধাম তুলে অকুস্থলে নিয়ে যায়। তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় নেতৃবৃন্দকে একত্র করে গুলী করা হয়। পরে বেয়নেট চার্জ করা হয়।

ষষ্ঠত: ঘাতকদের সকলের নাম ধাম থাকলেও পরদিন যে দায়সারা এজাহার করে তাতে একজন ঘাতকের নামও দেয় না। বঙ্গভবনের নির্দেশের কথাও এজাহারে দেয় না। খালেদ মোশাররফের দক্ষিণ হস্ত এবং পাল্টা 'ক্যু'র অন্যতম নায়ক সাফায়াত জামিলের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় ১লা নভেম্বর হতে বঙ্গভবনের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

সপ্তমত : প্রথমে গুলী করে হত্যা এবং দ্বিতীয় দফায় বেয়নেট চার্জে হত্যার পর জেলের একজন কর্মকর্তাও সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয়নি কেউ বেঁচে আছে কিনা বা সিভিল সার্জ্জন কিংবা যে কোন ঐকজন ডাক্তারও পাঠায় নি তাদের দেখার জন্য। পরদিনও কেউ খোঁজ করে না।

অষ্টমত : জেল কর্তৃপক্ষ এই সব ঘাতকের পরিচিতি Ascertain করে নাই এবং সেনা সদর থেকে তাদের Identity সংগ্রহ করে নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তাও তা করে নি।

নবমত: পূর্বাহ্নে হত্যা সম্বন্ধে সেনাসদর ও উচ্চাভিলাশী সেনাপতিদের নিকট থেকে নির্দেশ প্রাপ্তির পর সে সমস্ত সংবাদ কাউকে না জানিয়ে গোপন করে।

দশমত: তারা সুস্পষ্টভাবে জেল কোডের সকল বিধান কেবল ভঙ্গই করে না বরং বিধানে নিষেধকৃত কার্যসমূহ সম্পাদন করে।

সকল অপকর্ম সুচারুভাবে প্রতিপালনের পর কেবল নিজেদের চামরা বাঁচাবার জন্য এরা বঙ্গভবনের একটি তথাকথিত অবৈধ মৌখিক আদেশের কথা বার বার তোতাপাখীর মত আউড়ে যায়। কোন অবৈধ আদেশ পালনই যে বৈধ নয় একথা জেনেও তারা পৃথিবীর অন্যতম

www.pathagar.com

জঘন্য অপরাধটি সম্পন্ন করতে একটি সম্পূর্ণ বেআইনী আদেশের আশ্রয় নেয়।

এদের বক্তব্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য অনিয়ম, ব্যর্থতা, কর্তব্যে শৈথিল্য এবং জেল কোড ভঙ্গ জনিত অপরাধের সঙ্গে জাতীয় চার নেতার নৃসংশ হত্যাকাণ্ডে এরা অবশ্যই জড়াতে বাধ্য। কিন্তু আসামী না করে তাদের সাক্ষী করে আনলে কোর্টেরই বা কি করার থাকে! এ সময় জজ জনাব আহমেদ জামিল মোস্তফা যে অস্ফুট আশ্বাস উচ্চারণ করেছিলেন তার কোন বাস্তাবায়ন দেখা যায় না। পূর্বেই বলেছি এরা আসামীর কাঠগড়ায় এই মুহূর্তে উপস্থিত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্চ্য করে না, তাদের সেটা করার সুযোগও ছিল না। আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় ভাগ সাক্ষীদের মধ্যে পড়ে ঘটনার সময় বঙ্গভবনে কর্মরত কতিপয় কর্মচারী। রাষ্ট্রপতির অন্যতম এ,ডি,সি কমোডোর গোলাম রব্বানীকে বাদ দিলে জনাকয়েক সাক্ষী সংগৃহীত হয়েছে, কেউ এমএসপির পিএর সহকারী, কেউ রিসেপসনিষ্ট, কেউ টেলিফোন অপারেটর এবং কেউ কেউ খেদমদগার বা টি-বয়। ক্যাপ্টেন মোসলেমের ড্রাইভারও এখানকার একজন সাক্ষী।

কমোডোর গোলাম রব্বানীর সাক্ষ্যের কথা পূর্বে কিছুটা উল্লেখিত হয়েছে। কমোডোর রাব্বানী তার অভিমত অনুসারে সে সময়ের পরিস্থিতি এবং 'কু' পাল্টা-'কু'র সম্বন্ধে যে বক্তব্য দেয় তা হতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সে কোন অবস্থাতেই আমাদের সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখে না। বরং তার একটি বক্তব্যে আমাদের বক্তব্যেরই সত্যতা প্রমাণ হয়। মাননীয় আদালত তার বক্তব্য কীভাবে বিচার করবেন তা অচিরেই রায় পর্যালোচনায় দৃষ্ট হবে।

সরকারী সাক্ষী মোখলেসুর রহমান তৎকালীন রাষ্টপতির মিলিটারী সেক্রেটারীর পিএর একজন সহকারী। তাকে এমএসপির সহকারী পিএও বলা চলে। ইয়াকুব হোসেন, কাইয়ুম চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আলী অলক রিসেপসনিষ্ট বা টেলিফোন অপারেটর অপর দুই সাক্ষী মানিক এবং সাখাওয়াত হোসেন খেদমদগার বা টি-বয়।

বঙ্গভবনের এই সমস্ত তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আমরা

www.pathagar.com

চিনতাম না, তাদের নামও জানতাম না। কিন্তু মামলার শুরুতে পুলিশের নিকট প্রদত্ত বলে কথিত জবানবন্দী বা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় ষ্টেটমেন্টে তাদের বক্তব্য পাঠ করে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। তাদের সেই জবানবন্দীর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, আমাদেরকে বঙ্গভবনে দেখা যেত, আমরা প্রেসিডেন্টের কাছের লোক ছিলাম। প্রয়োজনে তার টেলিফোন থেকেও বিভিন্ন স্থানে কথা বলেছি। শুধু তাই নয়, সে জবানবন্দীতে কেউ কেউ ১৯৭৫ সালের ২রা নভেম্বর রাত ২টার সময় রাষ্ট্রপতির শয়নকক্ষে এক গোপন পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখে এবং পরামর্শ সমূহ শ্রবণ করে। সেই সভাতে অন্যান্যদের সঙ্গে আমরা তিনজনও নাকি উপস্থিত ছিলাম। অভিযোগটি কেবল ভয়ঙ্কর মিথ্যাই নয়, অত্যন্ত অভিনবও বটে। তাদের বক্তব্য মতে আমাদেরকে তারা কেবল সেই সভাতে দেখতে পায়, আমরা কোন কথা বলি নি। সেই সব জবানবন্দীতে উল্লেখিত মাহবুব আলম চাষী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ বঙ্গভবনে অবস্থানরত সকল সামরিক ব্যক্তিদের নাম বলা হয়। চাষী এবং ঠাকুর বঙ্গভবনে রাতে অবস্থান করত বলে সাক্ষ্য এসেছে। কথাটা সঠিক কিনা আমাদের জানার কথা নয়। বাহির থেকে কেবল আমাদের তিন প্রতিমন্ত্রীকে গভীর রাতের সেই সভায় উপস্থিত দেখানো হয় উপরোক্ত সাক্ষীদের মুখ জবানীতে যা শুধুই আইও আবদুল কাহার আকন্দের মস্তিক প্রসূত এবং তার স্বহস্তে প্রস্তুতকৃত বলে মনে হয়। শুনেছি ওদের পুলিশে প্রদত্ত বক্তব্য দেখে সরকার পক্ষের তদানীন্তন সিনীয়র পিপি জনাব সিরাজুল হকের মনেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি যে আমাদেরকে চিনতেন না তা নয়। তিনি সেই সব সাক্ষীদের ডেকে আমাদের তিনজন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেন, এই তিনজন কি সেই সভায় ছিল?

সাক্ষীরা এক বাক্যে বলে, না স্যার, এই তিনজন ছিল না।

চিন্তিত সিরাজুল হক সাহেব তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তোমাদের জবানবন্দীতে তাদের নাম এল কী করে?

তারা জবাব দেয়, স্যার, আইও সাহেব এই ভাবে লিখেছেন এবং আমাদেরকে এই ভাবেই বলতে বলেছেন।

তোমরা কোর্টে ঠিকমত বলবে তো?

সাক্ষীগণ নিশ্চুপ হযে যায়। তখন আওয়ামী সরকার ক্ষমতায়। অন্যথা বলার সৎসহস তাদের থাকার কথা নয়। আইও এবং পিপিরা

www.pathagar.com

মনে করে সময়মত জুজুর ভয় দেখিয়ে কোর্টে ঠিকই বক্তব্য দেওয়াবে।

কিন্তু আল্লাহ তা'লা সবই দেখেন এবং শোনেন। তাঁর হিসাব কারো জানা বা বোঝার অপেক্ষায় থাকে না। এদের সাক্ষ্য কোর্টে প্রদানের পূর্বেই আওয়ামী শাসনের অবসান ঘটে।

তারপরও শুনেছি এই সাক্ষীদেরকে সুধাসদনের বাসায় সাবেক এক স্পেশাল পিপির মাধ্যমে ডেকে নিয়ে তার স্বভাবসুলভ কটু কণ্ঠে ধমক দিয়ে বলেন, আইও যেভাবে বক্তব্য তৈরী করেছে সেভাবে কোর্টে জবানবন্দী দেবে। তাহলে যা চাও তাই পাবে। অন্যথায় গলায় পাড়া দিয়ে তোমাদেরকে শেষ করে দেব। ভেবো না আমরা আর ক্ষমতায় আসব না।

যথাসময়ে বঙ্গভবনের এই সব সাক্ষীগণ একে একে কোর্টে এসে দাঁড়ায়। এখন সরকার বদল হয়েছে। পিপিও বদল হয়েছে। চাকুরী থেকে বরখাস্তকৃত আইও এখন নখ-দন্তহীন। তার পক্ষে ওদেরকে ধমক-ধামক দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই সব সাক্ষীরা পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছে তার মধ্যে আমাদের তিনজনের কথা কোর্টে বলে না। অন্যান্য বক্তব্যে অনড় থাকে। এই মামলায় আমাদেরকে জড়াবার হীন উদ্দেশ্য নিয়েই জবানবন্দী তখন সেইভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এক্ষণে মিথ্যার অবসানে সত্যের জয় ঘোষিত হয়। আমাদেরকে জড়াবার সে জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পরে। আমাদেরকে জড়িত করার আর কোন অস্ত্র ওদের হাতে নেই।

এই টাইপের এক সাক্ষী বঙ্গভবনের টাইপিষ্ট সাখাওয়াত হোসেনের সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ কোর্ট তার রায়ে মন্তব্য করেন, তাহার মত একজন টাইপিষ্ট বিনা অনুমতিতে নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ছাড়া বাহিরে যাইতে পারিত না। তাহার এইরূপ সাক্ষ্য যে শিখানো এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের বিধি বিধানের পরিপন্থি ইহাই প্রতীয়মান হয়।

অপ্রয়োজনীয় বিধায় আমাদের পক্ষ থেকে কাউকে সামান্য জেরা করে বাকীদের ডিক্লাইন করা হয়।

অন্যান্য অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে বিস্তারিত জেরা করা হয় এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ হয়ে পরে। যেনতেন প্রকারে একটা মামলা সাজাবার গরজে তদন্তকারী কর্মকর্তা অনেক ভ্রান্তি করে যা সংশোধনের তার এখন আর ক্ষমতা নেই।

www.pathagar.com

বঙ্গভবন একটি বিশাল ইনষ্টিটিউশন। এর প্রশাসন পৃথক। বঙ্গভবনের নিজস্ব সচিবালয় আছে। কত কত বিভাগ ও কর্মকর্তা এখানে রয়েছে। সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ সচিব, প্রেস সেক্রেটারী, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব, সহকারী ব্যক্তিগত সচিব, সেকশন অফিসার, কম্পট্রোলার, স্টুয়ার্ড, বাটলার, সুপারভাইজার, প্রভৃতি একগাদা কর্মকর্তা ছাড়াও একজন মিলিটারী সেক্রেটারী, সহকারী মিলিটারী সেক্রেটারী এবং তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনজন এডিসি সর্বক্ষণিকভাবে রাষ্টপতির কার্যে নিয়োজিত থাকে। বঙ্গভবনে একটি নিরাপত্তা সেল থাকে যাতে তিন বাহিনীর জোয়নরা সর্বদা নিয়োজিত থাকে। বঙ্গভবনের প্রত্যেক বিভাগের অধীনে রযেছে পর্যাপ্ত কর্মচারী। পুলিশ, এসবি এবং মিলিটারীর দলও চব্বিশ ঘণ্টা বঙ্গভবন এবং বিশেষ করে প্রেসিডেন্টকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এতসব বড় বড় কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে থেকে জনা কয়েক রিসেপশনিষ্ট, টেলিফোন অপারেটর বা খেদমদগার উপস্থিতি করা হয় সাক্ষী হিসাবে। সাধারণ বিবেচনায় যে কোন ব্যক্তির নিকট বিষয়টি রহস্যমণ্ডিত মনে হতে বাধ্য।

আইও কোন দায়িত্ববান উচ্চপদস্থ সামরিক বা বেসামরিক সাক্ষী আনতে পারে না। বঙ্গভবনের যে দুই স্থানে যাতায়াতকারী লোকদের নাম, গাড়ীর নাম প্রভৃতি নোট করা হয় তাদের আনতে ব্যর্থ হয়। কোন রেজিষ্টার আনতে সক্ষম হয় না। কোন ডিউটি চার্ট সে আনে না। প্রটোকল অফিসার বা হসপিটালিটি অফিসার আনে না। সে বঙ্গভবনের প্রেসিডেন্টের শয়ন কক্ষের, যেখানে কথিত সভা হয় বলে তারা দাবী করে, বা সংলগ্ন প্যান্ট্রির কোন মানচিত্র অঙ্কন করে না। সকল বিজ্ঞ আইনজীবীদের জেরার তোপের মুখে এই সব সাক্ষীর বক্তব্য অসার প্রতিপন্ন হয় এবং নিজের জেরার সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাও বেহাল হয়ে পরে। সত্যের সঙ্গে সত্য মিশ্রিত করা যায়, সত্যের সঙ্গে কখনো অসত্যও সুকৌশলে চালিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে আরও মিথ্যা যোগ করতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সত্য বিষয়ও অসত্যের ডামাডোলে ধামাচাপা পরে যায়। অতি উৎসাহী কাহার আখন্দ তার মনিবকে খুশী করতে গিয়ে মূলেই কুঠারাঘাত করে ফেলে। তখন গরজ ছিল বড় বালাই। কত্রীর ইচ্ছায় কীর্ত্তণ করতে অনেক কিছুই বেসুরে হয়ে পরে, যার সংশোধন ট্রায়াল কোর্টে সম্ভব হয় না এবং সে কারণেই বা বলা

www.pathagar.com

চলে আইও-র চরম গাফিলতিজনিত কারণেই কেউ কেউ আশাতীত ফল লাভ করে। দণ্ডবিধির ১২০বি ধারা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে আওয়ামী সাক্ষীগণ যাদের মধ্যে জনা কয়েক সে সময় কারাগারে বন্দী ছিলেন। নিহতদের জনাকয়েক আত্মীয়ও সাক্ষ্য দেন। সরকারী সাক্ষী আবদুস সামাদ আজাদ ঘটনার সময় কারাগারে বন্দী। তিনি জেলখানার ঘটনা যা শুনতে পেরেছেন এবং দেখেছেন তার বর্ণনা দেন। তিনি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। আমরা তাকে বিশেষ জেরা করি না কেননা মামলার মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। সামাদ সাহেবকে ছাত্রজীবন থেকে চিনি। তার নাম ছিল আবদুস সামাদ। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে আমরা কেউ নাম না ভাড়ালেও তিনি মি. আজাদ নাম গ্রহণ করেন। কারণটি সকলের নিকটই বোধগম্য। ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামও সেদিন তার নাম নেন রহমত আলী। দেশ স্বাধীন হলে সামাদ সাহেব নামের সঙ্গে আজাদ শব্দটি সংযোগ করে দেন। অনেকেই ঠাট্টাচ্ছলে বলত একমাত্র সামাদ সাহেবেই আজাদ হয়েছেন, আমরা পূর্ববৎ পরাধীন রয়ে গেলাম! সামাদ সাহেব তার এবং নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বর্ণনা দেয়ার পূর্বে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মুজিব নগর সরকারের উপর তার কিছু মন্তব্য দেন।

১৯৭৫ এর পনেরই আগষ্টের পটপরিবর্তনের পর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে রশীদ এবং ডালিমের সঙ্গে তাদের কথপোকথনের বয়ানও তুলে ধরেন। পাট মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব আসাদুজ্জামান তার সাক্ষ্যেও একই কথা স্বীকার করেন। আরও বলেন যে ৩১ মে অক্টোবর হইতে ২রা নভেম্বরের মধ্যে জেলখানায় তিনি কয়েকবার মেজর ডালিমকে জেলর সহ তাহাদের কক্ষের সম্মুখ দিয়ে হাটাহাটি করতে এবং কথা বলতে প্রত্যক্ষ করেন।

সামাদ সাহেব ঘটনার রাতে জেলখানায় সংঘটিত ঘটনা যতটা দেখেন এবং শোনেন তার বিবৃতি দেন। সামাদ সাহেব মুজিব নগর সরকারে মতদ্বৈতার কথা বলেন বটে কিন্তু কোন অবস্থাতেই সেই সূত্রটিকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং সে বৎসরের ২রা নভেম্বরের ৪ নেতা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনরূপ যোগসূত্রের কথা বলেন না। সে সময় সামাদ সাহেব আওয়ামী লীগের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ

www.pathagar.com

নেতা। আওয়ামী লীগের আরও কয়েজন নেতা সর্বজনাব মোসলেহউদ্দীন আহমেদ হাবুমিয়া, দেওয়ান ফরিদ গাজী, আলী আশরাফ, রাশেদ মোসাররফ, তাজ উদ্দীন সাহেবের কন্যা সিমি হোসেন রিমি, মাহবুবউদ্দীন আহমেদ এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বাদীপক্ষের সাক্ষী হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দেন। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আদালতে প্রদত্ত সাক্ষী সম্বন্ধে বিজ্ঞ জজ সাহেব তার ২০ শে অক্টোবর ২০০৪ সালের ৩৭৩ পৃষ্ঠার রায়ের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে বলেন, তাহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত অপরাধী ও খুনীদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তাহারা কোন আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র এবং জেল হত্যাকাণ্ডের প্ররোচনা, সহায়তা ও সহযোগিতার সুস্পষ্ট কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। আদালতের নিকট তাহাদের সাক্ষ্য দায়সারা গোছের বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

জর্জ সাহেব একস্থানে রাশেদ মোশাররফের সাক্ষ্য বর্ণনা দিয়া বলেন, তিনি বলেছেন, "শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন একজন ভাল লোক এবং তিনি আমাকে স্নেহ্ করিতেন। আমার বড় ভাই খালেদ মোশাররফের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল।"

বিজ্ঞ আদালত তার রায়ের ১১৯ পৃষ্ঠায় বাদী পক্ষের ২০ নং সাক্ষী মাহবুবউদ্দীন আহমেদের সাক্ষের বিষযে বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি খালেদ মোশাররফের ভাই রাশেদ মোশাররফকে চেনেন। তবে তিনি খালেদ মোশাররফের মৃত্যুর কথা জানেন না বলিয়া আদালতকে জানান। জেরাকালীন তার উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, তিনি একজন সচেতন কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ থেকে খালেদ মোশাররফ কর্তৃক কাউন্টার 'কু'র কথা না জানার কথা নয় বা তাহার মৃত্যুর ঘটনা না জানার কথা নহে। তাহার জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে তিনি অজানা রহস্যের কারণে কিছু কিছু প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। জজ সাহেব আরও লক্ষ করেন ঘটনা ঘটার তারিখে অর্থাৎ ২রা নভেম্বর '৭৫ 'লক আপের' আগে ডালিম তাহার কক্ষের সামনে আসেন। তাহার ও ডালিমের মধ্যে কথাবর্তা হয়। এখন আদালতের কাছে প্রশ্ন কেন মেজর ডালিমের ঘটনার রাত্রে সন্ধ্যার পূর্বে কেন্দ্রীয় কারাগারে আসিবার কথা আদালতের কাছে প্রকাশ পায় না!

www.pathagar.com

পরের কথা কিছুটা আগে চলে এসেছে। ঘোড়ার আগে যেন গাড়ী জুড়ে দেয়া হয়েছে। জজ সাহেবের রায়ের কিছু কিছু কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছি। বাস্তবে এই মামলাটির ক্রমান্বয়ে এবং যথা সময়ে রায় প্রদানের বিষয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদে।

ইতিমধ্যে ২০০৩ সাল অতিক্রান্ত হয়ে ২০০৪ সালেরও দ্বিতীয় ভাগে পরেছে। তারিখের পর তারিখ পরে এবং বর্তমান বিজ্ঞ জজ আলহাজ মেঃ মতিউর রহমান সাহেবের মামলাটি যথা শীঘ্র সম্ভব নিস্পত্তি করার আগ্রহে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য দান এক সময়ে এসে শেষ হয়। সর্বশেষ সাক্ষী এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দের দীর্ঘ সাক্ষ্য ২০০৪ সালের ২৯শে জুন শুরু হয়ে পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে তার জেরা চলে। জেরা শেষে যুক্তি-তর্কের পালা। জনাব আবদুল মজিদ মুন্সী, শরফুল ইসলাম মুকুল, মাহবুবর রহমান এম,পি, সৈয়দ মিজানুর রহমান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ আইনজীবীগণ চমৎকার যুক্তি তর্ক প্রদান করেন। ওবায়েদ ও মঞ্জুও তাদের বক্তব্য রাখে। সকলের শেষে জজ সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি আমার যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করি। সমস্ত প্রাণ ঢেলে সেদিন ১টি ঘন্টা যুক্তি-তর্কের আলোকে মামলাটির বিশ্লেষণ শেষে নিজেদের নির্দোষীতার কথা বর্ণনান্তে পূর্বের দাবী প্রতিধ্বনি করি। তদন্তকারী কর্মকর্তার বিচার, জেল কর্মকর্তাদের বিচারে আনয়ন এবং আমাদেরকে অন্যায় হয়রানির বিচার প্রার্থনা করে শেষ করি। উপস্থিত প্রতিটি মানুষ সাংবাদিক আইনজীবীগণ, কর্মকর্তাসহ সকলে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, এ ধরনের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তারা বহুদিন শোনেনি।

সমস্ত যুক্তিতর্ক শেষ হলে ২০০৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রায়ের তারিখ ধার্য্য করেন জজ সাহেব। আমরা অধীর আগ্রহে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকি। সমস্ত বিচারকার্য পর্যালোচনান্তে বিগত বৎসর গুলোতে আমাদের তিন জনের দ্বিধাহীন বিশ্বাস জন্মেছে এই মামলায় একজন সাক্ষীও যেখানে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে নি সেখানে মামলা থেকে আমাদের সসম্মান খালাশপ্রাপ্তি সময়ের বিষয় মাত্র। কিন্তু কোথায় কী কলকাঠি নড়ে ওঠে আমরা বুঝে উঠতে সক্ষম হই না। শোনা যায়, অঘটন ঘটাতে পারদর্শী আইনমন্ত্রী আবার নেপথ্যে সক্রীয় হয়ে উঠেছে। সেই দিন রায় হয় না। ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৪ সাল অবিশ্বাস্য ও অশ্রুতভাবে আরও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য হয় ঠাকুরের পক্ষে এক

www.pathagar.com

নতুন দরখাস্ত পেশ করার প্রেক্ষিতে। বিচারালয়সমূহে অশ্রুত এই ধরনের দরখাস্তর উপরে সেইদিন বাক বিতণ্ডায় অতিবাহিত হয়। আমরা বিফল মনোরথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। ঠাকুরের উপর আমরা হাড়ে হাড়ে চটে উঠি। তার জবানবন্দীর বরাত দিয়েই আমাদেরকে এই মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আজ যখন প্রায় অর্ধ যুগ ভোগান্তির পর মুক্তির আশায় দিন গুনছি তখন পুনরায় তার কারণেই কাজটিতে বিঘ্ন ঘটছে। ঠাকুর সব দিক থেকেই আমাদের জন্য অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরের প্রার্থনা মতে Further Evidence এর জন্য পুনরায় ২৯শে সেপ্টেম্বর ধার্য হয়। কিন্তু সেদিনও প্রার্থিত অতিরিক্ত সাক্ষ্য যোগার হয় না। জজ সাহেব অসীম ধৈর্য্যে সমস্ত বিষয়টি আইনানুগ পন্থায় সমাধানের পক্ষে বিধায় বেশ কয়েকদিন দেখে রায়ের চুড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করেন ২০শে অক্টোবর ২০০৪ সাল।

সেইদিন আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমর্থক সহযোগীদের পদচারণায় জেল গেটের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। রায়ের জন্য ধার্য প্রতিটি দিনই প্রায় একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শত শত সাংবাদিক ও আলোকচিত্রশিল্পী সমগ্র স্থানটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। আজ সব দিক থেকেই আয়োজন বিশাল। সকলেই জেনেছে, আজ রায় হবে। আর তারিখ পরার সুযোগ নেই।

আমার দীর্ঘ দিনের সুখ-দুঃখের সাথী এবং বিশ্বস্ত কর্মী মাসুদ ষ্টীলজাত দ্রব্যের ব্যাবসায়ের ভাল করেছে। সে একটি নতুন প্রাডো গাড়ী কিনেছে। আবদার করল, আজ তার গাড়ীতে চড়ে কোর্টে যাতায়াত করতে হবে। অর্ধডজন গাড়ীতে মাইনউদ্দীন, আনোয়ার, কাদের, দেলোয়ার, সমিজ, দুলাল, রাজু, আরিফ, মালেকসহ অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে আমরা সাড়ম্বরে সেদিন কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শত শত ক্যামেরা ঝলসে ওঠে। সাংবাদিকগণ ঘিরে ধরে। পূর্বে থেকে সেখানে উপস্থিত শুভানুধ্যায়ী ও কর্মীবাহিনী আমাদেরকে দেখামাত্র উল্লাসে ফেটে পরে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে মেশিনের ভিতর দিয়ে আনোয়ারসহ কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হই।

যথাসময়ে সম্মনিত জজ সাহেব আদালতে এসে আসন গ্রহণ করেন এবং রায়ের সূচনা বক্তব্য পেশ করে তার লিখিত ফুলস্কেপ কাগজের ৩৭৩ পৃষ্ঠার টাইপ করা রায়ের নির্যাস আমাদেরকে পড়ে শোনান। পলাতক আসামীসহ মোট ২০ জনের সকলকে হত্যার ষড়যন্ত্র বা

www.pathagar.com

দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারায় বেকশুর খালাস দেন। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৫ জনকে বেকশুর খালাস এবং ১৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা প্রদান করেন। তাদের মধ্যে থেকে তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা প্রদান করেন। এই লেখার শেষ পর্যায়ে রায়টির আদেশ অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে।

জজ সাহেব আসন ছেড়ে উঠে গেলে কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে ও ওবায়েদকে তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি প্রদানের অনুরোধ জানায়। ওবায়েদ আবেগাপ্লুত হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি ওদের বিরুদ্ধে মামলা করব।

আমি বিনম্র চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার শোকর আদায় করে বলি, আমাদের মত আর কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে যেন ভবিষ্যতে আর কোন দিন এমনি হিংস্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে না হয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তরা এসে সবিনয়ে বলে, স্যার এত মানুষ নীচে জড় হয়েছে যে আপনাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। মানুষ ক্রমাগতই বাড়ছে। অনুগ্রহ করে আপনারা গিয়ে গাড়ীতে বসুন এবং বাসায় চলে যান। আমরা আপনাদের নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের কর্তব্য শেষ হবে। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, শুভানুধায়ী ও বিশাল জনতার ব্যূহ ভেদ করে আমাদের কর্মীরা আমাদেরকে মাল্যভূষীত করে। আনন্দ-উল্লাশে তারা ফেটে পরে। আলীঙ্গন আর করমর্দন শেষ হতে চায় না। চারদিকে গগণবিদারী জয়ধ্বনি। বহু কষ্টে গাড়ীতে আরোহণ করে আমরা আজ হৃষ্ট চিত্তে বাসায় ফিরে আসি।

সর্ব প্রথম দিনা দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আজ অবশ্য তার মুখে হাসি। হাসি-কান্নার সে অপরূপ ছবি সালেহা, রানার বউ রিমি এবং আমার শ্যালিকা মিলির মুখেও দেখতে পাই। তারাও আমাকে জড়িয়ে ধরে তাদের হৃদয়ের সব অনুভূতি প্রকাশ করে।

ধীরে ধীরে এক বিশাল কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর দল বাসায় সমবেত হয়। ফুল, ফল আর মিষ্টির ছড়াছড়ি। টেলিফোনে সর্বাগ্রে রানাকে জানাই। সে Thank God বলে আনন্দে আর কথা বলতে পারে না। তার অশ্রু ও আনন্দজনিত ক্রন্দনধ্বনি সুদূর আমেরিকা থেকে ইথারে ভেসে আসে।

কয়েকদিন পর বাসায় এক বিশাল দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে

www.pathagar.com

কর্মীরা। রোজার মাস বিধায় ইফতার এবং রাতের খাবার এক সঙ্গে প্যাকেট করে প্রদান করা হয়। আনোয়ার, মাসুদ, আজহার, দুলাল, সমিজ, সুলতান প্রমুখ সুচারুরূপে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ এক বিশাল সমাবেশে সেদিনও খোদাউন করিমকে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করে সংক্ষিপ্ততম ভাষণে এ কথাই পুনর্ব্যক্ত করি যে, ভবিষ্যতে যেন কোন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিরূপতার কারণে আমাদের মত এমনি নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করতে না হয়।

মামলাটির রায় পাঠ করার পর আমার বার বারই মনে হয়েছে এই রায়টি যদি সম্পূর্নরূপে এই লেখ্যর অন্তর্ভুক্ত করতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ওটা একটা বিরাট প্রকাশনা হয়ে দাঁড়াবে এবং এ যুগের সংক্ষিপ্ততায় বিশ্বাসী পাঠককুল তা পরিহার করার প্রয়াস পাবেন। কিন্তু তারপরও অতীব জরুরী অংশ আলোচনায় না আনলে রচনা অসমাপ্ত থাকবে এবং তাতে ত্রুটি থেকে যাবে।

জজ সাহেবকে যে কি পরিমাণ মেধা খাটাতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এই বিশাল বিষয়টিকে আইনানুগ পরিণতিতে যবনিকা টানতে যে কি ভীষণ পড়াশুনা করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। তাকে সব ধৈর্য ধরে শুনতে হয়েছে, সমস্ত দলিলপত্রাদি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। জবানবন্দী, জেরা এবং যুক্তিতর্ক মনোযোগ নিয়ে শ্রবণ করে স্বহস্তে লিখতে হয়েছে এবং মূল ধর্তব্য বিষয়সমূহ নোট করতে হয়েছে। শুনানীকালে আইনের যে সব গ্রন্থের রেফারেন্স এসেছে সে সব নিষ্ঠার সাথে পড়তে হয়েছে। রেফারেন্সের বাইরেও সিদ্ধান্তে আসার সার্থে আইনী পুস্তকাদি এবং দেশ-বিদেশের উচ্চতর আদালতসমূহের সংশ্লিষ্ট রায়সমূহ পড়তে হয়েছে এবং শেষে সব লিখিত আকারে প্রস্তুত করে তার ঐতিহাসিক রায়টি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

এই মামলাটি ভিন্ন প্রকৃতির তা পূর্বেই নিবেদন করেছি। আসামীরা, বিশেষ করে আমরা তিনজন, সর্ব অবস্থায়ই মামলাটি চলার পক্ষে ছিলাম। কেননা, আমরা জেলখানার অভ্যন্তরে মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও কলঙ্কময় এই হত্যাকাণ্ডের বিচার সর্বদাই দাবী করে

www.pathagar.com

এসেছি। কিন্তু প্রকৃত খুনীদের আড়াল করার মানসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদগ্র লালশায় আমাদের মত নির্দোষ লোকদের জড়িত করার কারণে যে জাল-জালিয়াতি এবং রহস্যজনক অপকর্মসমূহ এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সংঘটিত করেছে তাতে মূল মামলাটির ক্ষতি সাধিত হয়েছে। স্বীকৃত ৯ জন ঘাতকের মধ্যে মাত্র একজন বিচারে সোপর্দ্দ হয়েছে। জেলখানার সেদিনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যারা প্রত্যক্ষভাবে অবৈধ পন্থায় ঘাতকদের সাহায্য-সহযোগিতা করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়েছে তাদেরকে আসামী করার আমাদের দাবী ছিল যৌক্তিক এবং স্বোচ্চার। কিন্তু তারা আসামী না হয়ে তদন্তকারীর কল্যাণে সাক্ষী হয়ে এসেছে।

মামলার শুরু থেকেই মামলার ব্যাপারে আমরা ক্ষমতাধারীদের রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলে এসেছি এবং তদন্তকারীর বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা রুজু করার জন্য কোর্টে আইনানুগ অভিযোগ এনেছি। সচরাচর এমনটি হতে দেখা যায় না। তাই প্রায় সমস্ত বিবেচনায় মামলাটি একটি বিশেষ মামলা এবং নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যারা দেশকে স্বাধীন করেছেন এমন চারজন প্রথিতযশা জাতীয় নেতাকে যে ভাবে নিরাপদতম হেফাজতের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে তা ভাবলেও শরীর শিহরিয়া ওঠে। মানুষের কল্পনার বাহিরে এই নাটকীয় হত্যাকাণ্ড। সারা পৃথিবীর মানুষ, বিশেষত রাজনৈতিক মহল, গভীর আগ্রহে এই মামলার পরিণতির দিকে তাকিয়েছিল। এ নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রচুর বইপত্র লেখা হয়েছে। তাই জজ সাহেবকে অমানসিক পরিশ্রম করে এর যবনিকা টানতে হয়েছে। বাদী পক্ষের ৭৫ জন সাক্ষীর মধ্যে মোট ৬৪ জন আদালতে এসে সাক্ষ্য দিয়েছে। বাকীরা হয় মৃত না হয় অসুস্থতাজনিত কারণে আদালতে উপস্থিত হতে সম্পূর্ণ অপারগ। এই ৬৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ২০জন আসামীর ক্ষেত্রে কতটা কি ভাবে প্রযোজ্য তা পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করে জজসাহেবকে তার সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে এবং তা প্রতিবারই বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয়েছে। কমপক্ষে ৬৪ কে ২০ দিয়ে গুণ দিলে যত হয় প্রায় ততবার আইনের প্রয়োজনে বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে। আজ যদি সে সব এখানে তুলে ধরতে চাই তাহলে সেগুলো কেবল বার বার চর্বিত চর্বণ বলে অনুভূত হওয়া যেমন দোষের হবে না, তেমনি অত কথা টেনে আনাও পাঠকদের ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার হয়ে পরা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তবুও রচনাটির সঠিকতার স্বার্থে এবং তথ্যভিত্তিক করার দায়িত্ব অনুধাবন করে কিছু কিছু বক্তব্য, তা যতই বিরক্তকর এবং বার বার বলার মত শোনাক না কেন, তুলে ধরতেই হবে।

মামলাটির এজাহার সম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি। তদন্তকারী তার উপর অমার্জনীয় 'অপারেশন' চালিয়ে মূল এজাহার গায়েব করে, নিজ হাতে আর একটি তৈরী করে, তার টাইপ কপির ফটো কপির ফটোকপি দ্বারা ইচ্ছামত মামলাটিকে ২১ বৎসর পর কর্তাদের ইচ্ছায় নুতন করে চালু করতে গিয়ে অনেক কাণ্ড-কীর্তি করেছে যেগুলো দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ। জাল-জালিয়াতি দ্বারা আরম্ভ করা মামলা মূলেই দোষযুক্ত হয়ে পরে। মামলার প্রথম থেকেই এটা আমাদের বক্তব্য এবং আমরা আইওর বিরুদ্ধে বিধিমত অভিযোগও করেছি। সেসব অভিযোগ সমূহের মিমাংশা না করে মূল মামলা নিষ্পত্তি করলে ত্রুটি থেকে যাবে তাহাও নিবেদন করেছি। কিন্তু আওয়ামী আমলে চারটি বৎসর আমাদের বক্তব্যসমূহ কেবলই নথিবদ্ধ হয়েছে, বিচারে আসেনি। চার বৎসর পর তাদের বিদায়ের পর দেখা গেল সাক্ষী-সাবুদ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং আমরা প্রথম দিন থেকেই জানি এবং দাবী করে আসছিলাম ওরা আমাদেরকে জড়াবার উদ্দেশ্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন ইনশাআল্লাহ কোন অবস্থাতেই আদালতে আমাদেরকে এই মামলায় দোষী স্বাব্যস্ত করতে পারবে না। দই প্রস্তুত করতে হলে পানি মিশ্রিত হলেও কিছু দুধ লাগবে। নির্জলা মিথ্যা ধোপে টেকে না। প্রায় অর্ধ যুগ কেটে গেছে মামলার মার্চ পাষ্ট করতে করতে। তাই আমরা সেটির সমাপ্তি চাচ্ছিলাম আন্তরিকভাবে। মামলাটি রায়ের দিকে গতি পাক এটি তখন আমাদের অতীব কাম্য হয়ে উঠেছিল। আর কত কষ্ট করা যায়। সে কারণেই অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত আমরা তেমন জেরা করি নাই। যা করেছি তা সংক্ষিপ্ত। যুক্তিতর্কের সময়ও একই নীতি অনুসরণ করেছি। তাই ঠাকুরের পক্ষে রায়প্রদানের মাহেন্দ্রক্ষণে, কার ইঙ্গিতে জানি না, Further evidence এর নামে সময় ক্ষেপণের যে প্রচেষ্টা চলছিল তাতে আমরা যারপরনাই বিরক্ত ছিলাম।

বাদী পক্ষ ৬৪ জন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত করান। উহার মধ্যে ১০ জন সাক্ষী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৭জন সাক্ষী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ৮ জন সাক্ষী বঙ্গভবনের সাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৫ জন

www.pathagar.com

সাক্ষী নিহত চারনেতার আত্মীয়-স্বজন, ৫ জন সাক্ষী আওয়ামী লীগের নেতা, ৮ জন সাক্ষী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ১৪ জন সাক্ষী পুলিশ কর্মকর্তা ও পুলিশ বিভাগের সদস্য, ৬জন সাক্ষী ডাক্তার ও মেজিষ্ট্রেট এবং একজন সাক্ষী পাবলিক।

ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারের সাক্ষীগণ মৃত খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মৃত মাহবুবুল আলম চাষী, ক্যাপ্টেন মোসলেম, কর্নেল রশীদ, কর্নেল শাহরিয়ার, কর্নেল ফারুক গংদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। বঙ্গভবনের ৮ সাক্ষী এবং অন্যান্য কয়েকজন সাক্ষী উপরোক্ত আসামীগণসহ অপরাপর কতক আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রথম অভিযোগটি বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ১২০-বি ধারা, অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের ধারা। সকল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এ ধরনের যে, তারা খন্দকার মোশতাকের শাসন পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভবনে বসিয়া ২-১১-৭৫ তারিখ গভীর রাত্রে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জেলে বন্দী চার জাতীয় নেতাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বঙ্গভবনে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর লোকদের দ্বারা উক্ত কার্য সমাধা করে। সে কারণে প্রত্যেক আসামীকে দণ্ড বিধির ১২০বি ধারায় অভিযুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ ৩০২/১০৯ ধারা, অর্থাৎ পরস্পরের যোগসাজশে হত্যাকাণ্ড ঘটানো। অভিযোগ বলা হয় সকল আসামী এবং মৃত মোশতাক আহমেদ ও মাহবুবুল আলম চাষী '৭৫ সালের ২রা নভেম্বর দিবাগত রাত্রের শেষভাগে বা ৩রা নভেম্বর ভোর রাত্রে রিসালাদার মোসলেম ও অপর ৪ সেনা সদস্যকে সশস্ত্র অবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করিয়া চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমেদ ও এ,এইচ, এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সিদ্ধান্ত দেন। খন্দকার মোশতাক গং টেলিফোনের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘাতকদের প্রবেশের ব্যাবস্থা করিয়া দেন। সেই মতে মোসলেম ও তার সঙ্গীগণ কারাগারে প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত চার নেতাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। উপরোক্ত আসামীদের সহায়তা তথা প্ররোচনায় উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সকল আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় দফা অভিযোগ হচ্ছে— উপরোক্ত দুই দফায় বর্ণিত ষড়যন্ত্র, পূর্ব পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ভোর ৪টা হইতে ৫টা ৩৫মি. মধ্যে মোসলেম ও তার সঙ্গীরা চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং পরে বেয়নেট চার্জ করিয়া ৪ নেতার হত্যা নিশ্চিত করে বিধায় আসামী মোসলেমও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় অভিযোগ আনিয়া বিচারে সোপর্দ করা হয়।

উপরোক্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে সাক্ষী সাবুদ গ্রহণান্তে জজ সাহেব তার রায়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের জের ধরিয়া জাতীয় চার নেতার হত্যার ব্যাপারে সকল ২০ জন আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০বি ধারায় অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। সকল আসামীই ফোজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা কালে নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী পূর্বক বক্তব্য রাখেন। কেউ কেউ কিছু দলিল বা কাগজপত্রও পেশ করেন। আমরা তিনজন উপরোক্ত পরীক্ষার সময় বলি, নিহত চার নেতা আমাদের প্রিয় নেতা ছিলেন। তাহাদের নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিয়া দেশকে স্বাধীন করি। আমরা জেল হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল মন্ত্রীদের সহ কেবিনেট থেকে পদত্যাগ করি এবং বিচার দাবী করি। আমরা পরিপূর্ণভাবে নির্দোষ, আমাদেরকে মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে। আমরা সুবিচার প্রার্থী। আমাদের পক্ষ থেকে একথাও বলা হয় যে, অত্র মামলা শুরু হওয়ার ৭৫০ দিন পর রহস্যজনকভাবে আমাদেরকে হটাৎ করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।

আদালতের সম্মুখে প্রশ্ন জাগে উল্লেখিত সকল আসামী বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কিনা এবং তাহার জের ধরিয়া ষড়যন্ত্র ক্রমে আসামীগণ মোসলেম ও তার সঙ্গীদের দ্বারা ঐ চার নেতাকে হত্যা করিয়াছেন কিনা। জজ সাহেব এই মর্মে সর্বাগ্রে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করেন। এক নম্বর সাক্ষী বাদী ঢাকা জেলের তদানীন্তন ডিআইজি আউয়াল সাহেব, দ্বিতীয় সাক্ষী জেলর আমিনুর রহমান এবং তিন নম্বর সাক্ষী আইজি প্রিজনস্ জনাব নুরুজ্জামান। এরা তিন জনই বঙ্গভবন হইতে প্রাপ্ত টেলিফোনের বরাত দিয়া বলেন, ঘাতকরা সেখান থেকে এসেছে এবং রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই তাহাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করা হইতে চার নেতার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ঘাতকদের দোষ যতখানি, জেলখানার এই তিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দোষ তার চাইতে কম নয়। এদের জবানবন্দী ত্রুটিপূর্ণ, ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী এবং জানা যায় এদেরকে পূর্ব হইতে বন্দী ছিনতাই হবে বলে বঙ্গভবন এবং অন্যত্র থেকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। ৩নং সাক্ষী আইজি, সেই ভয়াল রাত্রে গাড়ী পাঠাইয়া ১নং সাক্ষীকে জেল গেটে আনেন বিধায় নিসন্দেহে প্রমাণ হয় তার সঙ্গে ইতিপূর্বে কোন না কোন ব্যক্তির টেলিফোন বা অন্যভাবে যোগাযোগ হয়েছে। জজ সাহেবের আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে রায়ের ২৫ পৃষ্ঠায় একথা বিধৃত আছে। বাদীর সাক্ষ্যে মোসলেম, মেজর রশীদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদের নাম আদালতের সামনে আসে। অন্য কোন আসামীর নামই উল্লেখিত হয় না। জেলগেটে নাম লেখার কোন বইও আদালতে আনে না। যদিও সাক্ষ্যে বলে যে ঘাতকদেরকে গেট রেজিষ্টারে সে সই করিয়েছে।

১নং সাক্ষী বাদী আউয়ালের সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক একস্থানে জজ সাহেব বলতে বাধ্য হন যে তাহার সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটাইবার পূর্বে তিনি এবং ৩নং সাক্ষী আইজি নুরুজ্জামান সাহেব অবশ্যই জানতেন যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ রাত্রে হত্যা করা হইবে। কিন্তু বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী তাহা অজ্ঞাত কারণে গোপন করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। বিষয়টি যে গোপন করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি অন্যদিকে নুরুজ্জামান সাহেবকে বাঁচাইবার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। মোসলেম এবং অন্যান্য ঘাতকগণ সকলেই ১ নং সাক্ষী, জেলর এবং আইজির পরিচিত ছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে মোসলেমের নাম ছাড়া ১নং সাক্ষী অন্য কারো নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ মর্মে কোন তদন্ত করেন নাই বা কোন কোন ব্যক্তি ছিলেন উহা জানার চেষ্টা করেন নাই। উপরোক্ত আলোচনা হইতে এবং ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কথা তিনি, জেলর এবং আইজি নুরুজ্জামান সাহেব অবগত ছিলেন। রায়ের ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, এই সাক্ষী জেরায় বলে যে ১৯৭৫ সনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কোন ফটোষ্ট্যাট মেশিন ছিল না। এজাহারের যে ফটোকপি আদালতে দাখিল করা হইয়াছে বা প্রদর্শনি হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে উহাতে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই। এজাহারের ফটোকপিতে যে সকল কথা লিখা আছে উহার

www.pathagar.com

কোন অক্ষর তাহার হাতের লিখা নহে। এজাহারের ফটোকপিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কোন সীল নাই, কোন মেমো নাম্বার বা তারিখ নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার নিকট শেষ যে এজাহারের কপি জব্দ করেন তাহার মেমো নম্বার ভিন্ন। ১নং সাক্ষী আউয়াল সাহেব, যিনি মামলার এজাহার করেছেন, বলেন ইহা সত্য যে যাহারা আসামী হিসাবে ডকে আছেন তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন নাই বা এজাহার দায়ের করেন নাই। তিনি সাক্ষ্য প্রদান কালে জেরাতে এমন কোন বক্তব্য উপস্থাপন করেন নাই যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে রশীদ ও মোসলেম ছাড়া অন্য কোন আসামী জেল হত্যাকণ্ডের পূর্বে হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন যে মোসলেম ব্যাতীত অন্য কোন আসামীর নাম এজাহার ভুক্ত করেন নাই।

মাননীয় জজ সাহেব ১নং সাক্ষীর বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপনের কারণে তার নিকট এই মর্মে সন্দেহ জাগে যে কেন্দ্রীয় কারাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপরোক্ত তিন ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পূর্বে হইতেই অবগত ছিলেন। জজ সাহেব আরও প্রমাণ পান ঘাতকদের দ্বিতীয় ব্যাচ্‌টি চার নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য জনৈক এ, আলী নিজে দস্তখত করিয়া ভোর ৫-২৫ মিনিটে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে এবং ৫-৩৫ মিনিটে ঐ একই ব্যক্তি এ, আলী নিজে দস্তখত করিয়া কারাগার পরিত্যাগ করে।

এই এ, আলী এবং তার সঙ্গীয় ঘাতকগণের উল্লেখ এজাহারে নাই এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাও ওদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

বিজ্ঞ জজ সাহেব তার রায়ে বলেন ১নং সাক্ষীর জবানবন্দী বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কার্য্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে প্রদত্ত তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করিলে মোসলেম, রশীদ, খন্দকার মোশতাক এবং এ, আলী হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই জানিতেন বলিয়া প্রকাশ পায় এবং বাকী সকল আসামী যে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল উহা প্রকাশ পায় না। তদন্তকারী কর্মকর্তা অজ্ঞাত কারণে এ, আলীকে আসামীভুক্ত করেন নাই।

এই পর্যায়ের আদালতে নিকট প্রশ্ন জাগে ঘটনার তারিখ, সময় ও এজাহারের বিষয়বস্তু প্রস্তুত ও এনডোর্স করতঃ কে উহা পরবর্তীতে

www.pathagar.com

তৈরী করিয়াছেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা উহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়া উহার উপর ভিত্তি করিয়া তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা পরবর্তীতে অত্র মামলার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাজেই এই প্রদর্শনী ভিত্তিহীন বলিয়া প্রকাশ পায়। আদলতে দাখিলকৃত প্রদর্শনী ৭ (গেট রেজিষ্টার) এবং প্রদর্শনী ৮ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ১নং সাক্ষী ও আইও আসামী এ, আলীর নাম চার্জসিট ভুক্ত না করিতে সহায়তা করিয়াছেন বা তদন্তকারী কর্মকর্তা অজ্ঞাত কারণে আসামী এ, আলীকে আসামীভুক্ত করেন নাই।

অতি সংক্ষিপ্ত আকারে রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী বা ঢাকা জেলের তদানীন্তন জেলর জনাব আমিনুর রহমানের সাক্ষ্যের কিছু কিছু অংশ পর্যালোচনা করলে ধরা পরে যে তিনি, সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা এবং ঐ এলাকায় কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষী ও কর্তব্যরত অন্যান্য কারারক্ষীদের সহায়তায় চার নেতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে একত্র করেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন জেলকক্ষে থাকতেন। ইতিপূর্বে এই পাঁচজন সশস্ত্র ঘাতককে তিনি যে জেল গেটে রিসিভ করে ভিতরে ডি,আই,জির অফিস রুমে নিয়ে বসান এবং সকলকে অকুস্থলে নিয়ে গিয়ে চারনেতার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিতে যাবতীয় সাহায্য, সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ সহায়তা দান করেন তাহা বলাই বাহুল্য। পরে জেলখানায় ৪ জনের আর একটি ঘাতকদল আসে এবং নেতাদের দেহগুলি বেয়নেট চার্জ করে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে, এ সব ঘটনাই ২নং সাক্ষী জেলর সাহেবের জানা ঘটনা কেননা তার সাক্ষ্যতেই প্রকাশ পায় তিনি এবং সুবেদার ওয়াহেদ মৃধা ঘাতকদের সঙ্গে দৌড়াইয়া অকুস্থলে যান।

জেলর সাহেবকেও পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়েছিল জেলখানায় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাহাদের সতর্কতার ধরন প্রমাণ হয়েছে। জেলরের সঙ্গে ঘটনার সময় আরও কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী যেমন ডেপুটি জেলর আঃ জাহিদ, মোঃ তৈয়ব আলী মোল্লা, মোঃ আবদুর রউফ, মোঃ আমানউল্লাহ এবং মোঃ ইকবাল হোসেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একই সাথে জেলগেটে উপস্থিত থাকিয়াও কারাবন্দী চার নেতাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা করার চেষ্টা করেন নাই। অত্র সাক্ষীর উপরোক্ত সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি সহ তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং কারাগারের আরও কর্মকর্তা ও কর্মচারী হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পূর্বে

www.pathagar.com

তাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের সহিত যে জড়িত ছিলেন বা জানিতেন উহা প্রতীয়মান হয়।

চার নেতার হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের বিষযে তিনি ও তাহার সঙ্গীরা প্রাথমিক অবস্থায় জানিয়াও যথাযত কর্তৃপক্ষকে যেমন স্বরাষ্ট্র সচিবকে অবহিত করেন নাই। এই সবই আদলতে জেরার সময়ও প্রকাশ পায়। জেলর সাহেব তার সাক্ষ্যে কোন কোন অংশে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়াও আদালতের সামনে প্রকাশ পায়। তাহার সাক্ষ্যতে আসামী ফারুক, শাহরিয়ার রশীদ এবং ডালিমের নাম তথাকথিত প্ররোচনা, সহাযতা ও ষড়যন্ত্রে ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইলেও মামলার অন্য সমস্ত আসামীগণ হত্যাকাণ্ডের পূর্বে তথাকথিত প্ররোচনা সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায় না। বাদী পক্ষের অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী তদানীন্তন আইজি প্রিজনস্ জনাব নুরুজ্জামান। তিনি সাক্ষ্যে বলেন, ঐ সময় ফারুক, রশীদ, ডালিম এবং শাহরিয়ার বঙ্গভবন হইতে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদের বরাত দিয়া কিছু রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে খবরাখবর নিতেন এবং নির্দেশ প্রদান করিতেন। সাক্ষী নুরুজ্জামান জেলখানার সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার সাক্ষ্যেও পূর্বে সতর্ককরণ, সতর্ককরনের পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, ডিআইজি কে নিজে গাড়ী পাঠাইয়া আনাইয়া ঘটনার সময় জেলর এবং অন্যান্যদের লইয়া জেল গেটের সংলগ্ন অফিসে ঘাতকদের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা, সেই আলোচনায় ঘাতকদের চার নেতাকে হত্যার সদম্ভ ঘোষণা দান অবহিত হওয়া, ইহা নিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা শেষে ঘাতকদের লইয়া অকুস্থলে গমন এবং তাহার নির্দেশে জেলর ও তার অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা নেতাদেরকে পৃথক পৃথক কক্ষ হইতে হত্যার উদ্দেশ্য এক কক্ষে একত্র করন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রতক্ষ করণ, হত্যাশেষে ঘাতকদেরকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া এবং পরবর্তী ঘাতকদের আর একটি দল আসিয়া নেতাদেরকে বেয়নেট চার্জ করিয়া হত্যা নিশ্চিত করিবার কথা সবই প্রকাশ পায়। তিনি ১নং ও ২নং সাক্ষীর উল্লেখিত আসামীদের নাম ব্যাতীত অত্র মামলার অন্য কোন আসামীর নাম কোন প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেন না। তিনি ঘটনার অনেক পরে ডিআইজি সহ স্বরাষ্ট সচিবের নিকট গমন পূর্বক তাহাকে সব জানান এবং নির্দেশিত হইয়া একটি রিপোর্ট দেন। পরদিন বঙ্গভবনে

www.pathagar.com

গমন পূর্বক খালেদ মোশাররফ সহ তিন সেনাবাহিনীর প্রধানকে সব ঘটনা জানান বলিয়া প্রকাশ পায়। নির্দেশিত হইয়া তারা লিখিত বক্তব্য দেন এবং তাদের বক্তব্য সেনাবাহিনীর লোকেরা টেপ করিয়া রাখে বলিয়া জানান। বিজ্ঞ আদালত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আইজির বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। আদালতে তিনি মেজর ফারুক, মেজর রশীদ, মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ারের কথা বলিলেও এজাহারে তাহাদের কথা উল্লেখ নাই। এমন কি খন্দকার মোশতাকের নামও সেখানে উল্লেখিত হয় নাই। দেখা যায় মেজর রশীদ ও মোশতাক আহমেদের নির্দেশে ক্যাপ্টেন মোসলেম নামের ব্যক্তিটিকে জেলগেটে পৌছামাত্র তাহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন।

আদালত মনে করে, ১ হইতে ৩নং সাক্ষীসহ কারাগারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত কারারক্ষীরা কখনো কাহারো অবৈধ আদেশ পালনে বাধ্য নহে বলিয়া তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারাই প্রকাশ পায়। চার নেতার উপর নৃশংসভাবে গুলীবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর ১নং সাক্ষীর জবানবন্দী অনুযায়ী প্রথম ঘটনার এক ঘণ্টা পর এ, আলী নামক এক নায়েকের নেতৃত্বে ৪/৫ জন অস্ত্রধারীর অস্ত্রসহকারে দ্বিতীযবার কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বেয়নেট চার্জ করে এবং চার নেতার মৃত্যু নিশ্চিত করিয়া কারাগার হইতে চলিয়া যায়। ১ হইতে ৩ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় বার নায়েক এ, আলী সহ ৪/৫ অস্ত্রধারীকে পুনরায় বেয়নেট চার্জ করিতে সুযোগ করিয়া দেওয়া এবং মৃত্যু নিশ্চিত করিতে সহায়তা করার অর্থ মেজর রশীদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ কর্তৃক তথাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রের সহায়তা করা বা হত্যায় সহযোগিতা করা একইরূপ অপরাধ। এজাহারে ঘটনার পূর্বে মেজর রশীদ বা খন্দকার মোশতাক আহমেদের নির্দেশনার কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় না।

কোর্ট আরও লক্ষ করে ৩নং সাক্ষী আইজির আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাহার বক্তব্যের সহিত প্রর্দশনী-১ মানে এজাহারের ফটোকপি, প্রদর্শনী-২ মানে ডিআইজি কর্তৃক আইজিকে প্রেরিত প্রতিবেদন হইতে প্রদশনী-৩ মানে সন্দীপ হইতে প্রাপ্ত এজাহারের আর এক ফটোকপিতে বর্ণিত ঘটনার কোন মিল পাওয়া যায় না।

বাদী পক্ষের ৫ নং সাক্ষী কারাগারের সেন্ট্রী সালাহউদ্দীন

www.pathagar.com

শিকদারের সাক্ষ্য অনুযায়ী আর্মির সশস্ত্র ব্যক্তিগণ প্রধান ফটকে প্রবেশ করিতে চাহিলে কোনরূপ বাধা না দেওয়ার জন্য তিনি কারাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশ পান এবং বাদী পক্ষ্যের ১ হইতে ৪ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা উক্ত বিষয়ের সত্যতা প্রকাশ পায়। জেলরের বাসার ছাদের উপরে অর্থাৎ গেটের উপরে ২৪ ঘণ্টা সশস্ত্র ব্যক্তিরা পাহারারত থাকিলেও উক্ত সশস্ত্র ব্যক্তিরা বহিরাগত সশস্ত্র ব্যক্তিদের প্রধান ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঘটনার রাত্রিতে ২টি গাড়ীতে বিডিআরের সদস্যরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থান করিতেছিল কিন্তু তাহারাও ঐ সশস্ত্র আর্মিদের কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশে কোনরূপ বাধা দেয় নাই। আইজি প্রিজনস্ এর নির্দেশে তাহারা আর্মির সশস্ত্র ব্যক্তিদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয়। সরকার পক্ষের ৭নং সাক্ষী ডেপুটি জেলর মোঃ আবদুর রউফের জবানবন্দী ও জেরা হইতেও ইহা প্রকাশ পায় না যে ক্যাপ্টেন মোসলেম ব্যতীত আর্মির অন্য কোন সদস্য ঘটনার তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন, বরং তার সাক্ষ্য হতে ইহা প্রকাশ পায় যে ১-৩ নং সাক্ষীগণ ঘটনার পূর্বে হইতেই হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন। জেল কোডের বিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন নাই। সাক্ষ্যমতে কারাগারে ঘটনার কালে পাগল ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেও কারাগারে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যে যার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় নাই বা নেতাদের হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের কোন পদক্ষেপ নেয় নাই।

নায়েব আলী, ঐ সময়ের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধন কারা রক্ষী যিনি ঘটনার সময় অকুস্থল অর্থাৎ নিউ জেলে কর্তব্যরত ছিলেন। সে সাক্ষ্য দেয় নিদ্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে আইজি, ডিআইজি, জেলর, ডেপুটি জেলরগণ, সুবেদার প্রমুখ কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সশস্ত্র ঘাতকদের নিয়া নিউ জেলে উপস্থিত হয়, নেতাদের একত্রকরণ পূর্বক তাহাদিগকে হত্যা করিবার সর্ব ব্যাবস্থা সুচারুরূপে পালন করে। পরে বেয়নেট চার্জ করে নেতাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার ঘটনাও সে বিবৃতি করে। সে আরও নিবেদন করে, তাকে জেলর সাহেব ১নং ওয়ার্ড, যেখানে নেতারা থাকিতেন, খোলার আদেশ দেন। তখন তিনি বলেন যে তাহার কাছে ২০০/৩০০ চাবি, তিনি উক্ত চাবি চিনেন না। তখন সুবেদার সাহেব, যিনি নিজেও একজন সাক্ষী, চাবির থলি তাহার কাছে নিয়া জেলর সাহেবের নির্দেশে ১ নং ওয়ার্ড খুলেন। প্রধান কারারক্ষী ওয়ার্ডের চাবি

www.pathagar.com

চিনবেন না কিন্তু তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুবেদার তা চিনবেন বা জানবেন এটা স্বাভাবিক নয়। সেখানে সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দীন সাহেব থাকতেন। জেলরের নির্দেশে ১নং ওয়ার্ডের ফালতুদের অন্যত্র সরিয়ে ২নং ওয়ার্ড ও ৩ নং ওয়ার্ড খুলিয়া জনাব কামরুজ্জামান ও জনাব মনসুর আলীকে ১নং ওয়ার্ডে একত্র করেন। পরে চার নেতাকে গুলি করিয়া হত্যা এবং বেয়নেট চার্জ করিরা মৃত্যু নিশ্চিত করার কথাও সাক্ষী নিবেদন করেন।

মাননীয় বিচারক তাহার রায়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় এই মত ব্যক্ত করেন যে ৯ নং সাক্ষী তাহার জেরাতে স্বীকার করিয়াছে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় জেলর, ডেপুটি জেলর, জেলসুপার ডিআইজি, আইজি ১ নং সেলের সামনে উপস্থিত ছিলেন। তাহার এইরূপ বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে উপরোক্ত সরকারী কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বেআইনী আদেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করিয়া হত্যাকাণ্ডে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করিয়া হত্যাকাণ্ডটি ঘটাইয়াছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই পুলিশের লোক বিধায় তাহাদেরকে বাচানোর জন্য অত্র মামালায় আসামীভুক্ত করেন নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রকৃত অপরাধীদের পর্দার আড়ালে রাখিয়া তদন্তকার্য সম্পন্ন করেন। জেরাজালীন তাহার বক্তব্যে ইহা আরও পরিষ্কার হয় যে তিনি হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে পাশ কাটাইয়া আসামী না করিয়া তদন্তকার্য্য সমাধা করেন। আদালতের সামনে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ তাহার তদন্তে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিয়াছেন।

কারাগারের সাক্ষীগণ ক্যাপ্টেন মোসলেমের নাম হত্যাকারী হিসাব বলিলেও বাকী হত্যাকারীদের নাম তাহারা গোপন রাখিয়াছেন এবং নিজেদেরকে বাচাইবার জন্য ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তথাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রকারীদের অপরাপর নাম তাহারা আদলতের সামনে প্রকাশ করেন নাই।

১ হইতে ৩ নং সাক্ষী অত্র মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে তাহারা অত্র মামলার হত্যাকাণ্ডের জড়িত আরও প্রকৃত হত্যাকারীদের বিষয় গোপন রাখিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সাক্ষীগণকে যথাযথভাবে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসাবাদ করিলে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তথাকথিত প্ররোচনা, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রকারীকের নাম ও হত্যাকারীদের নাম উক্ত সাক্ষীগণের দ্বারাই প্রকাশ পাইত। কিন্তু তিনি এবং উক্ত সাক্ষীগণসহ প্রায় সকলেই পুলিশের লোক বিধায় তাহাদেরকে আসামী না করিয়া বাচানোর জন্য সাক্ষী হিসাবে আদালতের সামনে উপস্থাপন করিয়াছেন।

১০ নং সাক্ষী আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রবীণ নেতা জনাব আবদুস সামাদ সাহাবের সাক্ষ্যর বিষয় পূর্বাহ্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে, তিনি কোর্টকে জানান সেদিন লক আপের পর কিছু আর্মি অফিসারকে জেলখানা ভিজিট করিতে দেখেন এবং তাহাদের সামনে দিয়া তাহাদেরকে যাইতে দেখেন। ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে দিবাগত রাত ৩টা হইতে ৪ টার মধ্যে জেলখানায় পাগলাঘণ্টা বাজানো হয়। ইহার পর তৎকালীন আইজি, ডিআইজি, এবং জেলরের সাথে কিছু মিলিটারী অফিসারকে দেখিতে পান। তিনি স্পষ্টভাবে এমন কিছুই বলেন নাই যে খন্দকার মোশতাক আহমেদ কোন কোন আর্মি অফিসারসহ তাহার মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নিয়া বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আটককৃত ৪ নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করেন। সামাদ সাহেব তার আটক সহ অন্যান্য সকলের আটকের বিষয় আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিলেও উহার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে মেজর ডালিম, মেজর রশীদ, তাহের উদ্দীন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে তিনি নিজের গা বাচাইয়া অত্র মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তিনি তাহাদের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার বিষয় স্পষ্ট কোন কিছু আদালতে সামনে উপস্থাপন করেন নাই। তিনি দায়সারা সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন মাত্র। তাহার সাক্ষ্য দ্বারা হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে কোন আসামীর জড়িত থাকার বিষয় প্রকাশ পায় না। তিনি আওয়ামী লীগের প্রবীণতম ব্যক্তি এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য হইয়াও অত্র মামলায় জড়িত আসামীগণের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হন। সম্মানিত বিচারক মতিউর রহমান সাহেব তাহার রায়ের ৮১ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাবে বলেন সামাদ সাহেবের সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রকাশ পায় না যে কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতা হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সহিত কিংবা হত্যাকাণ্ডের সহিত আসামী চার সাবেক প্রতিমন্ত্রী জড়িত ছিলেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নং সাক্ষী মোখলেসুর রহমান তাহার সাক্ষ্যে বলেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার দিন বিকাল তিনটায় সে আমাদের চার প্রতিমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির কক্ষে দেখে। একজন টাইপিষ্ট বিনা অনুমতিতে কখনোই রাষ্ট্রপতির কক্ষে ঢুকিতে পারে না। আমরা চারজন সহ অন্যান্য আর্মি অফিসারদের সেখানে দেখার বিষয়টি নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত এবং তদন্তকারীর শিখানো। বিষয়টি প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের বিধি বিধানের পরিপন্থি বলিয়া জজ সাহেবের নিকট প্রতীয়মান হয়। আদালতের সামনে জবানবন্দী প্রদানকালে সে যে আর্মি অফিসার ও কতেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জড়াইয়া অসত্য ও শিখানো কথা বলিয়াছে আদালতের কাছে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ২-১১-৭৫ তারিখে সন্ধ্যায় পর আসামী মোসলেম কর্তৃক তাহাকে আর্মি অফিসাদের বৈঠকে ডেকে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তাহাদের মতলব ফাঁস করার কোন যৌক্তিকতা নেই। হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কথাও তাহাকে শুনাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার সব বক্তব্য মিথ্যা বলিয়া কোর্টের বিশ্বাস জন্মে। ইহা তাহার পদপদবী ও কর্তব্যের বিপরীত মুখী। এই সাক্ষী যে শিখানো মতে কিছু কিছু সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে তাহা আদালতের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঘটনার দিন রাত ৯ ঘটিকায় আমরা চার প্রতিমন্ত্রী মিলিটারী সেক্রেটারীর রুমে উপস্থিত থাকা এবং এমএসপি টেলিফোনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের বিষয়ে কথা বলিয়া তার শয়নকক্ষে প্রেরণ প্রভৃতি কথা যা এই সাক্ষী বলে তা সত্যের অপলাপ ব্যাতীত কিছুই নয়। রাত ৯টায় বঙ্গভবনে দেখা বেআইনী নয়, কিন্তু বিষয়টি সর্বৈব মিথ্যা। মোশতাকের সঙ্গে যাদের এত খাতির তাদেরকে এমএসপির তদবিরে তাহার কাছে যেতে হবে নাটকের এই দৃশ্যটি সবটুকুই সহকারী পিএ বা টাইপিষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ২৬ বৎসর পর সাক্ষ্য দেবে এটা নিতান্তই হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাহার বক্তব্য কোর্ট বিশ্বাস করে না। সে বঙ্গভবনের খুটি নাটি জানে কিন্তু মোশতাক মন্ত্রীসভার আমাদের ৪ সদস্য ছাড়া আর কাউকে চেনে না। ইহা কখনোই সত্য হইতে পারে না।

বঙ্গভবনের অন্য আর কোন সাক্ষী আমাদের তিনজন সম্বন্ধে একটি কথাও কোর্টে বলে না। তারা অবশ্য অন্যান্য আসামীদের সম্বন্ধে পুলিশে প্রদত্ত বক্তব্যই পুর্নব্যক্ত করে। তাদেরকে প্রচুর জেরা করা হয় এবং জেরাতে প্রচুরতর অসামঞ্জস্যতা ও গড়মিল পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

নিম্নপদস্থ এই সমস্ত অপাঙ্‌তেয় সাক্ষীদের জবানবন্দী মতে তথাকথিত ষড়যন্ত্রের বিষয় মোটেই উদ্‌ঘাটিত হয় না। এই প্রকৃতির লোকজনকে সাক্ষ্য রাখিয়া জাতীয় চার নেতা হত্যার পরিকল্পনা কোন পাগলেও করে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ১১ নং সাক্ষী মোখলেসুর রহমানের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় না যে আমরা কেহ জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষযে কোন আলাপ আলোচনা করি বা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম। সম্মানিত আদালত ১৩ নং সাক্ষী খেদমতগার সাখাওয়াত হোসেনের বক্তব্য প্রনিধান পূর্বক মন্তব্য রাখেন, খন্দকার মোশতাক আহমেদ মেজর রশীদের সাথে যে সমস্ত কথবার্তা বা আলোচনা করিয়াছেন উহা ১৩ নং সাক্ষীর মিটিং রুমে শোনা বাস্তবতার পরিপন্থি। খেদমতগারের দায়িত্ব শুধু আপ্যায়নের জিনিসপত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া। রাষ্ট্রপতির সামনে কোন অবস্থাতেই তার দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ নাই। কাজেই প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মেজর রশীদকে প্রশ্ন করা এবং উত্তরে মেজর রশীদ মোসলেমসহ তাহার লোকজন কারাগারে বাইরে বলিয়া তার শুনা সংক্রান্ত প্রদত্ত বক্তব্য মিথ্যা বই সত্য নহে। সে তাহার জেরাতে স্বীকার করিয়াছে যে রাষ্ট্রপতির রুমে মিটিং চলার সময় সে বাহিরে ছিল। যদি তাই হয় তাহা হইলে মিটিং-এ কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা তাহার শোনার কথা নয়। তবে পরিপার্শ্বিকতা দিয়া এবং তাহার সাক্ষ্যের কোন কোন অংশ বিশ্বাস করিলে দেখা যায যে মেজর রশীদও মোসলেম উদ্দীনের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের পূর্বে এবং পরে কথাবার্তা হইয়াছিল। উহার দ্বারা প্রকাশ পায় যে উভয়েই হত্যাকাণ্ডের পূর্বে ও পরে বিষয়টি জানতেন।

কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা রান্না ঘরের সেই সময়ের ডিউটি রেজিষ্টার জব্দ করেন নাই। তাহার এইরূপ ত্রুটির কারণে ইহা সহজে অনুমেয় নয় যে এই সাক্ষী খেদমতগার হিসাবে ঐ সময়ে কর্তব্যরত ছিল।

আওয়ামী লীগের আমলে স্বরাষ্ট মন্ত্রী বাদী পক্ষের ১৪ নং সাক্ষী মোহাম্মদ নাসিম, নিহত মনসুর আলী সাহেবের পুত্র, তার সাক্ষ্য অবশ্যই প্রণিধান যোগ্য। পূর্বেও কিঞ্চিৎ বিবৃত হয়েছে। সে অনেক মিথ্যার অবতারণা করে। এটা শুধু আমাদের উপলব্ধি নয়, বাদী পক্ষের অন্যতম সাক্ষী নিহত সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রধান নিরাপত্তা ও রাজনৈতক বিষয়ক কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুব আল্ করিম আদালতে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, নাসিম কিছুই জানে না কেননা বঙ্গবন্ধু হত্যার পর

www.pathagar.com

পরই সে ভারতে পালিয়ে যায়। সে যা কিছু বলেছে তা সত্যের অপলাপ।

জনাব করিমের বক্তব্য বাদ দিলেও মোঃ নাসিমের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞ কোর্ট কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেন দেখা যাক। আদলত মনে করেন, তাহার জবানবন্দীর প্রথম অংশ সঠিক ও সত্য বলিয়া ধরিয়া নিলেও জবানবন্দীর উক্ত অংশ দ্বারা ইহা প্রকাশ পায় না যে কে, এম, ওবায়দুর রহমান কিংবা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন অসৎ উদ্দেশ্যে কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়া তাহার পিতার ৩০নং হেয়ার রোডস্থ বাসার গিয়াছিলেন কিংবা টি এন্ড টির বাসায় গিয়াছিলেন। বরং তাহার জবানবন্দীর প্রথম অংশ হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও কে, এম, ওবায়দুর রহমান তাহার স্বীকৃতমতে তাহার পিতার জীবন রক্ষার জন্য বাসায় আলাপ আলোচনার জন্য গিয়াছিলেন। এই সাক্ষী আরও বলেন যে তাহার পিতাকে উপরোক্ত আসামীদ্বয় নিরাপদস্থানে নিয়া যাওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন নাই যে উপরোক্ত আসামীদ্বয় ষড়যন্ত্র করিয়া এবং চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহার পিতার সরকারী বাসভবনে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসামীদ্বয়ের তাহার পিতার প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল বলিয়া দেখা যায়। উপরোক্ত আসামীদ্বয় তাহার পিতার সন্ধানে বাহির হওয়ার পর তাহাদের মধ্যে যদি তিনি চাতুরতা বা ষড়যন্ত্রের আভাস পাইতেন তাহলে তিনি তাহার পিতার নিরাপদ স্থান তাদেরকে দেখাইতেন না বা তাদেরকে নিয়া যাইতেন না। উপরোক্ত আসামীদ্বয় সহজ ও সরলভাবে তাহার পিতার নিকট গিয়াছিলেন উহাই প্রকাশ পায়। এই সাক্ষী বলে না যে, উপরোক্ত আসামীদ্বয় সহ অন্য আসামী নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং তদানীন্তন আইজি পুলিশ নুরুল ইসলাম তাহার পিতাকে মোশতাকে সরকারে যোগদানের জন্য কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্গভবন থেকে এম, মনসুর আলী ফেরত আসার পর খন্দকার মোশতাকের তাহার বরাবর আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায় না যে উপরোল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ কোনরূপে কোন প্রকার তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ কোনরূপ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকিলে বঙ্গভবন হইতে তাহার পিতার ফিরিয়া আসা খুব সহজ হইত না।

বিজ্ঞ কোর্ট এই সাক্ষীর বক্তব্য পর্যালোচনা পূর্বক এই অভিমতে

www.pathagar.com

আসেন যে, তিনি একজন কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা সহযোগিতা ও যোগসাজসের ব্যাপারে আদালতের সামনে যে রূপ সাক্ষ্য প্রদান করা উচিত ছিল ঐরূপ প্রদান করিতে সক্ষম হন নাই। জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয় আদলতের সামনে সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারী, প্ররোচনাকারী, সহায়তাকারী ও যোগসাজসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আদালতের সামনে সেরূপ সাক্ষ্য হন নাই। জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয় আদালতের সামনে সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারী, প্ররোচনাকারী, সহায়তাকারী, ও যোগসাজসী সকল ব্যক্তিদের নাম আদালতের সামনে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে অত্র মামলার সকল আসামীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদানে সমর্থ হন নাই।

তিনি জেরাতে স্বীকার করিয়াছেন যে জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ব্যাতিরেকে কারাগারের জেল ফটক খোলা যায় না বা কারাগারের প্রবেশ করা যায় না। তাহার ঐরূপ সাক্ষ্য সত্য ধরিয়া লওয়া হলে তৎকালীন কারা কর্তৃপক্ষ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল বলে উহা প্রকাশ পায়। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাদের অত্র মামলায় আসামীভুক্ত করেন নাই। তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে কর্নেল রশীদ, কর্নেল ফারুক এবং মৃত খন্দকার মোশতাক আহমেদ ঘটনার সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

১৫ নং সরকারী সাক্ষী মোঃ আলি আশরাফের সাক্ষ্য সম্বন্ধে মাননীয় বিচারক মন্তব্য করেন, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট যে জবানবন্দী দিয়াছেন উহা আদালতের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তার স্মরণ ছিল না। তাহার জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি আদালতের সামনে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য ও সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং অনেক বাস্তব সত্য গোপন করিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই তাহার আদালতের সামনে সাক্ষ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে উহা আদালতের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন এবং বিতর্ক থাকিয়া যায়।

বঙ্গভবনের কর্মচারী ১৬ নং সাক্ষী আঃ কাইউম চৌধুরীর জবানবন্দী হইতে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না যাহা দ্বারা আদালত অনুধাবন করিতে

www.pathagar.com

পারে যে আসামীগণ ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে শেষ রাত্রে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে তাহারা জড়িত ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে তিনি বঙ্গভবন হইতে তর্কিত সময়ের কোন কাগজ পত্রই জব্দ করেন নাই। তাহার তদন্ত মারাত্মক ত্রটিপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞ জজ সাহেব অবশ্য অনুধাবন করেন, এই সাক্ষী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্র ও যোগসাজসের ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য আদালতে উপস্থাপন করেন নাই।

১৭ নং সাক্ষী খান মোহাম্মদ আলি অলক, রাষ্ট্রপতির পিএ হিসাবে বঙ্গভবনে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত মেজর ফারুক, মেজর রশীদ, মেজর শাহ্ রিয়ার, মেজর ডালিম, মেজর আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন মোসলেম ১৫ই আগষ্ট ৭৫ থেকে বঙ্গভবনের বিভিন্ন ভিআইপি রুমে থাকিতেন। তাহের উদ্দীন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ সব সময় এক সঙ্গে থাকিতেন। অত্র মামলায় দেখা যায় মোশতাক মন্ত্রিসভার কতেক মন্ত্রীকে অত্র মামলায় আসামীভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের তর্কিত সময়ে বা ঐ সময়ের পূর্বে রাষ্ট্রপতির বঙ্গভবনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের যাতায়াতের কোন এন্ট্রি রেজিষ্টার তদন্তকারী কর্মকর্তা বঙ্গভবন হইতে জব্দ করিয়া উহা প্রমাণের চেষ্টা করেন নাই। বঙ্গভবনে প্রবেশ এবং উহার অভ্যন্তরে চলাফেরার একটি বিধি বিধান আছে। মন্ত্রীদের নামও এন্ট্রি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইত। খান মোঃ অলকের সাক্ষ্যেও আমাদের তিন প্রতিমন্ত্রীর নাম কোথাও উল্লেখ হয় নাই। বঙ্গভবনের অপর খেদমতগার সরকার পক্ষের ২৮ নং সাক্ষী মানিক মিয়াও তার সতীর্থদের মতই সাক্ষ্য দেয়। সে উল্লেখিত আর্মি অফিসারদের বঙ্গভবনে দেখে এবং ২-১১-'৭৫ তারিখের কথিত সভায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মেজরগন, তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও মাহবুবুল আলম চাষীকে দেখতে পায়। সে আমাদের তিন জনকে দেখে নাই। বিজ্ঞ বিচারক অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করেন, রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সঙ্গে কথা বলিতে বা আলাপ করিতে দেখা বা বঙ্গভবনে ঘোরাফিরা করার অর্থ এই নয় যে জেলখানায় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে তাহারা সম্পৃক্ত ছিলেন। খেদমতগারের পক্ষে পেন্ট্রিতে থাকিয়া মিটিং রুমে কি

www.pathagar.com

হইতেছে বা কি মিটিং হইতেছে ঐ সমস্ত তাহার দেখার বা শোনার সুযোগ থাকার কথা নয়। প্রেসিডেন্টের মিটিং রুমে বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তিই কোন ক্রমে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা হইলে কি করিয়া সে মোশতাকের সঙ্গে থাকিয়া অন্যান্য আর্মি অফিসারদের হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে তাহাদের জড়িত থাকার কথা বলে! একজন পেন্টিকে সামনে রাখিয়া মোশতাক সাহেব মেজর রশীদকে "জেলখানায় কে যাইবে", তাহার ঐরূপ বক্তব্য আদালতের কাছে হাস্যকর বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাক্ষী বঙ্গভবনের সেদিনের যে চিত্র তুলিয়া ধরে এবং আর্মি অফিসারদের মদ্যপান হইতে বঙ্গভবনে নানাবিধ অপকর্মের উল্লেখ করিলেও আদালতের কাছে চার নেতার হত্যার ব্যাপারে পরস্পর শোনার কথা দ্বারা আসল হত্যাকারীদের কথাকথিত ষড়যন্ত্রের কথা এবং আসল হত্যাকারীদের নাম তাহার কর্তৃক গোপন রাখা প্রকাশ পায়। সে অবশ্য একথাও বলিয়াছে যে তাহের উদ্দীন ঠাকুরসহ আর্মি অফিসারগণ মাহবুবুল আলম চাষী এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ তথাকথিত ষড়যন্ত্র করিয়া চার নেতাকে হত্যা করিয়াছে। তাহার জবানবন্দী এবং জেরা পর্যালোচনার পর আদালতের নিকট ইহাই স্পষ্ট হয় যে কে, এম, ওবায়দুর রহমান, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এই হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন না।

আদালত তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি রহস্যজনকভাবে এই সমস্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য বানাইলেও এই সাক্ষীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কম্পট্রোলারকে সাক্ষী করেন নাই। ষ্টুয়ার্ড, বাটলার যারা সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিকট যাইতে পারেন তাহাদিগকেও সাক্ষ্য করেন নাই। এই সাক্ষীর আদালতের সামনে সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে আসামী ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দিন, মারফত আলী শাহ এবং আবুল হাসেম মৃধা হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল।

বাদী পক্ষের ১৯ নং সাক্ষী সরকারের পাট মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব আসাদউজ্জামান। ঘটনার সময় তিনিও বন্দী ছিলেন এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিউ জেলে ছিলেন। তার সাক্ষ্য অনুযায়ী জেলর সাহেব হত্যাকারীদের কিংবা হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের সকল বিষয় পূর্বে জানিলেও অজ্ঞাত কারণে মেজর রশীদ ও খন্দকার মোশতাকের নাম ছাড়া অন্য কাহারও নাম আদালতের

www.pathagar.com

সামনে প্রকাশ করেন নাই। তাহার জবানবন্দী ও জেরা হইতে হহা প্রমাণ করে না যে আসামীভুক্ত চারজন তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রী হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সাথে কোনভাবে জড়িত ছিলেন। তাহার সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ পায় যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কন্ট্রোল রুমে মেজর ডালিম ও মেজর রশীদ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের নিয়া আসিয়া ছিলেন। উল্লেখ্য চার নেতা এবং অন্যান্য অনেককে কারাগারে প্রেরণের পূর্বে এই পুলিশ কন্ট্রোল রুমে আনা হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন সাক্ষীর বক্তব্যে প্রকাশ পায় ।

বাদী পক্ষের ২১ নং সাক্ষী কমোডোর গোলাম রব্বানী বঙ্গভবনের একমাত্র কর্মকর্তা সাক্ষী। জাতীয় চার নেতাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুম হইতে কারাগারে প্রেরণের বিষয়ে তাহার বক্তব্য পরস্পর বিরোধী ও অসমর্থিত বলিয়া কোর্টের মনে হয়। কোর্ট মন্তব্য করেন, তিনি একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা হইয়া এই বিষয়ে যে তিনি আদালতের সামনে অসত্য কথা বলিয়াছেন উহা তার সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়। তবে তাহার সাক্ষ্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে উপরোক্ত আর্মি অফিসারগণ আর্মি কমাণ্ড বাইপাস করিয়া তাহারা বঙ্গভবনে অবস্থান নেন। তাহাদিগকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলেও শেষ পর্যন্ত ফিরাইয়া নিতে ব্যর্থ হয়। তাহার জবানবন্দী হইতে একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয় এই মর্মে যে রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মারফত ও ল্যান্স দফাদার মৃধা এবং তাহাদের সঙ্গীয়রা স্বশস্ত্র অবস্থায় মোশতাক আহমেদের পার্সোনাল গার্ড হিসাবে ছিলেন।

কমোডোর গোলাম রব্বানীর সাক্ষ্য পুনঃ পর্যালোচনার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালত তার রায়ের ১২১ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন তোলেন রাষ্ট্রপতি এবং এই সাক্ষীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বুঝা যায় যে তিনি এবং রাষ্ট্রপতি উভয়েই জানিতেন গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যরা ঐ রাত্রে কেথাও যাইবে বা যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে গিয়াছেন কিনা। আরও বুঝা যায় যে তিনি এবং মোশতাক আহমেদ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে বঙ্গভবন হইতে ঐ রাত্রে গার্ডদের কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। গার্ডরা কোথায় যাইবে এবং কি করিবে তাও তিনি জানিতেন বলিয়া প্রকাশ। যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কথা তিনি এবং মোশতাক আহমেদ সহ অনেকে সরাসরি জানিতেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ব্যাপারে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া এবং

www.pathagar.com

এই সাক্ষীকে আসামী না করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সাক্ষী করিয়ছেন মাত্র বলিয়া প্রকাশ পায়। তিনি বঙ্গভবনে অবস্থান করিতেন ইহা স্বীকৃত হইলে রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মারফত, ল্যান্স দফাদার মৃধা এবং তাহাদের আরও কয়েকজন সঙ্গীকে সশস্ত্র অবস্থায় নিচে আসিয়া দেখিলে তাহাদের সকলকে তাহার কর্তৃক না চেনার কথা নয়। তিনি শুধু ৩ জন সশস্ত্র ব্যক্তির নাম ছাড়া বাকীদের নাম আদালতের সামনে প্রকাশ করেন নাই। পরক্ষণে মারফত আলি সহ বঙ্গভবন হইতে দেখার অর্থ এই রাত্রে ঐ সময়ে তাহার পরিচিত সকল সশস্ত্র ব্যক্তিরাই বঙ্গভবন হইতে যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন। তাহার জবানবন্দী হইতে আরও দেখা যায় যে আরও কতেক আর্মি অফিসারদের বঙ্গভবনের বাহিরে যাইতে তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়া বলেন নাই যে সশস্ত্র আর্মি অফিসাররা এবং ঐ ব্যক্তিরাই কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি রহস্যজনকভাবে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয় এবং এই হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাম আদালতের সামনে গোপন রাখিয়াছেন। তবে তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মারফত আলি এবং ল্যান্স দফাদার মৃধা জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন এবং তাহারাই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছেন। তাহার জবানবন্দী হইতে প্রকাশ পায় যে তাহারা ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখে বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাহারাই জাতীয় ৪ নেতাকে প্ররোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে হত্যা করাইয়াছিলেন। তিনি ডকে উপস্থিত কর্নেল ফারুক, কর্নেল শাহ্‌রিয়ার এবং মেজর খায়রুজ্জামানকে ঐরূপ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারে সনাক্ত করেন। তাহার জবানবন্দীতে ইহা প্রকাশ পায় যে আসামী চার তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রী জড়িত ছিলেন না। মেজর খায়রুজ্জামানকে বঙ্গভবনে দেখিলেও কোন কিছু আলোচনা করিতে দেখেন নাই। তাই মেজর খায়রুজ্জামানের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐরূপ জড়িত থাকার ব্যাপারে আদালতের সন্দেহের উদ্রেক করে। কর্নেল ফরুক যে অপরাপর আর্মি অফিসারদের সাথে ঐ রাত্রে বঙ্গভবনের বাহিরে গিয়াছিলেন তাহাও তিনি বলেন নাই। কাজেই তাহার হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে আদালতের সন্দেহ জাগে। কর্নেল শাহ্‌রিয়ারের

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারেও তিনি স্পষ্ট কোন কিছু বলেন নাই। ৭-১১-'৭৫ তারিখে সিহাহী বিপ্লবে খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান মুক্তি লাভ করেন বলিয়া তিনি জানান। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং ব্রিগেডিয়ার নজমুল হুদা নিহত হন। তাহার জেরাকালীন সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডটি রাজনৈতিক এবং কতেক আর্মি অফিসারের উচ্চাকাংখাসহ বেশ কয়েকটি কারণের জন্য কিছু সংখ্যক আর্মি অফিসার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্য মতে ইহাও প্রকাশ পায় যে খালেদ মোশাররফ ও তার অনুসারীরা ঐ সময় সরকারের দায়িত্বে থাকিয়া জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সেনা সদস্যদের ৩-১১ '৭৫ ইং তারিখে বিচার না করিয়া বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ঐরূপ সেনা সদস্যদের তথাকথিত কার্যকলাপে সন্তুষ্ট থাকিয়া খালেদ মোশাররফ গং সরকারীভাবে তাহাদের বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং আওয়ামী লীগের দলীয় কোন্দলে তাহাদের ব্যবহার করা হইয়াছিল।

কিছু ফর্মাল সাক্ষী যথা ডাক্তার, পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য মামলার প্রয়োজনে আদালতে সাক্ষ্য দেয়া বিধেয় হলেও এখানে তাদের লইয়া আলোচনা পূর্বক বিষয়টিকে দীর্ঘতর করা অপ্রয়োজনীয়।

বাদীপক্ষের ২৫ নং সাক্ষী প্রক্তন আইজিপি জনাব ই, এ, চৌধুরী বরাবর পুলিশে চাকুরী করিলেও তাহার মত একজন সর্ববাদী সন্মত ভদ্রলোক সহজে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আমরা জেলহত্যা মামলার আসামী হয়ে অনেকের কাছে, বিশেষ করিয়া মামলার সাক্ষীদের কাছে, পচিয়া গিয়াছি বলিয়া কখনো মনে হয়। কিন্তু জনাব ই, এ, চৌধুরী একজন ব্যতিক্রমী ভদ্রলোক। তিনি ডকে দাঁড়াইয়া আমাদের তিন জনের উদ্দেশ্যে স্বশ্রদ্ধ অভিবাদন জানান এবং আমরাও তার নীরব প্রতি উত্তর দিই। অন্য কোন সাক্ষীর নিকট থেকে এ ধরণের সম্মানজনক ব্যবহার আমরা লাভ করিনি।

সে যাই হোক, এখানে আদালতের সামনে তার প্রদত্ত সাক্ষ্যই পর্যালোচনার বিষয়। তিনি বলেন জেল হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি একজন অফিসার পাঠাইয়া সব সংবাদ সংগ্রহ করেন।

www.pathagar.com

মাননীয় আদালত মনে করেন সে সময় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদে থাকিয়া ঘটনার কথা নিজে জানিয়া নিজে সরজমিনে না গিয়া তাহার অধীন একজন কর্মকর্তাকে পাঠাইয়া ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারেন। যাহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার নাম বলেন নাই এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী করেন নাই। সেই ব্যক্তি সাক্ষী হইয়া আসিলে আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় জানা যাইত। এই সাক্ষী এবং তদন্তকারীর এই ধরণের আচরণে তাহাদের প্রতি আদালতের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন আর্মির ঐ দুষ্কৃতিকারী সশস্ত্র ব্যক্তিরা কারা ছিলেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তিনি তাহাদের নাম উপস্থাপন করেন নাই। তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আর্মি অফিসারদের নাম তাহার না জানার কথা নয়। তাহার সাক্ষী হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে তিনি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়া-শুনিয়া স্বরাষ্ট্র সচিবসহ আইজিপিকে নিয়া রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার জন্য বঙ্গভবনে যান। কিন্তু তিনি ঘটনার বিস্তারিত কী জানিতে পারিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রপতিকে কী জানাইবার জন্য তাহারা তিনজন মিলিয়া বঙ্গভবনে গিয়াছেলেন তিনি উহা অজ্ঞাতকারণে আদালত গোপন রাখিয়াছেন (রায়ের পৃষ্ঠা ১২৭)। তাহার সাক্ষ্য হইতে পরিলক্ষিত হয় তিনি চতুরতার সাথে এমএসপি এবং রাষ্ট্রপতির নাম আদালতের সামনে না বলিয়া উহা গোপন করিয়াছেন। এই সাক্ষী অজ্ঞাতকারণে নিজেকে বিতর্কিত না করার জন্য দায়সারাভাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ৪-১১-'৭৫ তারিখে কর্নেল নুরুজ্জামানের টেলিফোনের ডাকে তিনি ক্যান্টনমেন্টে গিয়া এক বৈঠকে ২০/২৫ জন মিলিটারী অফিসারকে দেখিতে পাইলেও নিহত খালেদ মোশাররফের নাম ছাড়া রহস্যজনকভাবে অপরাপর অফিসারদের নাম আদালতে প্রকাশ করেন নাই। তাহার এইরূপ সাক্ষ্য দ্বারা তাহার আচরণ সম্পর্কে আদালতের সন্দেহের উদ্রেক হয়। এই সাক্ষী সকল দিক রক্ষা করিতে গিয়া খুব হিসাব করিয়া বলেন যে ক্যান্টনমেন্টের ঐ কক্ষের ২০/২৫ জন মিলিটারী অফিসার জেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পূর্বে কোন কিছু জানিতেন না। তাহার এইরূপ সাক্ষ্যে ইহা প্রকাশ পায় যে তিনি ঐরূপ ২০/২৫জন মিলিটারী অফিসারের নাম না বলা তাহাদের এবং নিজেদেরকে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে নির্দোষ প্রমাণ

www.pathagar.com

করা এবং নিজেদেরকে ঘটনা হইতে আড়াল করিয়া রাখাই তাহার উদ্দেশ্য। তর্কের খাতিরে তাহার সাক্ষ্য সত্য ধরিয়া নেওয়া হইলেও অত্র মামলাটি আইজি প্রিজন্‌স কর্তৃক দায়ের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অত্র মামলাটি দায়ের করা হয় ডিআইজি প্রিজন্‌স কাজী আবদুল আউয়াল কর্তৃক। এই সাক্ষী যে প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিয়াছেন উহা তাহার সাক্ষ্য হইতে প্রকাশ পায়। বাদী পক্ষের ১-৩ নং সাক্ষী বলেন যে তাহারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে খুনীদের জেলের ভিতরে যাইতে দেন। কিন্তু এই সাক্ষী বলেন যে খুনীরা গায়ের জোরে ভিতরে ঢোকে ও খুন করে। এই সাক্ষী ঐ সময়ের জেলখানার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বিভাগের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখা দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি মোশতাক জেল হত্যাকাণ্ডের একমাত্র হোতা ছিলেন এবং তাহার সাক্ষ্য মতে খালেদ মোশাররফ গংদের কথায় বুঝা যায় যে "ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি কলা খাই না।"

বাদী পক্ষের ২৬ নং সাক্ষী অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সাইফুদ্দিন। ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখে যে বিমানে আর্মি অফিসারদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহার সেফটি পাইলট ছিলেন। তিনি যাত্রীদের নাম বলতে অক্ষম হইলেও ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর জানতে পারেন যে বিমানের যাত্রীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত মেজর রশীদ, মেজর ডালিম, মেজর নূর ও অন্যরা ঐ তারিখে যাত্রী হিসাবে তাহাদের বিমানে ছিল। এবং তাহারাই যাওয়ার আগে জেলখানায় চার নেতাকে হত্যা করিয়াছে। এই সাক্ষী সেফটি পাইলট ছিলেন এই মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন কাগজপত্র কোর্টে পেশ করেন নাই বিধায় এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বক্তব্যের প্রশ্নে তার তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া আদালত মন্তব্য করেন।

বাদী পক্ষের ২৭ নং সাক্ষী রাশেদ মোমাররফ নিহত খালেদ মোশাররফের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বিধায় তাহার বক্তব্য পূর্বে কিছুটা বিবৃত হইলেও তাহার বক্তব্য সম্বন্ধে এখানে রায়ে উল্লেখিত কিছু বিষয় আলোচনার দাবী রাখে। তিনি ১৫ই আগষ্টের ঘটনাকে "আর্মির কু" বলিয়াই জানিতেন। জেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তরে আশ্বাস পান অচিরেই একটা পাল্টা ব্যবস্থা হইবে। বিষয়টা কেবল সময় সাপেক্ষ। রাশেদ মোশাররফ আমাকে নেতা এবং ভাল লোক বলিয়া কোর্টে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু মিন্টু রোডের আমার

www.pathagar.com

তদানীন্তন সরকারী বাসার নম্বর ভুল বলে। আমার বাসা ছিল ২নং মিন্টু রোডে। কিন্তু সে কোর্টে বলে ৫ নং মিন্টু রোড। বাস্তব হচ্ছে সে কখনো আমার বাসায় যায় নাই। কোন আলাপ করে নাই। তাই বাসার নম্বর ভুল বলা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অসত্য বক্তব্যের মতই অস্বাভাবিক নয়।

কোর্ট প্রশ্ন তোলেন, তাহার বড় ভাই খালেদ মোশাররফের নিকট হইতে ঘটনার কথা জানিতে চাহিয়া জানিতে পারেন যে আর্মি দ্বারা একটি "কু" হইয়াছে। তাহার এই সাক্ষ্য সত্য হইলে আর্মি ঐ "কু"তে কে কে জড়িত ছিলেন নিশ্চয়ই তিনি তাহা তাহার বড় ভাই খালেদ মোশাররফের নিকট হইতে জানিতে পারিয়া তাহাদের নাম আদালতে বলা থেকে অজ্ঞাত কারণে বিরত রহিয়াছেন।

কোর্ট তার সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক বলেন, এই সাক্ষী বলিয়াছেন যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন তাহাকে স্নেহ করিতেন বলিয়া তাহার দলে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন কি দল করিতেন উহা বলেন নাই। কিন্তু তাহার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ঐ সময় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন দল করিতেন না। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের দল বলিতে তিনি কোন দল বুঝাইয়াছেন ইহা আদালতের সামনে প্রকাশ করেন নাই। তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা আদালতের নিকট প্রকাশ পায় যে মোশতাক আহমেদ এবং মোসলেমের নেতৃত্বে কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি চার নেতাকে হত্যা করেন। তাহার আদালতের সামনে এইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে জেলখানার চার নেতার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিদের আড়াল করিয়া রাখিয়া নিজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার জবানবন্দী ও জেরা হইতে দেখা যায় যে জেলখানার হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিদের নাম তিনি অজ্ঞাত কারণে ও রহস্যজনকভাবে আদালতের সামনে প্রকাশ করেন নাই। তাহার সাক্ষ্য দায়সারা গোছের প্রমাণিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন পরিচালক জনাব ওয়ালিউর রহমান বাদী পক্ষের ২৮ নং সাক্ষী। তিনি ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখে যে সমস্ত আর্মি অফিসারদের বিদেশে প্রেরণ করা হয় সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া বলেন ঢাকাস্থ বার্মা ও থাইল্যান্ড এ্যম্বেসীদ্বয় হইতে প্লেন যথাক্রমে ওভার ফ্লাই ও অবতরণের জন্য অনুমতি সংগ্রহ করেন। তিনি সেই সব যাত্রীদের প্লেনে তুলে দেবার আনুষ্ঠানিকতায় এয়ারপোর্টেও

www.pathagar.com

যান। তিনি আসামী খায়েরুজ্জামানকে সনাক্ত করলেও এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় না যে বর্তমানে আসামীভুক্ত চার জন তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রীকে এয়ারপোর্টের আশে পাশে ঐ রাত্রে দেখিয়াছেন। তিনি খালেদ মোশাররফের নাম কখনো শোনেন নাই তবে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখ জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান ছিলেন উহা তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে জিয়াউর রহমানকে বন্দী করিয়া খালেদ মোশাররফ একটি "কু" করিয়াছেন বলিয়া পত্রিকাতে দেখিতে পান। তিনি একজন সচেতন ব্যক্তি হিসাবে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখ কিংবা ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখের খালেদ মোশাররফ কর্তৃক "কু" এর ঘটনার বিষয় না জানার কথা নয়। তিনি দুই কুল রক্ষার জন্য কিছু বাস্তব সত্য তাহার সাক্ষ্যে গোপন করিয়াছেন বলিয়া তাহার জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায়।

বাদীপক্ষের ২৯ নং সাক্ষী অবসর প্রাপ্ত কর্নেল সাফায়াত জামিল অবস্থা দৃষ্টে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। সেই কারণেই ইতিপূর্বে তার জবানবন্দী সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করলেও আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী এবং জেরা পর্যালোচনার পুর্বক বিজ্ঞ অদালতের সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি সাক্ষ্যে বলেন ১৫-৮-'৭৫ তারিখে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর এই মামলায় আসামীভুক্ত আর্মির লোকজন এবং আরও অনেকে, যারা নতুন রাষ্ট্রপতির সহযোগী ছিলেন, বঙ্গভবনে অবস্থান করিতেন। ২৯-৮-'৭৫ তারিখের সেনাসদরে একটি মিটিং হয় এবং ঐ মিটিং এ কর্নেল ফারুক এবং মেজর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে তিনি বলেন যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার এবং বিদ্রোহের বিচার হইবে। খন্দকার মোশতাক অবৈধ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহার সুযোগ মোতাবেক তিনি তাহাকে উৎখাত করিবেন। মেজর রশীদ ও কর্নেল ফারুকের উক্ত সভায় উপস্থিত থাকা প্রমাণ করে তারা সেনাবাহিনী চেইন অব কমান্ড মানতেন এবং বঙ্গভবন হইতে বাহির হইয়া সভায় যোগদান করেন। তিনি বলেন ১৯৭৫ সনের অক্টোবরের শেষ দিকে বঙ্গভবনে অবস্থানরত আর্মি অফিসারদের বিভিন্ন ইউনিটে পোষ্টিং দেওয়া হয় কিন্তু ঐ সমস্ত বিদ্রোহী অফিসাররা সেনা সদরের ঐ আদেশ মানে নাই। উপরোল্লিখিত আলোচনা মোতাবেক ইহা সঠিক এবং সত্য বলিয়া দেখা যায় যে ঐ সময় সেনাবাহিনীকে দ্বৈত কমাণ্ডে পরিচালিত হয়। ফার্স্ট লাঞ্চার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ঐ সময় বঙ্গভবনে ছিল এবং আসামী

www.pathagar.com

খায়রুজ্জামান বিদেশ হইতে আসিয়া সেখানে পোষ্টিং পাইয়া বঙ্গভবনে বিদ্রোহী অফিসারদের সাথে অবস্থান করিতেছিলেন। খালেদ মোশাররফ এবং এই সাক্ষী একই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বিদ্রোহী গ্রুপের বিরুদ্ধে ঝাপাইয়া পরার সংকল্প করেন। তাহার স্বীকৃত মতে খালেদ মোশাররফ ঐ সময় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। ১-১০-'৭৫ ইং তারিখে তাহাদের আলোচনা মতে বঙ্গভবনে অবস্থানরত ইন্‌ফেন্ট্রি ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে বঙ্গভবন থেকে প্রত্যাহার করেন। সে রাত্রে ১২-১ টার সময় তাহাদের পরিকল্পনা মাফিক ২ ইন্‌ফেন্ট্রি কোম্পানী ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়া আসে। ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ বঙ্গভবনের সঙ্গে টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করেন। রেডিও, টেলিভিশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২-১১-'৭৫ মধ্য রাত হইতে বঙ্গভবনে অবস্থানরত তথা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত বিদ্রোহী আর্মি অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন সেনা ইউনিটকে তাহাদের অধীনে নিয়ে আসার জন্য সব ধরনের পথ অবলম্বন করেন। এই সাক্ষীর বয়ান অনুসারে প্রথমে টেলিফোনে বাকযুদ্ধ এবং পরে নেগোসিয়েশন টিম পাঠান হয়। একদিকে খালেদ মোশাররফ আর বঙ্গভবনের দিকে প্রেসিডেন্ট মোশতাক, জেনারেল ওসমানী ও মেজর রশীদ। শেষ পর্যন্ত মোশতাক বিদ্রোহীদের 'সেফ প্যাসেজ' দাবী করে, তাহা গৃহীত হয় এবং বিমান বাহিনীর প্রধানের মাধ্যমে তাহাদিগকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়াছেন তাহারা হইলেন মেজর রশীদ, মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার, মেজর নূর, মেজর হুদা, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর আহমেদ শরফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন মাজেদ, লেঃ আনসার, লেঃ কিসমত, রিসালাদার মোসলেম, রিসালাদার সারোয়ার এবং ক্যাপ্টেন জামান। তিনি বলেন ৪-১১-'৭৫ তারিখে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি জনাব ই, এ চৌধুরী তাহার ৮ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদর দফতরে আসেন এবং ঐ সময় তিনি ও অন্যান্যরা জেল হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমেদকে তাহার পদ হইতে সরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাক্ষী তারপর পাল্টা "ক্যু"র ঘটনাবলী বিস্তারিত তাহার মত বলার প্রয়াস পান। সেই দিনই সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে কেবিনেট মিটিং কেন্দ্র করিয়া পাল্টা "ক্যু"র নায়কের যে নাটকের মহরা দেয় তার বর্ণনা না দেওয়াই উত্তম। তারা প্রেসিডেন্টসহ সমস্ত মন্ত্রীদের হত্যা করিতে উদ্যত হয়। জেনারেল

www.pathagar.com

ওসমানীর সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে সে যাত্রা রক্ষপাত এড়ানো হয়। সাক্ষী সাফায়াত জামিল তাহার সাক্ষ্যে অবশ্য স্বীকার করে অত্র মামলার চার রাজনৈতিক নেতা জেল হত্যাকাণ্ডে বিরুদ্ধে কঠোর ও জোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহারা কখনো তাহার সাক্ষ্য মতে হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেন নাই।

সম্মানিত আদালত মন্তব্য করেন, তাহার আদালতের সামনে কথা বলিবার ভঙ্গি ও আচরণ প্রমাণ করে যে তিনি নিজেই আর একজন বিদ্রোহী সেনা অফিসার হিসাবে ২-১১-'৭৫ তারিখে পাল্টা 'ক্যু' এর নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

সাক্ষী তার জেরাকালীন সাক্ষ্যে বলেন যে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ মন্ত্রী মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশ প্রধান, বিডিআর প্রধান, সশস্ত্রবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের আনুগত্য স্বীকার করেন। সে সময় গণচীন, সৌদি আরব, লিবিয়া ইত্যাদি দেশ স্বীকৃতি দেন। তাহার সাক্ষ্যে ইহাও প্রকাশ পায় যে ২-১১-'৭৫ তারিখ রাত্র ১২-১ টার সময় কোন কোন স্থান হইতে সেনাবাহিনী তুলিয়া নেওয়া হয়, আবার কোন কোন স্থানে নতুন ভাবে মোতায়েন করা হয়। এই সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা হইতে আদালতের সামনে যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে উহা হইতে দেখা যায় যে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখ মধ্যরাত হইতে এই সাক্ষী এবং খালেদ মোশাররফ গং একটি পাল্টা 'ক্যু' করিয়া ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখ ভোর বেলা হইতে ৬-১১-'৭৫ তারিখ পর্যন্ত তাহাদের সহযোগী আর্মি তাহাদের ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ৭-১১-'৭৫ ই তারিখের মধ্য রাত্রে সিপাহী জনতার বিপ্লবে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদসহ জিয়াউর রহমান মুক্তি লাভ করেন।

মোশতাক মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী এবং তার খুব প্রিয়ভাজন দেওয়ান ফরিদ গাজী এই মামালার একজন সাক্ষী। তার বক্তব্য মতে নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও সামাদ সাহেব ব্যতীত প্রায় সকলেই মোশতাক মন্ত্রিসভার সদস্য হইয়াছিলেন। জেলখানার চার নেতার হত্যার পরে এই সাক্ষী কার কাছে ফোন করিয়া রাজনৈতিক নেতাদের খোঁজ খবর নেয় তাহার কিংবা তাহাদের নাম বলেন নাই। তিনি ঢালাও ভাবে সাক্ষীর খাতিরে সাক্ষ্য দেওয়া এবং তাহার রাজনৈতিক কারণে আদালতে আসা প্রমাণিত হয়। ৪ রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতার ব্যাপারে কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কে তাহাকে বলিল যে চার নেতা হাউজ এ্যারেষ্ট, বাকীদের মধ্যে কাকে কাকে জেলে পাঠান হয় তাহাদের নাম বলেন নাই। কাজেই আসামী চার প্রতিমন্ত্রী সম্পর্কে তিনি যে সাক্ষী প্রদান করিয়াছেন উহা অরণ্যরোদন ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাক্ষী স্বীকার করিয়া বলেন যে, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ভারতীয় পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়াছিলেন। তিনি জেরাতে আরও স্বীকার করেন বঙ্গভবনে ৪-১১-'৭৫ইং তারিখে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেল হত্যার উপর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং লাশ ফেরত চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলেন, ৪-১১-'৭৫ তারিখের মিটিং এ তিনিসহ উপরোক্ত তিন প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যার ও জেল হত্যার ব্যাপারে লাশ ফেরত চাহিয়া মিটিং-এ জোর প্রতিবাদ করেন। মিটিং এর মধ্যে উপরোক্ত তিন প্রতিমন্ত্রীর নাম কেহ বলেন নাই। সাক্ষ্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি দ্বারাই খন্দকার মোশতাকের সরকার পরিচালিত হয়।

সম্মানিত আদালত তার রায়ের ১৫০ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্তে আসেন, বাদী পক্ষের এই সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর মত জন প্রতিনিধি জেল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বঙ্গভবনের মিটিং-এ জোর প্রতিবাদ করায় উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাহারা কখনও জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে পারে না। আদালতের সামনে উপরোক্ত ৩ আসামীর বিষয় তাহার বক্তব্য তাহাদের জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে কোন রূপ তথাকথিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কিংবা তথাকথিত যোগসাজশের সাথে জড়িত থাকিবার বিষয় কিংবা প্ররোচনা ও সহযোগিতা প্রমাণ করে না। আর্মির লোকদের এই ব্যাপারে বঙ্গভবনে হৈ চৈ করা সত্য হইতে পারে কিন্তু শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল এই কথা সত্য নয় বলিয়া তাহার সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়। তাহার সাক্ষ্য মতে খন্দকার মোশতাক, মেজর ডালিম, মেজর ফারুক, মেজর রশীদ এবং মেজর নূর, খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে জেল হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আসামীদের মধ্যে কোন কোন আসামী জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন তাহা বলিতে পারেন নাই বা বলার চেষ্টাও করেন নাই। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে, চার রাজনৈতিক আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলায় কোন অপরাধের কোন অভিযোগ থাকে না। জজ সাহেব তার সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌছেন, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে অক্টোবর ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন সিলেট বিমান বন্দরের জন্য দশ লক্ষ টাকা দেন এবং ঐ সময় আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং এই সাক্ষী একত্রে হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) মাজারে যান। উহার পর তাহারা ফিরিয়া আসিবার সময় ছালা পড়া একটি লোককে পুলিশ বেষ্টনি ভেদ করিয়া তাহাদের দিকে আসিতে চাহিলে তাহারা তাহাকে ভিতরে আসিতে বলেন। এই ছালাপড়া লোকটি বলেন যে, 'এখন তো মন্ত্রী, যা বেটা যা ঢাকা যা গদি উল্টাইয়া গিয়াছে। মসনদ উল্টাইয়া গিয়াছে, বলে বলেছেন। তাহারা দুইজন ঢাকা ফিরিয়া আসেন এবং এয়ারপোর্টে ঢুকিতেই শোনেন যে 'ক্যু' হইতেছে এবং রাত্রে ঐ 'ক্যু' হইয়া যায়। বাদী পক্ষের এই সাক্ষীর উপরোক্ত বক্তব্য স্বীকার করিলে এই দাঁড়ায় যে আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনার দিন ঢাকায় ছিলেন না। ঘটনার রাত্রে তাহারা সিলেট থেকে ঢাকায় আর্মি কর্তৃক 'ক্যু' এর মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন। তাহার ঐরূপ বক্তব্য সত্য বলিয়া ধরিয়া নিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের প্ররোচনার কিংবা সহযোগিতার ব্যাপারে বাদী পক্ষ যে অভিযোগ করিয়াছেন উহা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

নিহত চার নেতার অন্যতম জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামানের ছোট ভাই এ, এইচ, এম হাসানুজ্জামান এই মামলার সাক্ষ্য দেয়। তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী মেজর ডালিম এবং ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দীন হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। তিনি জেল হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে কিংবা জেল হত্যার সাথে অন্য কোন আসামীকে জড়িত করেন নাই।

বাদী পক্ষের ৩৩ নং সাক্ষী জনাব শমসের মবিন চৌধুরী সরকারের পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে কর্মরত আছেন। ঘটনার সময় তিনি ডেপুটি চীফ

www.pathagar.com

অব প্রটোকলের দায়িত্ব পালন করেন। মাহবুবুল আলম চাষী তাহাকে বলেন যে, আর্মি অফিসারদের বার্মার উপর দিয়া যাওয়ার জন্য ওভার ফ্লাই পারমিশন ও থাইল্যান্ডে ল্যান্ডিং পারমিশন প্রয়োজন। তাহার সঙ্গে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব নজরুল ইসলাম ছিলেন। জেল হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কিংবা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আর্মি অফিসারদের একটি নামের তালিকা বঙ্গভবনে অবস্থানরত মাহবুবুল আলম চাষী তাহার হাতে হস্তান্তর করিলেও প্রকৃত পক্ষে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আর্মি অফিসারদের নাম তাহার সাক্ষ্য হইতে প্রকাশ পায় না। তবে তাহার সাক্ষ্যের শেষাংশ হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে তৎকালীন সরকারের হেফাজতে জেল হত্যাকাণ্ডের পর পরই মেজর ডালিম এবং মেজর নূর বিদেশে অবস্থানরত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সাক্ষী নিজ হাতে মেজর ডালিম এবং মেজর নূর এর নিয়োগপ্রাপ্তি বিলি করিয়াছিলেন।

জেরায় তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী ইংরেজী ৩-১১-'৭৫ তারিখে জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার সময় খালেদ মোশাররফ সামরিক বাহিনীর প্রধান হন বলিয়া প্রকাশ।

বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির আর এক রিসেপশনিষ্ট বাদী পক্ষের ৩৪ নং সাক্ষী মোঃ ইয়াকুব হোসেন খান বঙ্গভবনের তাহার সতীর্থ অন্যান্য সাক্ষীর মতই সাক্ষ্য দেয়। কোর্টে দাঁড়াইয়া সেও আমাদের তিন প্রতিমন্ত্রীর কথা বলে না। তাহার সাক্ষ্য হইতে প্রকাশ পায় যে ঘটনার দিন তাহার বঙ্গভবনে ডিউটি থাকা অবস্থায় মেজর রশীদ, মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন মোসলেম ও অন্যান্য আর্মি অফিসারদের বঙ্গভবনে অবস্থান করিতে দেখে।

৩৫ নং সাক্ষী নিহত নেতা তাজউদ্দীন আহমেদের ভাগ্নে। তিনি জেলখানা হইতে তাজউদ্দীন আহমেদের মৃত দেহ আনয়ন করেন। সে সময় ডিআইজি ও আইজির নিকট জানিতে পারেন যে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক ও মেজর রশীদের নির্দেশে বঙ্গভবন হইতে সেনাবাহিনীর লোকজন আসিয়া জেলখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার মামা তাজউদ্দীন আহমদসহ ৪ জাতীয় নেতাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। বঙ্গভবন হইতে কোন কোন সেনা অফিসার জেলখানার ভিতরে গিয়া হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেন উহা তাহার সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ

www.pathagar.com

পায় না। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ইহাও প্রকাশ পায় না যে আসামীরূপে ডকে অবস্থানরত তদানীন্তন চার প্রতিমন্ত্রী জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নিহত তাজউদ্দীন আহমেদের ভাগিনা হইলেও জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত এবং জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল আর্মি কর্মকর্তাগণের নাম সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অজ্ঞাত কারণে জেল হত্যাকাণ্ডের কথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত এবং জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কতেক আর্মি অফিসারদের নাম প্রকাশ করেন নাই বলিয়া দেখা যায়।

৩৬ নং সাক্ষী সিমি হোসেন রিমি নিহত তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা, তাহার সাক্ষের এক পর্যায়ে বলে যে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মেজর রশীদ, মেজর ডালিম, মেজর ফারুক ঐ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে যাহারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তাহাদের সবার নির্দেশে ক্যাপ্টেন মোসলেমের নেতৃত্বে ৪/৫ জনের একটি ঘাতকদল জেলখানায় ঢুকিয়া গুলি ও বেয়নেট চার্জ করিয়া এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন বঙ্গবন্ধু বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলে তাজউদ্দীন সাহেবকে আর সরকারে দেখা যায় না। সাক্ষীর মতে সরকার থেকে পদত্যাগ করেও তাজউদ্দীন সাহেব সংসদ সদস্য ছিলেন তবে আওয়ামী লীগের কোন পদে ছিলেন না এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সরকারী কোন পদে ছিলেন না। নিহত জনাব কামরুজ্জামানের লুকিয়ে থাকা অবস্থায় তার সাথে আসামী ওবায়দুর রহমানের কথিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞ আদালত মনে করেন ঐ সময় তার সহিত দেখা করা অপরাধের কিছু না বরং ইহা স্বাভাবিক। এই সাক্ষী নিজে ব্যক্তিগতভাবে ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিয়া যে অনুসন্ধান চালায় উহা তাহার ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত অনুসন্ধানের সাথে তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট মিল পাওয়া যায় না।

এই সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা আলোচনা অনুযায়ী ইহা প্রকাশ পায় যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থা হইতেই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা এবং মুজিব বাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল এবং উহার ফলশ্রুতিতে বাগডোগরায় বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের

www.pathagar.com

একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের পাতা হইতে এই ঘটনাটি মুছিয়া ফেলার নহে। এই সাক্ষী ইহা স্বীকার করে যে, ঐ সময় বাংলাদেশ সরকারের বিপরীতে মুজিব বাহিনী নামে একটি বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপরোক্ত দুই বাহিনীর কারণে বাংলাদেশ সরকার ও তাজউদ্দীন আহমেদের মধ্যে কিছু না কিছু বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইতিহাস এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী কে, এম, ওবায়দুর রহমান, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের তাহার পিতার সাথে সুসম্পর্ক ছিল। উক্ত সুসম্পর্কের কারণে তাহারা জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনরূপ জড়িত থাকতে পারে উহা আদালতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই সাক্ষী সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেন নাই যে উপরোক্ত ৩ জন আসামী জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদের সরকারে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। তবে উক্ত কারণে জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া শতকরা ১০০ ভাগ বিশ্বাস করা যায় না। জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে শুধু কতিপয় পথভ্রষ্ট সেনা সদস্য এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদসহ মাহবুব আলম চাষী সরাসরি ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু বর্তমানে তাহারা মৃত।

মোশতাক মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী মোসলেম উদ্দীন হাবু মিয়ার সাক্ষ্য ইতিপূর্বে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্যতে কোন আগা মাথা নাই। সম্মানিত আদালত মন্তব্য করেন, তিনি জেল হত্যাকাণ্ডের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে আসিয়া প্রকৃত ঘটনা এড়াইয়া অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

বাদী পক্ষের ৪৬ নং সাক্ষী অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল আনোয়ারুল আজিম একজন মেজর হিসাবে রিভারাইন সাপোর্ট ইউনিট সদরঘাটে কর্মরত ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাহার ফুপা ছিলেন। তিনি সাক্ষ্যতে বলেন তাহার ইউনিটের একটি ট্রাকে করিয়া তিনি তার ফুপা নিহত সৈয়দ নজরুল ইসলামের লাশ তাহার বাসায় নিয়া যান। তিনি জেরাতে বলেন ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে খালেদ মোশাররফের অনুগত সামরিক বাহিনী অভ্যুৎথান ঘটায়। পরবর্তীতে সিপাহী জনতার বিপ্লবে ৭-১১-'৭৫ তারিখে খালেদ মোশাররফ নিহত হন। তিনি আরও বলেন

www.pathagar.com

যে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে গোটা ঢাকা শহরের আংশিক খালেদ মোশাররফ নিয়ন্ত্রণে নিয়া যায়। কোর্ট তাহার বক্তব্য শ্রবণান্তে মন্তব্য করেন, তিনি সেনাবাহিনীর একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে কারাগারে যাইয়া খোঁজ খবর নিতে ব্যর্থ হন। তিনি তাহার ইউনিটের পর পর ২ জন সৈনিককে পাঠাইয়া খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করিলে ৪-১১-'৭৫ তারিখে তাহাদের মাধ্যমে জানিতে পারেন তাহার ফুপাসহ নেতৃবৃন্দ ভাল আছেন। সেই দিন সন্ধ্যায় জেল গেটে যাইয়া ডেপুটি জেলর এবং জেলরের নিকট হইতে সব ঘটনা জানিতে পারেন। জেলর ডেপুটি জেলর তাহাকে হত্যাকাণ্ড-পূর্ব টেলিফোন নাটক ও মোসলেমের নেতৃত্বে আর্মিদের সম্পৃক্ততার কথা বলেন। তাহার উপরোক্তরূপ বক্তব্য আদালত যুক্তিতর্কের খাতিরে সত্য ধরিয়া নিলে ক্যাপ্টেন মোসলেম ও তাহার দলের কয়েকজন সৈনিক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন। কিন্তু অত্র মামলায় দেখা যায় যে বাদী পক্ষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেশ কিছু আর্মি অফিসারসহ নায়েক, সৈনিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলখানার হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের কারণে আসামীভুক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষী বাদী পক্ষের দাবীর মুখে পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যাহা বাদী পক্ষের অত্র মামলার জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে ক্যাপ্টেন মোসলেমের দলের ২/৩ জন সৈনিক একজন নায়েকের নেতৃত্বে পুনরায় কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করিয়া ৪ নেতার মৃত দেহের উপর বেওনেট চার্জ করেন। অথচ বাদী পক্ষের দাবী এই যে জেলখানারয় প্রথম দলের প্রবেশের পরে দ্বিতীয় দলটি আসিয়া ৪নেতার মৃত দেহের উপর বেরনেট চার্জ করিয়া মৃত্যু নিশ্চিত করেন। এই বিষয়েও তিনি পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়। তাহার এইরূপ সাক্ষ্য দ্বারা বাদী পক্ষের মামলার গুরুতর ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জেরাতে তিনি স্বীকার করেন যে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখে খালেদ মোশাররফ এবং তাহার অনুগত বাহিনী ঢাকা শহরের আংশিকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়া নেয়। কিন্তু তিনি ইহা বলেন নাই যে বাইরের কোন অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়াছিলেন। তবে কি তাহারা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ঢাকা শহরের আংশিক নিয়ন্ত্রণ নিয়াছিলেন অথবা বঙ্গভবনসহ ঢাকা শহরের অন্যান্য অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় কারাগারের অংশ

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণে নিয়া থাকিলে জেলখানার হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তায়।

ফর্মাল সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা যথা সম্ভব এখানে অনুল্লেখিত রয়েছে বোধগাম্য কারণেই। তবুও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হয়। যেমন বাদী পক্ষের ৫০ নং সাক্ষী মোঃ আঃ মালেক বর্তমানে এসআই হিসাবে মহানগর দায়রা জজের মামলাখানার দায়িত্বে আছেন। এই সাক্ষী জানায় প্রদর্শনী- ৩০ ১৯৭৫ সালের একটি সরকারী রেজিষ্টার যাহা ঐ সময় জিআরও শাখার কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

ইহা আদালতের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে, তবে তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ মুখ্য মহানগর হাকিমের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেখে উহা জব্দ করেন ও জিম্মায় রাখেন যাহা আইনের চোখে ত্রুটিপূর্ণ হয়।

বাদী পক্ষের ৫২ নং সাক্ষী সৈয়দ মাহবুব আল করিম ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের স্পেশাল অফিসার। তিনি তাহার নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক দিক দেখাশুনা করিতেন। তার সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে জেলখানায় নিহত চার নেতার লাশগুলি তিনি ৪-১১-'৭৫ তারিখে সনাক্ত করেন এবং বুঝিয়া নেন। তাহার তত্ত্বাবধানে মনসুর আলী এবং তাজউদ্দীন সাহেবের লাশ দাফন করা হয়। ঐ সময়ে কোন নেতা বা পাতি নেতা আসেন নাই। ঐ সময় নাসিম সাহেব কলিকাতায় ছিলেন। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কোন জবানবন্দী প্রদান করেন নাই বলিয়া জানান।

জেরাতে মাহবুব আল করিম সাহেব বলেন যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এই দেশে একটি সরকার ছিল। ২-১১-'৭৫ ইং তারিখ মধ্যরাতে খালেদ মোশাররফ একটি অভ্যুত্থান ঘটায় এবং জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে। অভ্যুত্থানটি মোশতাক সাহেবের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। খালেদ মোশাররফ ও জিয়াউর রহমানের মধ্যে এই ঘটনার পর মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসে। মোশতাক সাহেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর পর জিয়াউর রহমানকে বন্দী করার পর খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ধরিয়া রাখার জন্য সেই সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার বৈধ দাবীদার জেলখানায় থাকা সৈয়দ

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয় বলিয়া তাহার ধারণা। তিনি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে তাহারা চার নেতার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং দেশকে স্বাধীন করেন। তিনি তাহার জেরাতে আরও বলেন যে চার নেতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তাহারা ঢাকায় থাকিতেন এবং ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সাথে উপরোক্ত তিন রাজনৈতিক ব্যক্তির সুসম্পর্ক ছিল। নাসিম সাহেব আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনীতি করিতেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। ১৫-৮-'৭৫ এর পর ভারতে চলিয়া যান এবং ১৯৭৯ কি ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে ফিরেন। মোশতাক সাহেব যখন বঙ্গভবনে বন্দী তখন খালেদ মোশাররফও জিয়ার ডামাডোলের মাঝখানে জেলখানার হত্যাকাণ্ড ঘটায়। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ তাহারা জেল হত্যার বিচার চান ও প্রতিবাদ করেন বলিয়া তিনি জানান। তিনি আরও বলেন যে তাহারা তিন রাজনৈতিক নেতা এই মামলায় প্রতিহিংসার শিকার হইয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মেজর রশীদ, ক্যাপ্টেন মোসলেম ও ক্যাপ্টেন মাজেদসহ একদল আর্মির লোককে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিয়াছেন। এই সাক্ষী এই মামলার উপরোক্ত আসামীগণ ব্যতীত অন্য কোন আসামীর জেল হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারে কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। বরং তাহার জেরাতে তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর নিহত চার নেতার সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ ও সুসম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। এমন কি তাহারা জেল হত্যাকাণ্ডের পর চার নেতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদসহ চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করিয়াছিলেন। তাহারা এই মামলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত তিন রাজনৈতিক নেতা এই মামলায় নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ পায়।

তাহার সাক্ষ্য মতে ইহা আরও প্রকাশ পায় যে ২-১১-'৭৫ ইং তারিখ মধ্য রাত হইতে খালেদ মোশাররফের অনুগত বাহিনী এবং

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের অনুগত বাহিনীর ডামাডোলের মধ্যে জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী খালেদ মোশাররফ এবং তাহার অনুগত লোকদের উপর জেল হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব চাপানো হয়।

এই মামলার প্রদর্শনী - ৩২ আসামী তাহের উদ্দীন ঠাকুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কার্য বিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত তথাকথিত জবানবন্দী যা সে পরে কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রত্যাহার করে। এই জবানবন্দীটি জজ সাহেবের রায়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা পায়। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীটি বহু দোষে দূষিত। কার্য বিধির শর্তসমূহ পালিত না হইয়া উহা প্রায় অবৈধ স্বীকারোক্তিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলে, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় তাহার নিকট হইতে যে স্বীকারোক্তি আদায় করা হইয়াছিল তাহার উপর আরও কারুকার্য্য আরোপ করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা একটি জাল স্বীকারোক্তি প্রস্তুত করিয়া এই মামলায় উপস্থাপন করে। উপরোক্ত জবানবন্দীতে অনেক কথা আছে যাহার পর্যালোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই। উক্ত জবানবন্দীর এক স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন জনাব মনসুর আলিকে বঙ্গভবনে নিয়া যান এবং সেখানে তাহাকে রাষ্ট্রপতি তাহার সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন যাহা মনসুর আলী সাহেব প্রত্যাখ্যান করেন। বিষয়টি সবৈব মিথ্যা তাহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। কেননা আমি জনাব মনসুর আলীকে নিয়া বঙ্গভবনে যাই নাই। যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া মাননীয় বিচারক এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে আসেন যে, খন্দকার মোশতাক মনসুর আলী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব দিয়া থাকিলেও কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায় না। তাহার ঐরূপ চাপ সৃষ্টি না করার কারণে ইহা প্রতীয়মান হয় যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে বঙ্গভবনে নিয়া গেলেও মোশতাক আহমেদের নির্দেশেই তাহা করিয়াছেন। আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন নিজে উদ্যোগী হইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে বঙ্গভবনে নিয়া যান নাই।

সেই জবানবন্দীর একস্থানে আছে আমাদের চার প্রতিমন্ত্রীকে চার নেতার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকিলেও গায়ের জোরে তাহারা উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে বঙ্গভবনে কিছুক্ষণের জন্য আটক রাখেন। জজ সাহেব মন্তব্য করেন, সাক্ষী কর্নেল সাফায়াত জামিল কিংবা অন্য কোন

www.pathagar.com

সাক্ষী ইহা বলেন নাই যে ঠাকুরকে খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল সাফায়াত জামিলসহ তাহার অনুগত বাহিনী তাহাকে বঙ্গভবনে কিংবা অন্য কোথাও আটক রাখিয়াছিলেন। প্রদর্শনী- ৩২ হইতে ইহা পরিষ্কার যে তাহের ঠাকুর বর্ণিত ঘটনায় নিজেকে জড়াইয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী করে নাই।

বাদী পক্ষের ৫৫ নং সাক্ষী আহম্মেদ উল্লাহ ১-১০-'৯৬ তারিখে ঢাকার মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০-১০-'৯৬ তারিখে আইজি প্রিজন্স সাক্ষী নুরুজ্জামান সাহেবের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন যাহা প্রদর্শনী-৩৬ হিসাবে আদালতে উপস্থাপিত হয়। এই সাক্ষীর প্রদর্শনী-৩৬ পর্যালোচনায় ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জেল হত্যাকাণ্ডের সহিত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ, মেজর রশীদ, ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তাহার ৪ সঙ্গী, নায়েক এ. আলী এবং তাহার সঙ্গীগণ হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন। তাহারা সক্রীয়ভাবে জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করান বা করেন।

বাদী পক্ষের ৫৬ নং সাক্ষী দেওয়ান হাফিজ উদ্দীন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী পুলিশ সুপার তাহার সাক্ষ্যে বলে যে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে সন্দীপ না গিয়া এই সাক্ষীর নিকট রিকুইজিশন প্রেরণ করিয়া বাদীর জবানবন্দী ফৌজদারী কার্য বিধির ১৬১ এবং ১৬৪ধারায় রেকর্ড পূর্বক অত্র মামলার তদন্তকারী অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন। সন্দীপের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বাদীর ১৬৪ ধারার জবানবন্দী রেকর্ড করেন। এই সাক্ষী অত্র মামলার তদন্তকারী অফিসার না হওয়া সত্ত্বেও এই মামলার আংশিক তদন্তকার্য্য করিয়া মামলাটিকে আইনগতভাবে ত্রুটিতে পর্যবসিত করেন।

বাদী পক্ষের ৬০ নং সাক্ষী গোলাম রসুল সুপারিনটেনডেন্ট তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে ৮-৯-'৯৬ তারিখে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়ার সুপার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে চিঠিতে (ফটোকপি) লেখা আছে যে লালবাগ থানার মামলা নং ১১ তাং ৪-১১-'৭৫ এর মামলা দায়ের সংক্রান্তে কোন

www.pathagar.com

নথিপত্র অত্র দফতরে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই চিঠির ফটোকপি ১/২ নম্বর ক্রমিকে একই কথা বলা আছে। ৪ নং ক্রমিকে বলা আছে যে ডিউটি রেজিষ্টার খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ৫ নং ক্রমিকে বলা আছে নথিপত্র খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই চিঠির ফটোকপিতে ৮টি নথি পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত ৮টি নথির কোথাও তাহার স্বাক্ষর নাই। জেলখানার ডায়েরীতে পাতা ফাঁকা করিয়া লেখার কোন নিয়ম নাই। প্রদর্শনীতে ৯ জব্দ তালিকায় লেখা নাই যে কোন কোন পাতা ফাঁকা ছিল। তাহার জেরা ও জবানবন্দী হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে যেই সমস্ত কাগজগুলির কখনও অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিশেষ ক্ষমতাবলে এই মামলার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত প্রযোজনীয় কাগজ পত্র তৈরী করিয়াছেন। এই সাক্ষী যে চিঠির মাধ্যমে যে সমস্ত কাগজ পত্র রেজিষ্টার অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিয়াছিলেন উহার মূল কপি আদালতে বাদী পক্ষ উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহা সত্য যে প্রদর্শনী ৯ মূলে ৮টি রেজিষ্টার বা বহি তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত হইয়া জব্দ করেন।

প্রদর্শনী ৯ এ বর্ণিত গেইট রেজিষ্টার হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখ ভোর ৪ টায় ক্যাপ্টেন মোসলেম ও তাহার সঙ্গে আরও ৪ জন আর্মির সিপাহী ষ্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল নিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রবেশ করে এবং ৪-৩৫ মিনিটে কারাগারে আটক ৪জাতীয় নেতাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া জেলখানা ত্যাগ করেন। একই দিনে ভোর রাত্র ৫-২৫ মিনিটে নায়েক এ. আলী এবং তাহার সঙ্গীয় ৩ জন আর্মির সিপাহী অস্ত্রসহ কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করেন এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০ মিনিট অবস্থান করিয়া পুনরায় অস্ত্রসহ ভোর ৫-৩৫ মিনিটে বাহির হইয়া যান। প্রদর্শনী ৭ হইতে আরও দেখা যায় যে একই দিনে ভোর রাত্রে উক্ত ক্যাপ্টেন মোসলেম ও তাহার ৪ সঙ্গীয় আর্মির সিপাহী ৪-৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জাতীয় চার নেতাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া জেলখানা ত্যাগ করেন। একই দিন ভোর ৫-২৫ মিনিটে নায়েক এ. আলী এবং তাহার সঙ্গীয় ৩ জন আর্মির সিপাহী অস্ত্রসহ কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করেন এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০ মিনিট অবস্থান করিয়া পুনরায় অস্ত্রসহ ভোর ৫-৩৫ মিনিটে বাহির হইয়া যায়। প্রদর্শনী ৭ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ঘটনার দিন ও তারিখ প্রথম দলটি ক্যাপ্টেন মোসলেমের নেতৃত্বে এবং

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দলটি নায়েক এ. আলীর নেতৃত্বে ৩-১১-'৭৫ ইং তারিখ ভোর রাত্রে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে জাতীয় ৪ নেতাকে গুলি এবং বেওনেট চার্জ করিয়া হত্যা করা হয়। জেল সুপার ৬০ নং সাক্ষী কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাকে লিখিত তাহার চিঠির ১ হইতে ২ নং ক্রমিকে ৪৫ ও ৯ নং ক্রমিকে যে সমস্ত মন্তব্য করা হইয়াছিল ঐ সমস্ত মন্তব্য অনুযায়ী প্রদর্শনী ৭, ৮, ১০ ও ১১ অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক উপস্থাপন হওয়ার কথা না থাকিলেও পরবর্তীতে উহা কোথা হইতে কিভাবে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন উহার ব্যাখ্যা এই ৬০ নং সাক্ষী কিংবা ৬৪ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রদান করেন নাই। ৬০ সং সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী এবং প্রদর্শনী ৭,৮,১০ ও ১১ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উহার কোন কোনটি যথাযথ সাক্ষীর মাধ্যমে সনাক্ত বা প্রমাণিত হয় নাই। আবার কোন কোনটি নতুনভাবে তৈরী করা হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। অত্র মামালার তদন্ত করিতে গিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে মোকদ্দমাটি তদন্ত করেন নাই বলিয়া প্রকাশ পায়। এই চিঠির মাধ্যমে ৮টি নথি পাওয়ার কথা বলা থাকিলেও উহার কোন কোনটির লিখার কালি নতুন ও লিখা নতুন বলিয়া দেখা যায়। (রায় ২১৮ পৃষ্ঠা)

বাদী পক্ষের ৬১ নং সাক্ষী মনির মিয়া মোসলেমের ড্রাইভার। তাহার নিকট হইতে মোসলেম সম্বন্ধে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সে বলে জেল হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না এবং ঘটনার দিন ও সময়ে সে মোসলেমের গাড়ী চালায় নাই তখন তাহাকে বিশ্বাস করা আদালতের পক্ষে দূরহ হইয়া পরে। বাদী পক্ষ তাহাকে নিয়া বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয় এবং তাহাকে বিদ্রোহী বা হোষ্টাইল সাক্ষী হিসাবে ঘোষণা দিয়া রাষ্ট্র পক্ষ তাহাকে জেরা করেন। সম্মানিত আদালত তাহার এই বক্তব্য অবস্থাদৃষ্টে সঠিক বলিয়া ধরিয়া নিতে না পারিলেও তাহার সাক্ষ্যর অন্যান্য অংশ বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এই মামলার তথাকথিত সর্ব শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ, সকল নট-ঘটের আয়োজক, প্রযোজক এবং পরিচালক তথা প্রতিটি বে-আইনী কার্য্যক্রমের উদ্যোক্তা এবং প্রণেতা হচ্ছে নাটের গুরু অত্র মোকদ্দমার ৬৪ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ। তাহার সমস্ত

www.pathagar.com

অবৈধ ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড সমূহের কিছু খতিয়ান ইতি পূর্বে এই রচনায় বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছি এবং তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের ধারা সংযোজন করিয়া তাহার কীর্তি কলাপের বিরুদ্ধে কোর্টে আমরা যথাবিধি নালিশ রুজু করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ব্যাপারটি গড়িয়ে মহামান্য হাইকোর্ট পর্যন্ত যায় এবং মহামান্য হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দেয়, ট্রায়াল কোর্ট বিচার কালে বিষয়টি নিস্পত্তি করবে। বিষটির আইনী নিস্পত্তি আমাদের দাবী থাকিলেও, এক্ষণে আমারা নিড়ীক্ষণ করিব মাননীয় আদালত তাহার রায়ে এই তদন্তকারীর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কি মন্তব্য করিয়াছেন, কি বক্তব্য রাখিয়াছেন বা কিভাবে সেই সব বিষয়ের নিস্পত্তি করিয়াছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার সংখ্যাতীত আইন বিরোধী এবং অবৈধ কার্য্যকলাপ বিচার চলাকালে আমরা মাননীয় বিচারকের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করিয়াছি। সংশ্লিষ্ট সকলেই করেন। সরকার বদলের ফলে পুলিশ বিভাগ হইতে বিতাড়িত, ক্ষমতাহীন ও স্বীয় বিবেকের কাছে অপরাধী এই তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্যের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই খেই হারিয়ে ফেলে এবং ঘটনার তারিখই ভুল করিয়া বসে। প্রথম বলে ৪-১১-'৭৫ পরে বলে ৩-১১-'৭৫। তদন্তকারীর সংখ্যাতীত অপকর্ম এবং বেআইনী অবিমৃশ্যতার কথা ইতি পূর্বে বহুবার বলার চেষ্টা করলেও এক্ষণে বিজ্ঞ জজ সাহেবের রায়ের প্রেক্ষিতে ক্রমানুসারে কিছু অস্বাভাবিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি এবং রায়ের প্রতিপাদ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

- রায়ের ২৩১ পৃষ্ঠায় এবং পরের পৃষ্ঠাসমূহে সম্মানিত আদালত বলেন, এই সাক্ষী তাহার জেরাতে বলেন যে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীর ফটোকপি এবং ঠাকুরের ফোজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীর টাইপ কপির ফটোকপি অত্র আদালতের আদেশ নং ১৯ তাং ১৬-২-৯৯ ইং ৪ ঃ ৩০ মি: তাহার কর্তৃক দাখিল হয় কিনা উহা তাহার জানা নাই। বিশেষ পিপি সাহেবগণ মূল কপি কবে দাখিল করেন উহা তাহার জানা নাই।
- মহামান্য হাইকোর্টে তিনি ১২-৪-২০০০ ইং তারিখে স্বশরীরে যান কিনা উহা তাহার মনে নাই। তবে একবার তিনি গিয়াছিলেন।
- মহামান্য হাইকোর্টে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬১ ধারার ৪৬ টি জবানবন্দীর মধ্যে ৮টি তাহার নিজের হাতের লিখা এবং বাকীগুলি তাহার অফিসারের হাতের লিখা বলিয়া জানায়।

www.pathagar.com

- ❑ এজাহারে দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারাটি নাই। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৯৬ ধারার বিধান মতে কে, এম, ওবায়দুর রহমান, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও তাহের উদ্দীন ঠাকুরের বিচারের জন্য সিএমএম আদালত হইতে তিনি কোন অনুমোদন নেন নাই।
- ❑ তিনি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ৭৫০ দিন পর ২৯-৯-৯৮ ইং তারিখে গ্রেপ্তার করেন।
- ❑ তিনি ৭৫০ দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৭ধারা মোতাবেক তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করার অনুমোদন চাহেন নাই।
- ❑ এজাহার ফরমটি ১৯৭৫ সালের হইতেছে।
- ❑ ইহা সরকার কর্তৃক ছাপানো ফরম নয়।
- ❑ ইহা হাতে বানানো ফরম।
- ❑ বাদী এম, এ, আউয়াল এজাহার ফরমটি জাল বলিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।
- ❑ চার্জসীটে আসামীর নামের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মোসলেম লিখা নাই।
- ❑ এই তিন জন আসামীসহ সকল আসামীর ষড়যন্ত্রের স্থানের ম্যাপ ও সূচীপত্র সুনির্দিষ্টভাবে তৈরী করা হয় নাই।
- ❑ তিনি তাহার জেরাতে বলেন যে ৩৬ নং সাক্ষী তাজউদ্দীন সাহেবের মেয়ের জবানবন্দী তাহার হাতে লিখা নয়।
- ❑ উহা এসআই উ মং লিখেন।
- ❑ তিনি আরও বলেন যে ৩৬ নং সাক্ষী সিমি হোসেন রিমি, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর নাম বলেন নাই।
- ❑ তিনি জেরাতে আরও বলেন যে উপরোক্ত আসামীগণ তাহার বাবাকেসহ অন্য তিন জন নেতাকে খুন করার পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করেন নাই।
- ❑ ৩০ নং সাক্ষী দেওয়ান ফরিদ গাজীর জবানবন্দী তাহার নিজের হাতের লিখা নয়।
- ❑ তিনি বাদী আবদুল আউয়ালের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীর উপর তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই।

www.pathagar.com

- এই সাক্ষী জেরাতে আরও বলেন যে ১৯৭৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কোন ফটোষ্ট্যাট মেশিন ছিল কিনা উহা তাহার জানা নাই। বাদী আবদুল আউয়ালের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় ১৯৭৫ সালের জেলখানায় ফটোষ্ট্যাট মেশিন ছিল না। তদন্তকারী কর্মকর্তা একস্থানে বলেন উপরোক্ত মেশিন কারাগারে ছিল।
- বঙ্গভবনের নির্দেশক্রমে চার নেতাকে হত্যা করা হইয়াছে এই মর্মে এজাহারে বলা নাই।
- বঙ্গভবনের নির্দেশক্রমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যাহারা জেল গেইট খুলিয়া দেয় বা চার নেতাকে বিভিন্ন রুম হইতে আনিয়া একত্র করিতে সাহায্য করে বা চার নেতাকে হত্যা করিতে সাহায্য করে তাহাদের তিনি আসামী করেন নাই।
- ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ সরকার এজাহার ফরম বাংলায় প্রিন্ট করে কিনা উহা তাহার জানা নাই।
- প্রদর্শনী- ৩ এ ম্যাজিষ্ট্রেট কোন স্বাক্ষর করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদর্শনী-৩ ৯-৯-৯৬ তারিখে Seen করেন। তবে আদেশ নামায় উহা লেখা নাই।
- তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, ৯-৯-৯৬ তারিখ হইতে ৭৫০ দিনের মধ্যে সকল পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে ৯ বার গেপ্তারী পরোয়ানা ইস্যু হয় কিনা তাহা তাহার খেয়াল নাই বা জনাব ওবায়দুর রহমান। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর নাম উহাতে ছিল কিনা উহার তাহার খেয়াল নাই।
- বাদী পক্ষের ২ নং সাক্ষীর জবানবন্দী তাহার হাতে লিখা নয় তবে উহাতে তাহার স্বাক্ষর আছে।
- বাদী পক্ষের ২ নং সাক্ষী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের জেলর তাহাকে বলেন নাই যে বঙ্গভবন হইতে ৫ ব্যক্তির অধিক ব্যক্তি জেলখানায় আসিয়া চার নেতাকে হত্যা করে।
- প্রদর্শনী-২৫ মূলে কারগার হইতে ২১টি আইটেম জব্দ করা হয় তবে তিনি জব্দ করেন নাই।
- ঐ ২১ টি আইটেমে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রমহান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর জড়িত আছে বলিয়া দেখা যায় না। উক্ত ২১ টি আইটেমের কোনটাতেই তাহাদের সন্দেহ করা হয় নাই বা নাম বলা হয় নাই।

www.pathagar.com

- তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার জেরাতে আরও বলেন যে ৭৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দীতে কেহ তাহার নিকট বলেন নাই যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ঘটনার তারিখ বা ঘটনার সময় জেলখানায় আসিয়াছিলেন।
- এই তিন ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ করিয়া ছিলেন কিনা উহা তাহার জানা নাই।
- তিনি পলাতক আসামীদের ধরিবার জন্য ৪ বার দরখাস্ত দেন। ঐ দরখাস্ত গুলিতে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, কিংবা ওবায়দুর রহমান ও শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের নাম ছিল না।
- তিনি বঙ্গভবনের স্কেচ্ ম্যাপ ও সূচীপত্র তৈরী করেন নাই। তাহার উচিত ছিল বাদী পক্ষের মামলা অনুযায়ী ২টি ঘটনা স্থলের মানচিত্র ও সূচীপত্র তৈরী করা এবং আদালতে উপস্থাপন করা। তদন্তকারী কর্মকর্তার এই রূপ ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত এই মামলার জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ বলিয়া মনে হয়।
- তিনি বঙ্গভবনের কম্পট্রোলারকে সাক্ষী করেন নাই এবং ডিউটি রেজিষ্টার জব্দ করেন নাই। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ছিল। কিন্তু তিনি উহার সকলকে সাক্ষী করেন নাই।
- আর্মির লোক দুই দফায় জেলখানায় গিয়াছিল। প্রথম দফায় ক্যাপ্টেন মোসলেমের নেতৃত্বে ব্রাশ ফায়ার করা হয় এবং ২য় দফায় নায়েক এ, আলীর নেতৃত্বে বেয়নেট দ্বারা মৃত্যু নিশ্চিত করিয়া যায়। কিন্তু তদন্তে এ, আলীর নাম পাওয়া যায় নাই। আবার বলেন দ্বিতীয় দফায় যাহার আসিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন।
- ২-১১-৭৫ ইং তারিখ হইতে ৭-১১-৭৫ ইং তারিখ পর্যন্ত যে সকল লোক বঙ্গবভনে প্রবেশ করে এবং বাহির হয় এই মর্মে তিনি কোন রেজিষ্টার জব্দ করেন নাই। ২-১১-৭৫ হইতে ৭-১১-৭৫ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সাথে যে সমস্ত লোক সাক্ষাৎ করেন এই মর্মেও তিনি কোন রেজিষ্টার জব্দ করেন নাই।
- প্রয়াত নেতাদের পুত্র, ভাই, কন্যা স্ত্রী এই কথা তাহার কাছে বলেন নাই যে বঙ্গভবনে ষড়যন্ত্রক্রমে আসামীরা হত্যাকাণ্ড ঘটায় বা ঐ রূপ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়।
- ২৪-৪-২০০১ ইং তারিখের বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় ৪

www.pathagar.com

পুলিশ অফিসারের আওয়ামী লীগের নমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে তাহার নাম ছাপা হয় কিনা তিনি জানেন না।

- তিনি যখন এই মামলায় তদন্ত করেন তখন ৪ নেতার আত্মীয় স্বজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন।
- আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের জেরাতে এই সাক্ষী বলেন যে আসামী ২ বার চীফ হুইপ হন। সাক্ষী আরও বলেন যে তাহার জানা নাই যে ৩-১০-৯৮ ইং তারিখে হাসিনা ওয়াজেদ বা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নবাবগঞ্জের বক্তৃতায় ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনকে দল ত্যাগের জন্য অত্র মামলায় জড়ান বলিয়া বলেন।
- তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর শেখ হাসিনা দলীয়ভাবে সরকার প্রধান হওয়ার জন্য খালেদ মোশাররফকে দিয়া ৪ নেতার হত্যাকাণ্ড ঘটান নাই বা তিনি এই ধরনের কোন তদন্ত করেন নাই। আবার বলেন এই ধরনের তথ্য পান নাই।
- তিনি আরও বলেন যে কোন illegal order কোন প্রকার order নয়।
- এই সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তিনি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে গিয়া জেলহত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়া হত্যাকাণ্ডের তারিখ সম্বন্ধে দ্বিধা-দন্দগ্রস্থ হইয়া পরেন এবং সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘটনার তারিখটি উল্লেখ করিতে ব্যর্থ হন।
- প্রদর্শনী-১ হইতে ইহা পরিলক্ষিত হয় নাই যে জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের বা যোগ সাজশের কথা ইহাতে বলা হয়। শুধু ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তাহার দলীয় সশস্ত্র আর্মি দ্বারা হত্যাকাণ্ড সংঘটনের কথা বলা হইয়াছে। এই সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে মামলাটিতে তদন্ত করিতে গিয়া এমন কোন কথা বলেন নাই যে চার্জশীটে উল্লেখিত ৭৫ জন সাক্ষীর সধ্যে কোন সাক্ষী তাহার নিকট বঙ্গভবনে জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্র এবং যোগসাজশের কথা বলিয়াছেন।
- তিনি মূল এজাহার না পাইয়া সিডির সাথে এজাহারের ফটোকপি পাইয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিসে তল্লাশীর পর উহার অবিকল একটি নকল এর টাইপ কপি আইজি অফিস থেকে প্রাপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে যোগাযোগ করিয়া বাদীর দস্তখতকৃত এজাহারের

www.pathagar.com

একটি কপি প্রাপ্ত হন। কিন্তু নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে ঐ রূপ কোন এজাহারের কপি তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই।

- তদন্তকারী কর্মকর্তা বাস্তবে এজাহারের কোন মূল কপি আদলতে দাখিল করেন নাই বলিয়া দেখা যায়। জবাবন্দীতে জনাব আঃ আউয়ালের সহি করা একটি এজাহারের কথা বলিলেও উহা এজাহারের ফটোকপিতে সহি বলিয়া দেখা যায়। মূল এজাহারের যে কপিটি বাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় উহা মূল এজাহারের টাইপ করা ফটোকপি প্রতীয়মান হয়। কাজেই এই সাক্ষী মূল এজাহারের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা দালিলিক সাক্ষীর বিপরীতমুখী বলিয়া প্রমাণ হয়।
- এই মামলায় আলামত সমূহ দীর্ঘ ২১ বৎসর পর সংগ্রহ করিতে গিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা উহার কোন কোনটি নিজে জব্দ না করিয়া পুলিশের অন্য কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ করাইয়া মামলাটি মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়।
- ২৫-৯-৯৬ ইং তারিখে মহাকারা পরিদর্শকের উপস্থাপন মতে পুলিশ পরিদর্শক এ, কে, আবদুর রাজ্জাক ২১টি আইটেম সহ একটি ফাইল জব্দ করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঢাকাতে অবস্থান করিয়াও অন্য পুলিশ অফিসার আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক প্রদ: ২৫ মূলে জব্দ করিবার যথাযথ কারন তিনি সাক্ষ প্রদান কালে আদালতের সামনে দিতে পারেন নাই। প্রদ: ২৫ এ বর্ণিত কাগজগুলি আত্মপক্ষ সমর্থন কারী বিতর্কিত করিয়া তোলেন, কারণ উহা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ না করিয়ার কারণে জব্দকৃত কাগজ গুলি আইনগতভাবে প্রমাণ হয় না এবং বিতর্কিত হইয়া দাঁড়ায়।
- প্রদর্শনী ২৬-১-ক (১) প্রেরক আবুল হোসেন (আইজিপি) প্রেরণ করিলেও উহা তাহার দ্বারা তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রদর্শনী না করিয়া জব্দকালীন সাক্ষীদের আদালতে আনিয়া উহা প্রমাণ করিবার চেষ্ট করিয়াছেন, উহাও আইনগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ।
- প্রদর্শনী ২৬ মূল স্বাক্ষর কারী কর্তৃক যথাযত প্রমাণে না আনিয়া জব্দ কালীন সাক্ষীদের দ্বারা আদালতের সামনে ত্রুটিপূর্ণ ভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-২৬ কতগুলি টাইপ করা কাগজের true

www.pathagar.com

কপি মূল স্বাক্ষরকারী কর্তৃক আদালতে যথাযথভাবে উহার মূল কপি প্রদর্শিত না হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত কার্য্যক্রম উক্ত কারণে ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। তদন্তকারী কর্মকর্তা একজন দায়ত্ব সচেতন পুলিশ অফিসার থাকা সত্ত্বে এই ব্যাপারে তিনি ফোজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৭৩ ধারায় বিধান ও নিয়াম কানুনগুলি ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়।

- তিনি মার্ক-এক্স, মার্ক-ওয়াই/ও প্রদ: এম/এ সিরিজ এবং মার্ক-জেড জব্দ করিতে গিয়া উহার মূল কপি তলব করত: উহা যথাযথভাবে উহার মূলকপি স্বাক্ষরকারী কর্তৃক আদালতে প্রমাণ না আনায় বা আদালতের সামনে উহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা না করায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অত্র মোকদ্দমাটি গভীর ভাবে ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়।
- তাহার জেরা হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে তিনি, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে গ্রেফতারের পূর্বে ফোজদারী কার্য্য বিধির ১৬৭ ধারার নিয়ম কানুন লংঘন করিয়াছেন।
- এজাহার ফরমটি ১৯৭৫ সালে দেখাইলেও উহা তৎকালীন সরকার কর্তৃক ছাপানো নহে বলিয়া স্বীকার করেন। তাহার সাক্ষ্য হইতে আরও দেখা যায় বাদী এম, এ, আউয়াল জাল বলিলেও তিনি উহা সঠিক ও সত্য প্রমাণের জন্য কোন সঠিক এবং আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।
- ৩ জন আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং কে, এম, ওবায়দুর রহমান কতৃক তথাকথিত ষঙযন্ত্রের স্থান বা যোগসাজশের স্থান, প্ররোচনা ও সহায়তার স্থান তদন্তকালে আদালতের সামনে সুনিদ্দিষ্ট ভাবে দেখান নাই।
- ইহা ছাড়া তাহাকে জেরার সময় স্বীকার করেন যে বাদীপক্ষের ৭৫ জন সাক্ষীর মধ্যে প্রায ৪৫ কি ৪৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬১ ধারায় রেকর্ড না করিলেও উহাতে স্বাক্ষর করেন। আবার কোন কোনটিতে যিনি উক্ত ষ্টেটমেন্ট রেকর্ড করেন উহাতে তিনি স্বাক্ষর করেন নাই। এই সাক্ষী এইভাবে ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ১৭৩ এর নিয়মও বিধানগুলি ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায়।

www.pathagar.com

- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঘটনার সময়ে অবস্থানরত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে গিয়া কেন্দ্রীয় কারাগারের তৎকালীন কর্মকর্তারা বা কর্মচারীরা যে ঘটনার সাথে কেন জড়িত ছিলেন না তদন্তকালে উহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। কারণ ঐ সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ঘটনা ঘটাইবার পূর্বে কেহ জেলখানার মেইন গেইট খুলিয়া দেন, কেহ মূল আসামীদের নিউ জেলের নেতাদের ভিন্ন রুমে নিয়া যান, কেহ ৪ নেতাকে একত্রিত করিয়াছেন, কেহ চাবী দিয়া নতুন জেলের রুমগুলি খুলিয়া দেন এবং কেহ মূল আসামী কর্তৃক জেল গেইটে রেজিষ্টারে মূল আসামীর দস্তখত না দিয়া নিজে মূল আসামীর নাম লিখিয়া দেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর বাস্তবে কোন তদন্তকার্য্য করেন নাই বলিয়া দেখা যায়। তাহার উপরোক্তরূপ তদন্ত কার্য্য হইতে অত্র মামলার মূল রহস্যের এক অংশ অন্ধকারে থেকে যায়।
- প্রদর্শনী ৩২ এ তাহেরউদ্দীন ঠাকুর বলেন নাই যে তাহারা একত্রে শলাশরামর্শ করিয়াছেন। তাহার উপরোক্তরূপ বক্তব্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দি করিতে গিয়া তিনি নিজেকে ঐরূপ শলা পরামর্শে জড়িত করেন নাই এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য হইতেও উহা দেখা যায়।
- যেহেতু রাষ্ট্রপতি মোশতাক প্রদর্শনী-৩২ এ বর্ণিত তাহার ঘনিষ্ঠ লোকজনদের সাথে একত্র করিয়া কোন শলাপরামর্শ করেন নাই সেই হেতু উপরোল্লিখিত কারণে ইহা বলা যাইবে না যে সকলে মিলিয়া জেলখানায় আটক চার নেতাকে তথাকথিত হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন।
- এই সাক্ষী তাহার জবানবন্দীতে বলেন যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর মুক্তিযুদ্ধ করেন কিনা উহা তিনি জানেন না। কিন্তু বাদী পক্ষের কতেক সাক্ষী অর্থাৎ কতেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন যে উপরোল্লিখিত ৩ রাজনৈতিক নেতা জেলখানায় আটক চার নেতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদন্তকারী অফিসার এই বিষয়ে কোন প্রকার তদন্ত করেন নাই বলিয়া তাহার বক্তব্য হইতে প্রকাশ পায়। তিনি উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকে মামলায় জড়ানোর কারণে তাহাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

- এই তিন নেতা জেল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মন্ত্রী পরিষদ হইতে পদত্যাগ করেন কিনা সে বিষয়েও অত্র তদন্তকারী অফিসার কোনরূপ তদন্তকার্য্য পরিচালনা করেন নাই।
- যাহারা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী ছিলেন তাহাদের কিছু কিছু ব্যক্তিকে অত্র মামলায়ও সাক্ষী করা হইয়াছে বলিয়া তাহার সাক্ষ্য হইতে প্রকাশ পায়। তাহার ঐরূপ আচরন হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঘটনা এবং অত্র মামলার ঘটনা একইরূপ ধরিয়া তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাহার উপরোক্তরূপ কার্য্য অত্র মামলার গুরুত্বে আঘাত হানে বলিয়া দেখা যায়। ইহাও প্রমাণ হয় যে তিনি একই ব্যক্তিদের দুইটি মামলায় সাক্ষী করিয়া তাহাদের উপর আদালতের বিশ্বাস যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।
- বঙ্গভবনে নুরুজ্জামান সাহেবের সাথে যাহাদের ফোনে আলাপ হইয়াছিল তাহাদের সাথে তার ব্যক্তিগত পরিচয় বা কখনো দেখা বা কথাবর্তা হইয়াছিল কিনা এই মর্মে তিনি কোন তদন্ত করেন নাই। তথাকথিত ষড়যন্ত্র, যোগসাজশ, প্ররোচনা সহায়তার বিষয় বঙ্গভবনে উৎপত্তি ঘটিলে সেই বিষয়ে এই সাক্ষীর তদন্ত করা উচিৎ ছিল। সাক্ষী এই মর্মে কোন তদন্ত করেন নাই বলিয়া দেখা যায়। এই সাক্ষীর সাক্ষী হইতে হইতে ইহা দেখা যায় যে তিনি অত্র মামলায় কোনমতে আসল ঘটনা পাশ কাটাইয়া তদন্তকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।
- তিনি অত্র মোকদ্দমায় সাক্ষী প্রদানকালে কতেক আসামীদের নাম প্রকাশ করিয়া বলেন যে তাহারা যোগসাজশে জেলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটান কিন্তু তাহার পুলিশ রিপোর্ট মানিত সাক্ষীদের মধ্যে কোন সাক্ষীই ঐরূপ যোগসাজশ বা ষড়যন্ত্রের কথা বলেন নাই। অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি সাক্ষ্য প্রদান না করিয়া বাদী পক্ষের ইন্টারষ্টেড্ সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন বলিয়া দেখা যায়।
- তিনি অত্র মামলার পলাতক আসামীদের গ্রেফতার করার জন্য চারবার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন এবং তাহার স্বীকৃতমতে জনাব ওবায়দুর রহামন, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এর নাম নাই বলিয়া তিনি আদালতকে বলেন। উহার

www.pathagar.com

অর্থ এই দাঁড়ায় যে প্রাথমিকভাবে মামলা শুরু হওয়ার প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের এই মামলার জড়ানো হয় নাই। রহস্যজনক কারণে পরবর্তীতে এই তিন রাজনৈতিক নেতাকে মামলায় জড়ানো হয়।

- তিনি তাহার সাক্ষে বলেন যে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ থাকায় জেলখানায় নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীরা চারনেতার হত্যাকাণ্ডকে ঠেকানোর জন্য বা তাদের জীবন রক্ষার জন্য কোন প্ররিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার ঐরুপ সাক্ষ্য আদালতের নিকট এই কারণে গ্রহণ যোগ্য নয় যে তাহারা রাষ্ট্রপতির অবৈধ নির্দেশ অনুযায়ী জেলখানায় ঐরূপ কার্য্য পালন করিতে বাধ্য ছিলেন না। এই বিষযে জেল কর্তৃপক্ষ ও জেলখানায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তিনি যথাযথ তদন্ত করেন নাই বলিয়া প্রকাশ পায়।
- তাহার স্বীকার মতে দুই দফায় জেলখানায় আর্মির লোকজন প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন করে। তিনি প্রথম দফার ৫ জনের মধ্যে ১ জনের নাম প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয় দফার ৪ জনের মধ্যে ১ জনের নাম প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম দফার ১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করিলেও ২য় দফার এ, আলীকে কিংবা তাহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করিয়া অভিযোগপত্র দাখিল করেন নাই। তিনি রহস্যজনক ভাবে ২ দফার এ, আলীকে মামলার দায় হইতে তদন্ত কালে অব্যাহতি দেন। এই ব্যাপারে তিনি যথাযত তদন্ত করেন নাই।
- ঘটনার রাত্র জেলর আমিনুর রহমান, ডিআইজি প্রিজন, আইজি প্রিজন এবং জনৈক সুবেদার কর্তৃক ঐ রাত্রে সূর্য্য ডোবার পর এবং সূর্য্য উঠার পূর্বে আর্মিদের দ্বারা বেআইনী কার্য্য করিতে কেন তাহারা সহযোগিতা করিয়াছিল এই ব্যাপারে তিনি যথাযথ এবং পূর্নভাবে উহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। কাজেই এই ব্যাপারে তাহার তদন্ত সঠিক হয় নাই।
- আর্মি অফিসারগণ এবং কোন রাজনীতিবিদ যে বঙ্গভবনে অবস্থান করতেন ঐ মর্মে বঙ্গভবন হইতে কোন প্রকার কাগজপত্র জব্দ করিয়া আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। এই বিষয়ে তাহার তদন্ত যথাযথ ও সঠিক হয় নাই।
- ২-১১-'৭৫ হইতে ৭-১১-৭৫ ইং তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সাথে

www.pathagar.com

যাহারা সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গভবন হইতে সাক্ষাতের পর বাহিরে চলিয়া যান ঐ সমস্ত লোকদের তিনি তদন্তকালে যথাযথ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই বা সাক্ষাতের স্বাক্ষরিত রেজিষ্টার জব্দ করেন নাই। তিনি তদন্তের পরিপন্থি কার্য্য করিয়াছেন।

- একজন আর্মি অফিসার নিজেকে ক্যাপ্টেন মোসলেম পরিচয় দিয়া তাহার সঙ্গীয় ৪ জোয়ানদের নিয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া চার নেতার হত্যাকাণ্ড ঘটাইলেও তিনি ঐ ক্যাপ্টেন মোসলেমসহ তাহার সঙ্গীয় ৪ ব্যক্তির যথাযথ পরিচিতির ব্যাপারে কোনরূপ তদন্ত করেন নাই বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।
- নিহত চার নেতার আত্মীয় স্বজনেরা আসামীদের দ্বারা বঙ্গভবনে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের বিষয়ে তাহার নিকট কিছু বলেন নাই।
- বঙ্গভবনে তৎকালীন সরকারের একটি সচিবালয় ছিল। উক্ত সচিবালয়ের প্রধান প্রধান ও গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নাই বা তাহাদেরকে সাক্ষী মান্য করা হয় নাই। এই বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা খামখেয়ালীপনা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদন্তকার্য্য ত্রুটিতে পর্যবসিত করিয়াছেন।
- এই মামলায় কর্নেল ফারুক, কর্নেল শাহরিয়ার এবং মেজর খায়রুজামানকে গ্রেফতার দেখানো হইলেও উহার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি তদন্ত কালে সিডিতে প্রদান করেন নাই। এই তিন ব্যক্তির অত্র মামলায় আসামীভূক্ত করার ব্যাপারে তিনি যথাযথ তদন্ত করেন নাই।
- জেলহত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাংলা দেশের বাহিরে এবং ভিতরে যে সমস্ত তদন্ত কমিশন গঠিত হয় উক্ত বিষয়েও তিনি তদন্তকার্য্য পরিচালনা করেন নাই।
- তদন্তকালে তিনি একজন সরকারী কর্মকর্তা থাকিয়াও কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন।
- আদালতের সন্দেহ জাগে যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে কোন ফটোষ্টাট মেশিন না থাকা সত্ত্বেও বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলা প্রদর্শনী ১ ও ৩ তদন্তকারী কর্মকর্তা কিভাবে এবং কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন। ১৯৭৫ সালে স্বীকৃতমতে বাংলাদেশে কোন ফটোষ্টট মেশিন ছিল না।

এই বিষয়ে বাদী পক্ষের ১ নং সাক্ষী তাহার জেরাতে বলেন যে

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কোন ফটোষ্ট্যাট মেশিন ছিল না। আদালতে এজাহারের যে ফটোকপি দাখিল করা হইয়াছে উহাতে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই। এজাহারের ফটোকপিতে যে সকল লেখা আছে উহার কোন অক্ষর তাহার হাতের লেখা নয়।

- ১নং সাক্ষীর উপরোক্ত সাক্ষ্য হইতে উহা প্রতীয়মান হয় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রদর্শনী-১ অত্র মামলার কারণে একই রূপ একটি মূলকপি বাদীর নামে সৃজন করত: ইহা হইতে ফটোকপি করিয়া পরবর্তীতে আদালতে প্রদর্শনী ১ ও ৩ রূপে দাখিল করিয়াছেন। ১ ও ৩ নং প্রদর্শনী আইনগত ভাবে সাক্ষ্যে আদালত কর্তৃক গ্রহণ যোগ্য নয়। এজাহার যে কোন মামলার ভিত্তি। কাহার আখন্দ কর্তৃক ১ও ৩ এ বর্ণিত বিষয়বস্তু নুতনভাবে সৃজন করিবার কারণ আদালত খুজিয়া পাইতেছে না।
- আসামীদের বিজ্ঞ কৌশলীগণ প্রদ-১ এর তথাকথিত জাল জালিয়াতির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রশ্ন তুলিয়াছেন উহা সঠিক এবং সত্য বলিয়া ধরা হইলেও জেলে চার নেতার হত্যাকাণ্ড অস্বীকার করা যায় না। বাদী পক্ষের ৬৪ নং সাক্ষী আবদুল কাহার আখন্দ অত্র মোকদ্দমায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান করিতে গিয়া যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপরোক্ত তথাকথিত জাল জালিয়াতির ঘটনার কথা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়। যেহেতু বাদী নিজেই এজাহারখানা জাল জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী বলিয়াছেন সেহেতু উক্ত বিষয়ে আর অতিবিজ্ঞ আলোচনা নিস্প্রয়োজন।
- অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ মূল এজাহার আদালতের সামনে উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই।
- প্রদর্শনী ৩ যে আকারে এবং প্রকারে আদালতের সামনে দাখিল করা হোক না কেন উহার ভিত্তি করিয়া প্র:১ হইতে প্র: ২ সাক্ষ্য আইনে বিবেচনা করা যায় না। প্র: ৩ ও সাক্ষ্য আইনে গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রদর্শনী-১ হইতে ৩ কোন লোক মূল ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বচক্ষে আলোকপাত করিলে অতি সহজে অনুধাবন করিবেন যে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে রহস্য জনকভাবে গভীর ষড়যন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া ইতিহাসের পাতায় বড় ধরনের অপরাধের কাজ করিয়াছেন। তিনি অত্র মামলার গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্য সমূহ মিথ্যায়

www.pathagar.com

পর্য্যবসিত করিয়াছেন।

- তদন্তকারী কাহার আখন্দের অপকর্মের চিহ্ন তাহার কর্তৃক বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকার নিকট ৯-৯-৯৬ ইং তারিখে দাখিলী দরখাস্ত হইতে পাওয়া যায়। তিনি উক্ত দরখাস্ত দ্বারা শাহ্ রিয়ার, ফারুক ও খায়রুজামানকে অত্র মামলায় গ্রেফতার দেখানোর জন্য নিজেই বলিয়াছেন যে উল্লেখিত ৯-৯-৯৬ তারিখ অত্র মামলার নথি ও কাগজপত্র খুজিয়া পান নাই। তিনি উহাতে আরও বলেন যে মামলাটির তদন্ত কার্য্য পরিচালনায় সিএমএম সাহেবের অনুমতিক্রমে নতুন নথি খোলার প্রয়োজন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ৯-৯-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শনী ১ হইতে ৩ এর তাহার নিকট কোন অস্তিত্ব ছিল না। যাহার অর্থ দাঁড়ায় তদন্ত কার্য্য শুরু হওয়ার পর অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী অফিসার উপরোক্ত এজাহার, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রদর্শনী-১ হইতে প্রদর্শনী-৩ পরবর্তীতে যে কোন উপায়ে হাসিল করিয়াছেন। তদন্তকারীর উপরোক্তরূপ কার্য্যকলাপ মামলার ঘটনার উপর কালো ছায়া ফেলিলেও উহার দ্বারা মামলার ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকিয়া যায়। কারণ অত্র মামলার তথাকথিত এজাহারে বাদী তাহার স্বাক্ষর জাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আদালতে উপস্থাপিত এজাহারে প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন স্বাক্ষর নাই।
- তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনার তারিখ ও সময় ঘটনাস্থলে ৯ জন হত্যাকারীদের মধ্যে মাত্র ১ জনকে অত্র মামলায় আসামী করিয়া চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন কিন্তু তিনি যথাথথ তদন্তক্রমে ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত বক্রি ৮ আসামীকে অত্র মামলায় আসামীভূক্ত করেন নাই।
- বাদীপক্ষের দাখিলী দালিলিক সাক্ষ্য এবং আদালতে উপস্থিত কতেক সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা হত্যাকারী এ, আলীর নাম প্রকাশ পাইলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা রহস্যজনক ভাবে তাহাকে অত্র মামলার আসামী করেন নাই।
- ঘটনার সময় ও তারিখে ঘটনাস্থলে এজাহারদানকারী বাদীর সামনে মোট ৯ জন হত্যাকারী প্রবেশ করিলেও কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রবেশ রেজিষ্টারে ঐ ৯ হত্যাকারীর নাম গেইট রেজিষ্টারে লেখা হইয়াছে কি হয় নাই এই মর্মে বাদী কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তার তুচ্ছ এবং

www.pathagar.com

অবহেলার কারণে তাহারা উহার কোন প্রকার তদন্ত করেন নাই। প্রদর্শনী ৮ হইতে ইহা প্রমানিত হয় যে এ, আলী নামক জনৈক আর্মি সদস্য উহাতে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ অত্র মামলাটির তদন্তকার্য্য পরিচালনা করিতে গিয়া এমন কোন সাক্ষ্য আদালতের সামনে উপস্থাপন করিতে পারেন নাই যাহা দ্বারা জেলখানা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ৯ জন হত্যাকারীর নাম আদালতের সামনে প্রকাশ পায় ও প্রমানিত হয়।

- তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত হত্যাকারীদের এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন মোসলেম ছাড়া অপর ৮ জন আসামীর ব্যাপারে কোনরূপ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। যদিও উহা সব সাক্ষীদের দ্বারা প্রমানিত যে মোসলেমের নেতৃত্বে ৪ জন গুলি করিয়া চার নেতাকে হত্যা করে এবং এ, আলীর নেতৃত্বে অপর ৩ জন বেয়নেট চার্জ করিয়া নেতাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে।
- বাদী পক্ষ কর্তৃক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মানিত ১ হইতে ৯ এবং ১২ নং সাক্ষী আসামী মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দীন, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শরফুল আহম্মদ, মেজর শাহরিয়ার, মেজর ফারুক, ক্যাপ্টন নজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন মাজেদ, ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা, ক্যাপ্টন কিসমত হোসেন, ক্যাপ্টেন খায়রুজ্জামান, মেজর রাশেদ চৌধুরী, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের জেলখানায় হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত থাকিবার ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ঘটনার আগে কিংবা ঘটনার পর উপরোল্লিখিত জেলখানার সাক্ষীগণ এমন কথা বলেন নাই যে উপরোক্ত আসামীগণকে ঘটনাস্থলের আশে পাশে দেখা গিয়াছে কিংবা জেলখানার গিরা তাহারা আটক নেতা কর্মীদের খোঁজ খবর নিয়াছেন কিংবা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং তাহের উদ্দীন ঠাকুর খন্দকার মোশতাকের পক্ষে জেলখানার কর্তৃপক্ষের নিকট এই ব্যাপারে ফোন করিয়াছেন।
- জেলখানা হত্যাকাণ্ডের পূর্বে বা হত্যাকাণ্ডের রাত্রে উপরোল্লিখিত

www.pathagar.com

আসামীগণের মধ্যে আর্মির সদস্যদের কার্য্যকলাপে ইহা প্রমাণিত যে তাহারা মেজর রশীদ, মেজর ফারুক, মেজর ডালিম এবং মেজর শাহরিয়ারের সাথে বঙ্গভবনে অবস্থান করিতেন। কিন্তু শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং তাহরে উদ্দীন ঠাকুর তাহাদের সাথে বঙ্গভবনে অবস্থান করিতেন না।

- যুক্তি তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে পাল্টা 'ক্যু'র উৎকণ্ঠায় রাষ্ট্রপতি মোশতাক তার ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করেন, কিন্তু ঐরূপ আলোচনা জেলহত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হইয়া হাকিলে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবশ্যই প্রদর্ননী-৩২ এ বর্ণিত খন্দকার মোশতাক আহমদের ঘনিষ্ঠজনদের সকলকেই অত্র মামলার আসামীভূক্ত করিতেন। এখানে দেখা যায় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা খন্দকার মোশতাকের বর্ণিত ঘনিষ্ঠ জনদের সকলকে আসামী ভূক্ত করেন নাই। ইহার কারণ এই যে তদন্তকারী কর্মকর্তা মোশতাক ও তার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে শলাপরার্শক্রমে জেল হত্যাকাণ্ডের বিষয় কোনরূপ সম্পৃক্ততা পান নাই। তাহাদের মধ্যে যে কথিত আলোচনা হইয়াছিল তাহা কেবল খালেদ মোশাররফের হাত থেকে সরকার রক্ষা করার বিষয়ে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বাদী পক্ষের ৬৪ জন সাক্ষীর মধ্যে কোন সাক্ষীই প্রদ: ৩২ এ বর্ণিত তথাকথিত জেলহত্যাকাণ্ডের সিদ্ধান্তের বিষয় শলাপরার্শ সমর্থন করিযা সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই।
- জেলখানার ১০ জন সাক্ষীর মধ্যে ১-৩ নং সাক্ষী প্র: ৩২ এ বর্ণিত আসামীদের মধ্যে জেলহত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকিবার ব্যাপারে শুধু মেজর ডালিম, মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন মোসলেম ও মেজর রশীদের নাম বলেন। জেলখানার ৪ হইতে ৯ নং এবং ১২ নং সাক্ষী জেল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ক্যাপ্টেন মোসলেম ছাড়া অন্য কোন আমাসীর নাম বলেন নাই। জেলখানার ১ হইতে ৯ এবং ১২ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নুরুলইসলাম মঞ্জুর, মেজর ফারুক, মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর বজলুল হুদা, মেজর সরফুল আহমদ, মেজর শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন নাজমুল, ক্যাপ্টন মাজেদ, ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা, ক্যাপ্টেন কিসমত হাসেম,

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন খায়রুজ্জামান, মেজর রাশেদ চৌধুরী, রিসালাদার মোসলেম এবং তাহের উদ্দীন ঠাকুর জেলখানা হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাথে জড়িত নয় বলিয়া প্রকাশ পায়। তবে ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দীনের সরাসরি জড়িত থাকা প্রমাণ হয়। আর্মির নায়েক এ, আলী ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত থাকিলেও এবং নৃশংস ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাইলেও অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ তাহাকে রহসজনকভাবে অজ্ঞাত কারণে আসামীভূক্ত করেন নাই। অপর দিকে প্রদ: ৩২ এর উপর ভিত্তি করিয়াও তদন্তকারী কর্মকর্তা অত্র মামলায় অভিযোগপত্র দায়ের করেন নাই বলিয়া প্রকাশ পায়।

- সাক্ষী ১,২,৩,৪ এবং জেলখানার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ জেলকোডের বিধান ভঙ্গ করিয়া সশস্ত্র আর্মির লোকদের রাতের বেলায় জেলখানার গেটে আসা মাত্র জেলখানায় প্রবেশ করিতে দিয়া নিজেরাও হত্যাকাণ্ডের সাথে সহায়তা করা সহ সহযোগী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পায়। তাহারা সকলে মিলিয়া জেল গেট খুলিয়া না দিলে এবং বে-আইনী আদেশ না মানিলে ও তাহাদের প্রতিরোধ করিলে ঘটনাটির মোড় অন্যদিকে নিত এবং পরবর্তীতে প্রকৃত খুনীদের জানা যাইত। উল্লেখ্য যে তদন্তকারী কর্মকর্তা কাহার আখন্দ এই বিষয়গুলি দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া উহার উপর কোনপ্রকার তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই এবং প্রকৃত হত্যাকাণ্ডের ঐ রূপ সহযোগীদের অত্র মামলায় আসামী ভূক্ত করেন নাই।
- সশস্ত্র ব্যক্তিরা ঘটনার রাত্রে জেলখানার প্রবেশ করিতেই পাগলা ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। কিন্তু উক্ত পাগলা ঘণ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য কারাকর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ীত না করিয়া উহার বিপরীত কার্য্য সম্পন্ন করেন। জেলারের পাশের রুমেই অস্ত্রাগার, জেলখানার বাহিরে এবং ছাদের উপরে বিডিআর সহ নিরাপত্তা কর্মীরা নিয়োজিত থাকিলেও তাহারা রহস্য জনকভাবে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হত্যাকারীদের এবং খুনীদের প্রতিরোধ না করিয়া বরং সরেজমিনে হত্যাকাণ্ডের সহযোগিতা করেন।
- তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের নিকট হইতে আর্মির নাম, ঠিকানা, আর্মির নম্বর ইত্যাদি তদন্তকালে জানিবার চেষ্টা করেন নাই।

www.pathagar.com

- ৬ নং সাক্ষী ইসমাইল হোসেনের সাক্ষ্য হতে দেখা যায় যে প্রদর্শনী -৮ এ অন্তত একজন সশস্ত্র আর্মি নায়েক এ, আলীর নাম পাওয়া যায়। আর্মির উক্ত সশস্ত্র ব্যক্তিকেও তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামীভূক্ত করেন নাই। কি কারণে আসামীভূক্ত করেন নাই উহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বাদী পক্ষের ৬৪ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা দিতে পারেন নাই। তাহার এইরূপ কার্য্যকলাপ সন্দেহজনকও রহস্যজনক।
- জেলখানার ৭ নং সাক্ষী ডেপুটি জেলর আবদুর রউফের সাক্ষ্যে ঘটনার রাত্রের জেলখানার বিস্তারিত বিবরণ প্রমাণ করে যে, বাদী পক্ষের ১-৪ নং সাক্ষী এবং জেল সুবেদার ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে আটক ৪ নেতাকে আর্মির সশস্ত্র ৫ ব্যক্তির দ্বারা হত্যা করিতে সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়াছেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সুবেদারকে সাক্ষী বা আসামী করেন নাই।
- এই সাক্ষী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে দ্বিতীয় দফায় ৪ আর্মির সশস্ত্র সদস্য নিহত ৪ নেতার রুমে প্রবেশ করিয়া বেয়নেট দিয়া ঘাই মারিয়া চলিয়া যান। হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে বাদী পক্ষের ১-৪ নং সাক্ষী এবং এই সাক্ষী নিজ হাতে হত্যাকাণ্ড না ঘটাইয়া রহস্যজনকভাবে উল্লেখিত ৫ আর্মির সশস্ত্র সদস্য দ্বারা কাহারো কালো হাতের ইশারায় হত্যাকাণ্ডটি ঘটাইতে সহযোগিতা করিয়াছেন। জেলখানা কারাবন্দীদের বা মানুষের Safe custody-র স্থান। যেখানে মানুষ নিশ্চিত থাকেন। সেখানকার কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মীরা মানুষকে রক্ষা না করিয়া হত্যা করিতে সাহায্য করিলে উহা জাতির জন্য মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। তদন্তকারী কর্মকর্তা এই বিষয়ে তদন্ত না করিয়া ঘটনাটির ভিন্ন দিকে মোড় নিতে ও প্রবাহিত করায় ঘটনার আসল খুনীদের চিহ্নিত করিতে তদন্তে মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।
- বাদী পক্ষের ১২নং সাক্ষীও একজন কারারক্ষী। তাহার সাক্ষ্য অনুযায়ী জেলখানার কর্তৃপক্ষ হত্যাকাণ্ডটি ৯ জন আর্মি সশস্ত্র সদস্য দ্বারা ঘটাইতে সহযোগিতা করিয়াছিল। জাতীয় চারনেতাকে রক্ষার বদলে পরোক্ষভাবে হত্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত বিষয়ে কোন তদন্ত করে নাই বলিয়া প্রমাণিত হয়। জেরায় তাহার সাক্ষ্য হইতে আরও দেখা যায় যে জেলখানার

www.pathagar.com

নিরাপত্তায় নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীরাও জঘন্যতম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাঁধা না দিয়া বা প্রতিরোধ না করিয়া চুপচাপ থাকেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে ইহা স্পষ্ট যে ঘটনার রাত্রে যাহারা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার জন্য জেলখানায় আসিয়াছিলেন তাহাদের কাহাকেও আদালতের ডকে উপস্থিত দেখিতে পান নাই। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রকৃত সকল খুনীদের ডকে উপস্থিত করিতে সক্ষম হয় নাই। এই ভাবে বাদী পক্ষের জেলখানার ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত সকল আসামীগণকে কাঠগড়ায় বিচারের জন্য আনা হয় নাই আর যাহাদেরকে আনিয়াছেন তাহাদের ব্যাপারেও সুষ্ঠ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই।

- বাদী পক্ষের প্রথম অভিযোগ সকল আসামী ভঙ্গভবনে বসিয়া খন্দকার মোশতাক ও মাহবুব আলম চাষীর সাথে মিলিয়া জেল হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র করেন। বঙ্গভবনের একজন এডিসি ও কয়েকজন নিম্নস্থ কর্মচারী এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করিতে কোর্টে আসে। ২১ নং সাক্ষী এডিসি কমোডোর গোলাম রাব্বানীর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনায় এসেছে। পূর্বেই তাহা আলোচিত হয়েছে। অন্যসব সাক্ষীদের বক্তব্য পৃথক পৃথক ভাবে আর আলোচনার দাবী রাখে না। পূর্বোক্তে কিছুটা করা হইয়াছে। একসঙ্গে বসিয়া, একই বিষয় আলাপ আলোচনান্তে সকলের সক্রীয় অংশ গ্রহণে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহীত হইয়া সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন একটি অপরাধ সংঘটিত হইলে উহাকে সেই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি এবং সক্রীয় অংশ গ্রহণ কারীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ব্যার্থ হয়। একজন আসামীর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ সাক্ষ্য মূলে দাঁড় করাতে সক্ষম হয় না।
- বঙ্গভবনের একজন সাক্ষীও আমাদের তিন সাবেক প্রতি-মন্ত্রী আসামীর নাম বলে না। যাহাদের কথা বলে আইনের বিচারে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়সায়া ও ব্যর্থ তদন্তে অভিযোগ বিচারের ধোপে টিকে না।
- পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ১১ নং সাক্ষী মোখলেসুর রহমান রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারীর সহকারী পিএ অন্যান্য অবান্তর

www.pathagar.com

বক্তব্যের পরে বলে ঘটনার দিন সন্ধ্যা রাতে সে আমাদের চার প্রতিমন্ত্রীকে এমএসপির কক্ষে অপেক্ষামান দেখে। এমএসপি ফোনে তদবির করিয়া আমাদেরকে রাষ্টপতির নিকট প্রেরণ করে। জজসাহেব মনে করেন আমাদের বিষয়ে তাহার সাক্ষ্য মিথ্যা বই সত্য নয়।

- বাদী পক্ষ বলে, ১১, ১৩, এবং ১৮ নং সাক্ষী একই তারিখে একই সঙ্গে বঙ্গভবনে ডিউটিতে থাকতেন তাহলে ১১ নং সাক্ষী মোখলেসুর রহমান একাই শুধু আমাদের দেখবেন কেন, ১৩ নং সাক্ষী খেদমতগার সাখাওয়াত হোসেন এবং ১৮ নং সাক্ষী মোঃ মানিক মিয়াও আমাদের দেখতে পেতেন। কিন্তু তারা আমাদের দেখার কথা বলে না। সেই বিচারেও ১১ নং সাক্ষীর বক্তব্য মিথ্যায় পর্যবসিত হয় যাহা তদন্তকারী তার বিচেনায় আনতে ব্যর্থ হয়।
- বাদী পক্ষের ১৭ এবং ৩৪ নং সাক্ষী যথাক্রমে বঙ্গভবনে টেলিফোন অপারেটর খান মোঃ অলক এবং রিসেপসনিষ্ট মোঃ ইয়াকুব হোসেন খান আমাদের তিন প্রতিমন্ত্রীর বিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। বিজ্ঞ জজ সাহেবের ধারনা আমরা সেই সময় বঙ্গভবনে গেলে বা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলে এই সাক্ষীদ্বয় জানিতে পারিত এবং কোর্টে আসিয়া সেইভাবে সাক্ষ্য দিত। বাস্তবে হয় তার উল্টা।
- ৬১ নং সাক্ষী মনির মিয়া আমাদের চার প্রতি মন্ত্রীর নাম জড়িত করিয়া জেলহত্যারকাণ্ডে তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র কিংবা অন্য কোন প্রকার অপরাধের সঙ্গে জড়িত করিয়া কোন প্রকার সাক্ষ্য দেয় নাই।
- বঙ্গভবনের আর এক রিসেপশনিষ্ট-কাম-পিএ বাদীপক্ষের ১৬ সাক্ষী আঃ কাইয়ুম চৌধুরী তাহার সাক্ষে আমাদের তিন রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম বলে না। তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং মাহবুব আলম চাষী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সব সময় থাকিতেন। বঙ্গভবনের অপর সাক্ষীরাও প্রায় একই কথা বলেন। তাহারা বঙ্গভবনে অবস্থানরত আর্মি অফিসারদের সাথে মিটিং করিতেন। এই সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে কোথাও বলেন নাই যে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ২-১১-৭৫ তারিখে কোন সময় বা ঐ রাত্রে বঙ্গভবনে উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন কিংবা মৃত খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষীর সাথে মোশতাকের কথাবার্তা ও বঙ্গভবনে উপস্থিত থাকার কথা বলে। বঙ্গভবনের সাক্ষী সমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পলাতক সেনা সদস্য সহ মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার এবং মেজর বজলুল হুদা আইনগতভাবে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত না থাকিলেও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যমতে তাহারা জেল হত্যাকাণ্ডে মূল হত্যাকারীদের প্ররোচনা ও সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহারা এবং তাহাদের সঙ্গীয় কতেক আর্মি অফিসার ও সেনা বঙ্গভবনে অবস্থান করিয়া ঐ রূপ বীজ বপন করত; ক্যাপ্টেন মোসলেম ও তাহার সঙ্গীয়দের দ্বারা উহা বাস্তবায়ীত করেন।

- অত্র মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট মন্ত্রী এবং নিহত মনসুর আলী সাহেবের ছেলে মোঃ নাসিম বাদী পক্ষের ১৪ নং সাক্ষী এবং একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। তাহার সাক্ষ্য সম্বন্ধে মাননীয় জজ সাহেব মন্তব্য করেন শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর যদি তার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা খুবই স্বাভাবিক এবং নেতার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা বোধ ও মমতা প্রকাশ পায়। তাহারা তাহার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করিয়াছেন। তাহার নিরাপত্তার প্রশ্নই তাদের নিকট বিবেচ ছিল। অন্যথা মনে করিলে পুত্র নাসিম তাদেরকে তার পিতার নিকট নিয়া যাইতেন না। তিনি তার পিতাকে আসামীদের কর্তৃক কোন প্রকার হুমকি বা চাপ সৃষ্টির অভিযোগ করেন না। তাহার সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে আদালতের নিকট ইহা প্রকাশ পায না যে উপরোক্ত ৩ জন আসামীর সাথে তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আচরণ সংঘটিত হইয়াছে। তাহার সাক্ষ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহার দ্বারা এই তিন নেতাকে এই মামলায় জড়িত করা যায়।
- অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আঃ সামাদ সাহেব, জনাব আশরাফ আলি, জনাব রাশেদ মোশাররফ, জনাব ফরিদ গাজী, জনাব মোসলেমউদ্দীন হাবু মিয়া, জনাব মাহবুব উদ্দীন প্রমুখ সাক্ষীর

www.pathagar.com

সাক্ষ্য এবং নিহতদের নিকটজনদের সাক্ষ্য প্রনিধান পূর্বক আদালতের সামনে আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে অত্র হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত কোন অপরাধ মূলক বক্তব্য তুলিয়া আনিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যর্থ হন। তাহারা একথা সেকথা বলিয়া 'ধান বানতে শিবের গীত গাহিয়া' তাহাদের বক্তবে ইতি টানেন। অত্র মামলায় মোশতাক-রশীদ গংয়ের বিরুদ্ধে ব্যতীত তাহাদের বক্তব্য অন্য কোন কাজে আসে না বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বাদী পক্ষের ৫২ নং সাক্ষী এবং নিহত সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকটজন সৈয়দ মাহবুব আল করিম শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর দাবীকৃত প্রতিটি বক্তব্যকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়া, ঘটনার সময় সাক্ষী নাসিমের ভারতে পালাইয়া থাকার কথা প্রকাশ করিয়া এবং ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের জোর প্রতিবাদ ও বিচার চাহিয়া এই তিনজন যে বিগত ৩০ বৎসর স্বোচ্চার ছিলেন তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাহারা যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার তাহা ব্যক্ত করিয়া বাদী পক্ষ্যের তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া দেন এবং এই তিন রাজনৈতিক ব্যক্তির মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা মুখ চুন করিয়া নীরবে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু করার সুযোগ থাকে না, কেননা সাক্ষী তাহার কর্তৃকই আনীত।

- বিজ্ঞ বিচারকের রায়ের ২৯০ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সাক্ষী ফরিদ গাজী কৃর্তৃক দাবীকৃত বিষয় যে সে, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ খন্দকার মোশতাকের নিকট মন্ত্রীদের পদত্যাগ পত্র দিতে গেলে তিনি বলেন যে তিনি আর রাষ্ট্রপতি নাই, বিজ্ঞ জজ সাহেব বলেন, ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সাক্ষী এবং তাহার সঙ্গীয় উপরোক্ত লোকগণ যখন রাষ্ট্রপতি মোশতাকের নিকট যান বিকাল ৩টার দিকে তখন এই দেশে কোন রাষ্ট্রপতি বা সরকার ছিল না। পাল্টা 'ক্যু'র বিদ্রোহী আর্মি অফিসার খালেদ মোশাররফ, সাফায়াত জামিল, মেজর ইকবাল, কর্নেল মালেক এবং তাহাদের অনুগত আর্মিরা দেশ পরিচালনার ভার বিচারপতি সায়েমকে অর্পন করেন।

www.pathagar.com

- এই সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ঐ দিন ঐ সময় জেনারেল ওসমানী, খালেদ মোশাররফ, জেনারেল খলিল, নেভীর চীফ এম, এইচ, খান, মাহবুব আলম চাষী, এয়ার চোর্স চীফ জনাব তোয়াব সিনিয়ার জুনিয়ার মন্ত্রীসহ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ কেবিনেট রুমে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় সাফায়াত জামিল, কর্নেল মালেক, মেজর ইকবাল সহ বহু আর্মির লোকজন অস্ত্রসহকারে উক্তরুমে প্রবেশ করেন এবং বলেন যে, "You are all mder arrest" তিন বাহিনী প্রধান, রাষ্ট্রপতিসহ সকল মন্ত্রীদের এবং অন্যান্য আর্মি ও রাজনৈতিক নেতাদের সামনে বাদী পক্ষের সাক্ষী সাফায়াত জামিল, কর্নেল মালেক এবং মেজর ইকবালের ঐরূপ ঔদ্ধত্বপূর্ন বক্তব্য দ্বারা ইহা প্রকাশ পায় যে পাল্টা 'ক্যু' এর মাধ্যমে তাহারা দেশের সব কিছুর নিয়ন্ত্রন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্রসহ জোর পূর্বক বিভিন্ন কাগজে তাহার দস্তখত আদায় করত: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্থলে খালেদ মোশাররফকে চীফ অফ ষ্টাফ করিয়াছিলেন। বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে জেলহত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের প্রধান এবং বিচারপতি সায়েমকে রাষ্টপতি হিসাবে নিয়োগ দান করেন। খালেদ মোশাররফ এবং তাহার অনুগামীদের ঐরূপ কার্য্য কলাপ মোশতাক সরকারের প্রশাসন যন্ত্রকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। ঐ দিন বঙ্গবভনে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে কে কাহাকে কি বলিয়াছিলেন বা করিয়ছিলেন তাহা দ্বারা কোন কিছু নিরূপন করা যায় না। তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ধরনের গুরুতর বিষকেও তদন্তের বিষয়ে আনয়ন করেন না।
- বাদী পক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত চার রাজনৈতিক নেতার অত্র মামলায় জড়িত থাকার ব্যাপারে বাদী পক্ষের ১১, ১৩, ১৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৬ ও ৩৮ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য পরস্পর বিরোধী বলিযা প্রকাশ পায়। কাজেই উপরোক্ত আসামী গণ উপরোল্লিখিত কারণে মামলার অভিযোগের দায হইতে অব্যাহতি পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে ও অব্যাহতি পাইতে পারে বলিয়া প্রমানিত হয়।
- তাহের ঠাকুরের তথাকথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদর্শনী-

www.pathagar.com

৩২ এ বর্ণিত ঘটনার দ্বারা ইহা প্রমানিত হয় না যে আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা, সহায়তা কিংবা যোগসাজশের সাথে কোন প্রকার জড়িত ছিলেন। তাহাদের কর্তৃক তথাকথিত ষড়যন্ত্রের বিষয়, জেলখানায় হত্যাকাণ্ডের বিষয়, সহযোগিতা ও যোগসাজশের বিষয় বাদী পক্ষের অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থিত ও প্রমানিত নহে। উক্ত কারণে এই তিন আসামী উহার বেনিফিট পাইতে পারে। নিহত চার জাতীয় নেতার ৫ জন আত্মীয় অত্র মামলায় সাক্ষ প্রদান করেন। তাহাদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় উপরোক্ত তিন আসামীর জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের, প্ররোচনার, সহযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ মিলে না। বাদীপক্ষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আবদুস সামাদ, রাশেদ মোশাররফ এবং মোঃ নাসিম উপরোক্ত আসামীগনের জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের ও সহযোগিতার ব্যাপারে কোনরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে তাহারা উক্ত ঘটনার সাথে কোন প্রকারে জড়িত ছিলেন। এই তিন আসামীকে গ্রেফতারের পরে ৪দিনের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাহাদের রিমান্ডের দরখাস্তে এমন কথা বলা ছিল না যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রদশর্নী ৩২ এর আদায়ের ৭৫০ দিন পর তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। তাহাদের নাম প্রদ-৩২ এ থাকিলে অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে গ্রেফতারী পরোয়ানায় তাহাদের নামও থাকিত। তদন্তকারী কর্মকর্তা এই বিষয়ের উপর কোনপ্রকার আমল না দিয়া উপরোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন যাহা আইন ও আদালতের নিকট তাহাদের জড়িত থাকার ব্যাপারে গভীর সন্দোহর উদ্রেক করে।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী এজাহারে উক্ত ৩ আসামীর নাম না থাকায় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতের সামনে না আসায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে সন্দেহ থাকিয়া যায়। বাদীপক্ষের ৫২ নং সাক্ষী সৈয়দ মাহবুব আল করিম স্পষ্ট বলিয়াছেন যে বাদী পক্ষ উপরোক্ত তিন আসামীকে প্রতিহিংসাবসত অত্র মামলায় জড়াইয়াছেন। বাদী পক্ষের ঐরূপ সাক্ষ্য উক্ত

www.pathagar.com

আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করে। ইহা ছাড়া বাদী পক্ষের অন্য কোন সাক্ষী ৩ জন আসামীর তথাকথিত ষড়যন্ত্রের প্ররোচনার সহায়তার ও সহযোগিতার বিষয় তাহাদের সাক্ষে বলেন নাই। সেই সময় জেল হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ উপরোক্ত আসামীগণ কর্তৃক পদত্যাগের বিষয়টি বাদী পক্ষের ২৯ নং সাক্ষী কর্নেল সাফায়াত জামিল এবং ৩০ নং সাক্ষী দেওয়ান ফরিদ গাজী তাহাদের সাক্ষ্যে স্বীকার করেন।

- বাদীপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী আসামীদের ষড়যন্ত্রের ঘাটি ছিল বঙ্গববন। কিন্তু সেটা একটা ইনষ্টিটিউশন যাহা শক্ত আইন ও নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেখানে বহু দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা যাহাদিগকে সাক্ষী আনেন তাহাদের মধ্যে একজন ব্যাতীত বাকীরা নিম্নস্থ কর্মচারী। বাদীপক্ষের বঙ্গভবনের উল্লেখিত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আদালতে প্রমানিত হইয়াছে যে উপরোল্লিখিত ৩ রাজনৈতিক আসামরি বিরুদ্ধে জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের প্ররোচনা, সহযোগিতা এবং যোগসজশের কল্পনা প্রসূত অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।
- ২-১১-৭৫ ইং তারিখে ভোর রাত্রে জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে মেজর খায়রুজ্জামন বঙ্গভবনে কোন প্রকার অপরাধ মূলক সহযোগিতা, সহায়তা, ষড়যন্ত্র কিংবা যোগসাজশের সাথে জড়িত ছিলেন না। ৩-১১-৭৫ ইং তারিখে বিদ্রোহী আর্মি অফিসার ও জোয়ানদের সাথে আর্মি হেড্ কোয়াটারের নির্দেশমতে এবং তৎকালীন সরকারের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী তাহাকেও বিদেশে এ্যমবেসীতে চাকুরী দিয়া প্রেরন করা হয়। তাহার দাখিলী কাগজপত্র এবং বাদীপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।
- বঙ্গভবনের সাক্ষীগণ আসামী তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে তথাকথিত মিটিং রুমে মিটিং করিতে দেখার অর্থ এই নয় যে আসামী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর জেলখানা হত্যাকাণ্ডের সহযোগিতা কিংবা তথাকহিত ষড়যন্ত্রের সাথে কিংবা যোগসাজশের সাথে জড়িত ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্ত্তা তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের জেলহত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের সাথে জড়িত থাকার

www.pathagar.com

ব্যাপারে স্পষ্ট এমন কোন সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন নাই যাহা দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। তাহের ঠাকুরের ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দ লইয়া বাদীপক্ষ প্রবল যুক্তিতর্ক দেখাইলেও তার পক্ষ হইতে বলা হয় চাপের মুখে এবং যখন তিনি মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না তখন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় জবানবন্দী নেওয়ার সময় তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদান্তকারী কর্মকর্তা সুকৌশলে এই জবানবন্দী হাছিল করেন যাহা তিনি পরবর্তীতে কোর্টে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর আইনের চোখে গ্রাহ্য হওয়ার দাবী রাখে না। ঠাকুর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষায় সময় এবং প্রত্যাহারের দরখাস্তে বলেন যে এই জবাবন্দী আদায়ের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। সম্মানিত আদালত বিষয়টি নিয়া দেশ বিদেশের সংশ্লিষ্ট আইন ঘাটিয়া তাহার রায়ে বিভিন্ন মামলার নজির উপস্থাপন পূর্বক এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে প্রদ: ৩২ কে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। ঠাকুরের তথাকথি স্বীকারোক্তিতে বলেন যে, "কোন সময়ই একসঙ্গে বসে এ ধরনের কোন শলাশরামর্শ করেন নাই। আমার সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছে।" পূর্বেই নিবেদন করা হইয়াছে এবং মাননীয় জজ সাহেব তাহার রায়ের ৩২৫ পৃষ্ঠায়ও বলেন, আসামীগণ সকলে একই উদ্দেশ্যে একত্রে বসিয়া জেল হত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই এবং সকল আসামীর ঐ মর্মে একই উদ্দেশ্য বাদী পক্ষের কোন সাক্ষী সমর্থন করিয়া আদালতে কোনরূপ সাক্ষী প্রদান করেন নাই। এই মর্মে আত্মপক্ষ সমর্থন কারী নজির এআইআর ১৯৩৬ (নাগপূর) পৃষ্ঠ-৯৭ ও ৯৯ এ মোঃ ইসমাইল বনাম এম্পরার বিখ্যাত একটি কেসের নিম্নরূপ সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দেন: - "Unity of will and purose among all the aecused mast he proved"

- আসামী তাহের উদ্দীনের ঠাকুরের জেল হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা ও সহায়তার আভাস পাইলেও রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়া এবং আইনের আলোকে উহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাই তিনিও সকল অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হকদার। ঠাকুরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করিয়া তাই তাহাকে ও আসামী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান

www.pathagar.com

ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকেও তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত করা যায় না বা শাস্তি প্রদান করা যায় না। যেহেতু উপরোক্ত আসামীগণের বিরুদ্ধে তথাকথিত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সংঘটন আইনগতভাবে এবং বাদী পক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হয় না সেহেতু তাহাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে সহায়তা, প্ররোচনা, সহযোগিতার ও যোগসাজশের বিষয়ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় না। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ হইতে তাহারা সম্মানে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার।

❑ আসামী লেঃ কর্নেল ফারুক রহমান, লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মেজর মোঃ বজলুল হুদা, মেজর মোঃ খায়রুজ্জামান মামলায় দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাদের কোশলীদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা চালান। বাদীপক্ষ কর্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একই ধরনের পরিলক্ষিত হয়। বাদীপক্ষ বলেন উপরেরাল্লিখিত আসামীগণ বঙ্গবন্ধু হত্যার তারিখ ১৫-৮-'৭৫ হইতে অন্যান্য আর্মি অফিসার সহ বঙ্গভবনে অবস্থান করত: জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে সহায়তায় সহযোগিতা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশের সাথে জড়িত থাকিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চারনেতার হত্যাকাণ্ড ঘটান। ইতিপূর্বে তাহাদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বাদীপক্ষের বক্তব্য আলোচিত হয়েছে এবং ইহা প্রমানিত হইয়াচে যে আসামী লেঃ কর্নেল ফারুক, লেঃ কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ এবং মেজর বজলুল হুদা ১৫-৮-'৭৫ হইতে বাদীপক্ষের ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২১ এবং ৩৪ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যে নিসন্দেহে বঙ্গভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। উপরোক্ত সাক্ষীগণ সেই সময় বঙ্গবভনে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। ফারুক, শাহরিয়ার এবং পলাতক রশীদ ও ডালিম সম্বন্ধে বাদী পক্ষ অভিযোগ করে তারা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বঙ্গভবন হইতে প্রায়ই আটককৃত নেতা কর্ম্মীদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতেন। বাদী পক্ষের ২ নং সাক্ষী জেলর বলেন ২-১১-৭৫ দিবাগত রাত্রে বঙ্গভবনে হইতে মেজর ফারুক টেলিফোনে কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতারা কে কোথায় আছেন জানতে চান। ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, উপরোক্ত আসামীগণ জেলহত্যাকাণ্ডের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে স্পষ্ট কোন কথাবার্ত্তা বা শলা পরামর্শ করেন নাই। তাহাদের উক্তরূপ আচরনের

www.pathagar.com

কারণে আদালত মনে করেন যে জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মূল হত্যাকারীদের সাথে তাহাদের একটি সম্পর্ক ছিল। তাহারা একদিকে জেল কতৃপক্ষকে সতর্কবানী শুনাইয়াছেন অন্যদিকে মূল হত্যাকারীদের সাথে হত্যাকাণ্ডে সহযোগী প্ররোচনা দিয়া যোগাযোগ এবং সম্পর্ক রাখিয়া হত্যাকাণ্ড ঘটাইতে সহাযতা করিয়াছেন। বাদী পক্ষের ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ নং সাক্ষীগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বঙ্গভবনে তাদের কার্য্যকলাপ এবং হত্যাকাণ্ডের মূল নায়কদের সঙ্গে তাদের আচরন বা যোগসাজশের নানা কথা বলেন। ফারুক, শাহরিয়ার ও বজলুল হুদার বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ ১২০ বি এবং ৩০২/১০৯ ধারায় অভিযোগ আনেন। আদালত বাদী পক্ষের সাক্ষী জবানবন্দী ও জেরা বিস্তারিত আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে আসেন তাহাদের বিরুদ্ধে ১২০ বি ধারায় অপরাধ প্রমানিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভবনের ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক বিজ্ঞ আদালত মনে করেন উপরোক্ত সাক্ষীদের পক্ষে ঘটনার আগে পরে বঙ্গভবনে যা যা ঘাটছে তা তাদের দেখা সম্ভব এবং তাদের বক্তব্য অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। বাদী পক্ষের ১৬ নং সাক্ষী বলেন যে মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার মেজর রশীদ এবং অন্যান্য আর্মি অফিসারদের কথায় তিনি জানতে পারেন যে আগের রাত্রে তাহরা জেলহত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে। ১৭ নং সাক্ষীও একই সুরে ফারুক, শাহরিয়ার এবং বজলুল হুদা সম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য দেন। ৩৪ নং সাক্ষী ফারুক, শাহরিয়ার, বজলুল হুদা সম্বন্ধে বলেন ২-১১-৭৫ তারিখ রাত্রি ১২টা বা ১২-৩০ মি: সময় জরুরী মিটিং করিয়াছিলেন।

- বঙ্গভবনে অবস্থানরত বাদী পক্ষের ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২১ ও ৩৪ নং সাক্ষী উপরোক্ত আর্মি অফিসারদের জেল হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত ও যোগসাজশের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য আনিয়া সাক্ষী প্রদান না করিলেও এবং উহা প্রমানিত না হইলেও তাহাদের সাক্ষ্যের পরিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় ইহা প্রকাশ পায় যে আসামী উপরোক্ত সেনা কর্মকর্তারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। দণ্ড বিধির ১২০ বি ধারার আইনগত দিক ইতিপূর্বের আলোচিত হইয়াছে। তাহার ভিত্তিতে তাহাদের বিরুদ্ধে জেলহত্যাকাণ্ডের তথাকথিত ষড়যন্ত্র এবং

www.pathagar.com

যোগসাজশ প্রমাণ হয় না। কিন্তু সমস্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং অত্র মামলার পরিপার্শ্বিকতা দ্বারা ইহা প্রমানিত হয় যে উপরে বর্ণিত আদালতে উপস্থিত তিন সেনা কর্মকর্তাসহ পলাতক সেনা কর্মকর্তা ও জোয়ানদের জ্ঞাতসারে, প্ররোচনায় ও অপরাধ সংঘটনের সহায়তায় জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রদর্শনী-৩২ এর গ্রহণ যোগ্যতা আদলতে আইনের বিচারে বিবেচনায় নেন নি। তার উক্ত জবানবন্দীতে বর্নিত ঘটনা ও আদালতে উপস্থিত ৩ সেনা কর্মকর্তাসহ পলাতক সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যদের জেল হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বাদী পক্ষ অন্যান্য যে সমস্ত সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন উহা দ্বারা উপরোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা বিশ্বাস করা যায়।

- ৪-১১-৭৫ তারিখে আইজি প্রিজন ও ডিআইজি প্রিজন সেনা সদরে গেলে সেনা কর্মকর্তারা তাহাদিগকে একটি এজাহার দায়ের করতে বলে। সর্ব বিবেচনায় যে সব সেনা সদস্যরা বঙ্গভবন হইতে টেলিফোনে ঘটনার রাত্রে ঘটনা ঘটাইতে নির্দেশের বার্ত্তা দেন, যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড সাধিত করেন এবং হত্যার পর পর যেসমস্ত সেনা কর্মকর্তা ও জোয়ানগণকে সরকার বিদেশে প্রেরণ করেন তাদের সকলকেই এজাহারে আসামী করা উচিৎ ছিল।
- প্রদর্শনী-১ হইতে প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অত্র মামলার বাদী জেলখানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পাল্টা 'ক্যু' কারী সেনা কমকর্তাগণ যেমন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল সাফায়াত জামিলসহ তাহাদের অনুসারীরা জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ধামাচাপ দেওয়ার জন্য কোনমতে এজাহারখানা দায়ের করাইয়াছিলেন। জেল হত্যাকাণ্ডটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হইলেও ইহার সাথে জড়িত ছিলেন তৎকালীন সেনা সদস্যরা। এজাহারে যাহাই থাকুক না কেন উহা আদালতের নিকট Substantive evidence নহে। বাদীপক্ষের সাক্ষী আদালতের নিকট Substantive evidence বলিয়া পরিগণিত হয়।
- বাদীপক্ষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী কর্নেল সাফায়াত (সাক্ষী নং ২৯) প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করত বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রমানিত হয় যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ জেলখানার

www.pathagar.com

চারনেতার হত্যায় মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এবং উপরে বর্ণিত সেনা কর্মকর্তা ও জোয়ানগণ তাহার সহযোগী ছিলেন। তাহার সাক্ষ্য অন্যান্য সাক্ষীদের সাথে তুলনা করিলে দেখা যায় যে মেজর মোঃ খায়রুজ্জামান , তাহের উদ্দীন ঠাকুর, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম, ওবায়দুর রহমান এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্ররোচনা, সহায়তা, সহযোগিতা, ষড়যন্ত্র, যোগসাজশে এবং হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন প্রকারে জড়িত ছিলেন না। বাদীপক্ষের অন্যান্য সাক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচল করিলেও একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়।

- মেজর ফারুক রহমান, মেজর শাহ্‌রিয়ার, মেজর রশীদ ও মেজর বজলুশ হুদা সম্পর্কে আলোচনা ক্রমে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে জেল হত্যাকাণ্ডের আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জেল হত্যাকাণ্ডের অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ আইনগতভাবে প্রমানিত না হইলেও বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য এবং অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতায় প্রকাশ পায় যে জেল হত্যাকাণ্ড তাহাদের জ্ঞাতসারে, প্ররোচনায়, সহায়তায় ও সহযোগিতায় সংঘটিত হয় এবং উহাতে তাহাদের সম্পৃক্ততা প্রকাশ পায়।
- অত্র মামলার পলাতক আসামী রিসালাদার মোসলেমউদ্দীন ওরফে মোসলেমউদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে মোসলেম উদ্দীন খান, লেঃ কর্নেল আবদুর রশীদ, লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, লেঃ কর্নেল এ, এইচ, এম, বি নূর চৌধুরী, মেজর এ, কে, এম মহিউদ্দীন আহমেদ, লেঃ কর্নেল এ, এম রাশেদ চৌধুরী, মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেন ওরফে শরিফুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, ক্যপ্টেন মোঃ কিসমত হাসেম, ক্যাপ্টেন নজমুল হোসেন আনসার, দফাদার সারফত আলী শাহ্, এল, ডি দফাদার হাশেম মৃধা গংদের সকলের নাম এজাহারে না থাকিলেও আসামী মোসলেমের নাম উহার অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। এইরূপ কাহিনী এজাহারে না থাকিবার স্বপক্ষে বাদীপক্ষ বলেন যে তাহারা এজাহার দায়েরের সময় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় ঐ রূপ এজাহার করিয়াছেন। আত্মপক্ষ সমর্থকারীদের কৌশুলীগণ এজাহার বহির্ভূত কাহিনী আদালতের সামনে উপস্থাপন করিবার

www.pathagar.com

কারণে নিজেদের নির্দোষ দাবী করিয়া এই ধরনের বিভিন্ন মামলার নজির দাখিল করেন। তাহারা ৪৫ ডিএলআর পৃষ্ঠা ১৪২ এর উদ্ধৃতি দেন, "Where FIR does not contain an important statement deposed by the witnesses, it is clear that there has been subsequent embellishment of the prosecution case which makes it untrustworthy." এখানে উল্লেখ্য যে বাদী উপরোক্ত এজাহার বর্হিভূত ঘটনার কথা তাহার সাক্ষ্যে আদালতের সামনে স্বীকার করেন এবং এজাহারেও উপরোক্তরূপ ঘটনার বর্ণনাক্রমে তিনি এজাহার করেন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (রায় পৃ: ৩৪৩) এজাহারের এই পরিনতির বিষয় এবং তার জন্য দায়ী তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের পূর্বক বিচার চাওয়া হয়।

- এজাহারের ত্রুটি জনিত কারণে জাতীয় চারনেতার জেলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না এটা কারো কাম্য নয়। তাই জেলখানার সমস্ত সংশ্লিষ্ট সাক্ষী, বঙ্গভবনের সাক্ষী এবং আনুসাঙ্গিক ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যের সুবাদে আদালত মকদ্দমায় সিদ্ধান্তে আসেন এবং তার রায় প্রদান করেন। বাদী পক্ষের ১৩ নং সাক্ষী, ১৬ নং সাক্ষী ১৭ নং সাক্ষী এবং ১৮ নং সাক্ষী, ৩৪ নং সাক্ষী অনেক তথ্য প্রদান করেন। তাহারা নিজ চোখে বঙ্গভবনের উপরোল্লিখিত সেনা সদস্যগণের কার্য্য কলাপ আচার আচরন, চালচলন, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা শোনেন এবং দেখেন। আত্মপক্ষ সমর্থনকারী আসামীগণ হইা বলিতে পারেন নাই যে উক্ত সাক্ষীগণ ঐ সময়ে বঙ্গভবনে ছিলেন না বা তাহারা ঐসব দেখেন নাই বা শোনেন নাই।
- বাদী পক্ষের ১৬, ১৭ এবং ৩৪ নং সাক্ষী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকারের অধীনে বঙ্গভবনে পালা ক্রমে ডিউটি করিবার কারণে বঙ্গভবনে অবস্থানরত উপরোল্লিখিত সেনা সদস্যদের ঘটনার তারিখ ও রাত্রে বঙ্গভবনে যা যা দেখিয়াছেন উহাই আদালতের সামনে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাহারা একে অপরের সাক্ষ্য সমর্থন ক্রমে ইহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে উপরোল্লিখিত আর্মি সদস্যগণের জেল হত্যাকাণ্ডের পূর্বে একে অপরের সাথে এবং জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগক্রমে জেল হত্যাকাণ্ডটি ঘটাইতে

www.pathagar.com

প্ররোচনা, সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়াছেন। ২১ নং সাক্ষী রাষ্ট্রপতির অন্যতম এডিসি কমোডোর গোলাম রব্বানী সাক্ষ্য দেন ঘটনার রাত্র ২টার দিকে রাষ্ট্রপতি তাহাকে তাহার রুমে ডাকিয়া পাঠান ঐ সময়ে তিনি রিসালদার মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মৃধা এবং তাহাদের আরও কয়েকজন সাথীকে খুব তৎপর দেখেন। তিনি উপরোল্লেখিত সেনাসদস্যসহ মোসলেম উদ্দীন, মারফত আলী শাহ্ এবং মৃধাসহ আরও কয়েজনকে বঙ্গভবন হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখেন। তিনি ঘটনার রাতে ভোর ৬টার দিকে উল্লেখিত অফিসারগণকে বঙ্গভবনে ফেরৎ আসিতে দেখেন। এই সাক্ষীর উপরোক্ত সাক্ষী দ্বারা ইহা প্রমানিত হয় যে উপরোল্লেখিত সেনা সদস্যগণ বঙ্গভবনে অবস্থান করত: একে অপরের সাথে সহযোগিতা, যোগাযোগ ও যোগসাজশক্রমে আসামী মোসলেমউদ্দীন, দফাদার মারফত আলী শাহ এবং আবুল হাসেম মৃধাকে প্ররোচনা ও ময়ায়তা করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ড ঘটাইতে সহযোগিতা করিয়াছেন। আরও প্রনিধান যোগ্য, ঘটনার পরদিনই তাহাদের সকলকে বিদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। একই ভাবে বঙ্গভবনের ৮ জন সাক্ষী আদালতে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গর মধ্যে বাদীপক্ষের ১০, ১৪, ১৫, ১৯, ২০ এবং ২৮ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে উপরোল্লেখিত সেনা সদস্যগণের প্ররোচনায়, সহায়তায়, সহযোগিতার ও যোগসাজশে ২-১১-৭৫ ইং তারিখের দিবাগত রাত্রে জেল হত্যাকাণ্ডে সংঘটিত হয়। উপরোল্লেখিত সেনা সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তাহার সঙ্গীয় সশস্ত্র সেনা সদস্যদেরকে প্ররোচনা দিয়া দুষ্কর্মের সহায়তা ও সংঘটনে সহযোগিতা কল্পে ২-১১-৭৫ ইং তারিখে বঙ্গভবন হইতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরন করত: জেল হত্যাকাণ্ড ঘটাইতে সহযোগিতা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা, অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা এবং অবস্থাধীনে হইা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় (ইহা স্বীকৃত) যে, রিসালদার মোসলেমউদ্দীন ওরফে হিরণখান ওরফে মোসলেম উদ্দীন খান, লেঃ কর্নেল আবদুর রশীদ, লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, লেঃ কর্নেল এম, এইচ, এম বি নূর চৌধুরী, মেজর এ, কে, এম মহিউদ্দীন আহমেদ, লেঃ কর্নেল

www.pathagar.com

এম, এ রাশেদ চৌধুরী, মেজর আহমদ শরফুল হোসেন ওরফে শরফুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আঃ মাজেদ, ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাসেম, ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, দফদার মারফত আলী শাহ্ এবং এল, ডি, (দফাদার) মোঃ আবুল হাসেম মৃধা জেল হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হইবার পর হইতেই দীর্ঘকাল যাবৎ পলাতক আছেন। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ পিপি জনাব আবদুল্লাহ মাহমুদ হাসান এবং অতিরিক্ত পিপি জনাব গোলাম মোস্তফা দেশ বিদেশের বিভিন্ন মামলার নজির সমূহ উদ্ধৃতি দিয়া যুক্তি দেখান যে দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের পলাতক থাকার বিষয়টি মূলত: অত্র মামলার বর্ণিত জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে তাহাদের সম্পৃক্ত ও জড়িত থাকিবার বিষয়টিকে সমর্থন দেয়। উল্লেখিত নজির সমূহের উপর নির্ভর করিয়া অত্র আদালত একমত পোষণ করেন যে, জেল হত্যাকাণ্ডের পর হইতে উপরোল্লেখিত আসামীগণ দীর্ঘকাল পলাতক থাকায় এবং তাহারা নিজেদেরকে কোন সময় বিচারের নিমিত্তে আদালতে সোপর্দ্দ না করায় উহা এই মামালায় হত্যাকাণ্ডের সাথে তাহাদের সম্পৃক্ত ও জড়িত থাকিবার বিষয়ে মামলাকে সমর্থন করে। তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ আইনের আলোকে প্রমাণিত না হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ অত্র মামালায় সাক্ষ্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সন্দেহতীত ভাবে প্রমানিত হয়। কাজেই উক্ত ধারায় তাহারা শাস্তি পাইতে পারে।

- মাননীয় আদালত তার ২০ সে অক্টোবর ২০০৪ সালের রায়ের শেষ ভাগে সিদ্ধান্ত দেন জাতীয় ৪ নেতাকে ১ নং কক্ষে একত্রিত করার ব্যাপারে বাদীপক্ষের ২নং সাক্ষী তদানীন্ত জেলর আমিনুর রহমান ও সুবেদার ঐরূপ নৃশংস হতাকাণ্ড ঘটাইতে সরাসরি সহযোগিতা করেন। বাদী পক্ষের ১নং ও ৩নং সাক্ষী যথাক্রমে জেলখানার ডিআইজি এবং আইজি একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের ঐ নির্মম কার্য্যকলাপ নির্ভিক ও অবনমিত চোখে পর্যাবেক্ষন করিলেও উহার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করেন নাই। তাহারা ঘটনার সময় কোনরূপ প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না করিয়া বরং জেলখানায় পাগলা ঘণ্টা বাজাইয়া জাতীয় চার নেতাকে রক্ষার পরিবর্ত্তে খুনীদের দ্বারা নিহতদের পৈশাচিক এবং নৃশংসভাবে হত্যা করিতে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাদের ঐরূপ অপকর্মের

www.pathagar.com

কথা জানিয়া শুনিয়া ১,৯, ১২, ২৩, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৮ ও ৬০ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য মোতাবেক এই সমস্ত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অত্র মামলার আসামীদের সঙ্গে তদন্তক্রমে বিচারার্থে আদালতের সামনে সোপর্দ না করিয়া রহস্যজনকভাবে জেল হত্যাকাণ্ডের কঠিন দায় হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

- রাষ্টপতির কোন আদেশ, নির্দেশ বা বার্ত্তা প্রশ্নের সম্মুখীন হইলে বা বেআইনী বা বিতর্কিত হইলে উহা কর্তৃপক্ষ The prisoneos Act 1900 অর্থাৎ Act no III of 1900 অনুযায়ী মান্য করিতে বাধ্য নহেন। অত্র মামলার দেখা যায় যে ১ হইতে ৩নং সাক্ষী উপরোক্ত আইনভঙ্গ করিয়া উপরোল্লেখিত ক্যাপ্টেন মোসলেম এবং তাহার সঙ্গীয় ৪ সশস্ত্র সেনা সদস্যকে রাষ্ট্রপতির বে-আইনী অলিখিত আদেশ ও নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘটনার তারিখ ও সময়ে প্রবেশ করিতে দিয়া জাতীয় চার নেতাকে নৃশংস ও পৈশাচিকভাবে হত্যা করিতে সাহায্য, সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়া অপরাধ করিয়াছেন। ৩ নং সাক্ষী রাষ্ট্রপতির উদ্ধৃতি দিয়া যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন উহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, গভীর দুঃখজনক ও নির্মম। জেলখানার কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঐ সময় দুই দফায় নেতাদের গুলি করিয়া হত্যা করা এবং বেয়নেট চার্জ করিয়া তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত করনে হতাকারীদের সরাসরি সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছেন।
- ২৬ নং সাক্ষী কমোডোর গোলাম রাব্বানীর সাক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাদী পক্ষের ১৩ নং সাক্ষী মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ঘটনার রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকায় একটি আর্মি জীপে করিয়া ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দীন, সাদা পোষাকধারী একটি লোক, দফাদার মারফত আলী, এলডি আবুল হাসেম মৃধা ২/৩ জন নিম্ন র‍্যাঙ্কের আর্মি সশস্ত্র অবস্থায় বঙ্গভবনের বাহিরে চলিয়া যায়। এই সাক্ষী খুনীদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দীন, দফাদার মারফত আলী ও আবুল হাশেম মৃধাকে চিহ্নিত করিতে সন্দেহাতীত ভাবে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তদন্তকারী অফিসার ক্যাপ্টেন মোসলেম উদ্দীনের সাথে আরও ২/৩ জন অজ্ঞাত সঙ্গীয় লোকজনদের ব্যাপারে কোনরূপ তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। তিনি যদি যথাযথ ভাবে আইনের আলোকে আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলবান্তে সুষ্ঠ তদন্ত করিতেন তাহা হইলে সকল খুনীদের পরিচয় পাওয়া যাইত এবং আদালত ঐ সমস্ত খুনীদের চরম ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তাহার মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের কারণে জেল হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত সকল খুনীদের অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যায় না। ১৭ নং সাক্ষী মানিক মিয়াও সাক্ষী সাখাওয়াত হোসেনের বক্তব্য সমর্থন করে। ১৮ নং সাক্ষীও তাদের বক্তব্যকে সমর্থন জানায়। বঙ্গভবনে অবস্তানরত সেনা সদস্যদের প্ররোচনা, সহায়তা এবং সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন মোসলেম, মারফত আলী শাহ এবং আবুল হাসেম মৃধা সহ আরও কতক সেনা সদস্য ক্যাপ্টেন মোসলেমের নেতৃত্বে জেলখানায় ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করিয়া দেশ ও জাতির কলঙ্কের অধ্যায় সৃষ্টি করে। ১৩, ১৮, ২১ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ হয় যে মোসলেম, মারফত এবং আবুল হাসেম ক্ষমার অযোগ্য ও গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। তাহারা ইতিহাসের জঘন্য অপরাধে অপরাধী। তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৩০২/৩৪ ধারার অভিযোগ ও অপরাধ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দোহাতীত ভাবে প্রমানিত হইয়াছে।

মাননীয় আদালত আওয়ামী লীগ দলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেন (রায় পৃ: ৩৬৯) আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত অপরাধী ও খুনীদের জড়িত থাকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তাহারা কোনও আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র এবং জেল হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা, সহায়তা ও সহযোগিতার সুস্পষ্ট কোন প্রকার সাক্ষ্যও প্রদান করেন নাই। আদালতের নিকট তাহাদের সাক্ষ্য দায়সারা গোছের বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞ আদালতের মতে :

অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবদুল কাহার আখন্দ তদন্তকার্য্য পরিচালনায় গুরুতর ও মারাত্মক ত্রুটি সংঘটনে পুলিশ বিভাগের সদস্যদের পেশায় কালিমা লেপন করিয়াছেন।

তৎকালীন জেলকর্তৃপক্ষ গুরুরত আইনভঙ্গকারী এবং এযাবৎকালের জঘন্যতম অপরাধে সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত হয়। জেল হত্যাকাণ্ডটি জাতীয় ইতিহাসে একটি কলঙ্কের অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকিবে।

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী দালিলিক সাক্ষ্য এবং অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে সর্ব আসামী (১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, এ,সি (বরখাস্ত), (২) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, ই,বি (অব্যাহতি) (৩) মেজর মোঃ খায়রুজ্জামান , এ, সি (অব), (৪) তাহেরউদ্দীন ঠাকুর (প্রাক্তন তথ্য মন্ত্রী), (৫) শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, (৬) কে, এম, ওবায়দুর রহমান এম, পি, (৭) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, (৮) মেজর মোঃ বজলুল হুদা, আটিলারী (অব্যাহতি), (৯) রিসালদার মোসলেমউদ্দীন ওরফে মুসলেম উদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরন খান ওরফে মুসলেম উদ্দীন খান (পালাতক) (১০) লেঃ কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ আটিলারী (বরখাস্ত) (পলাতক) (১১) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, আটিলারী (অব্যাহতি) (পলাতক) (১২) লেঃ কর্নেল এস, এইচ, এম, বি নূর চৌধুরী ই,বি (অবঃ) (পলাতক) (১৩) মেজর এ, কে, এম মহিউদ্দীন আহমদ এ,সি (অব) (পলাতক) (১৪) লেঃ কর্নেল এ, এম রাশেদ চৌধুরী ই, বি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৫) মেজর আহম্মদ শরিফুল হোসেন ওরফে শরিফুল ইসলাম এ,সি (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৬) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ অর্ডিন্যান্স, (অব) (পলাতক) (১৭) ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হোসেন এ, সি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৯) দফাদার মারফত আলী শাহ্ (বরখাস্ত) (পলাতক) (২০) দফাদার মোঃ আবুল হাশেম মৃধা (বরখাস্ত) (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাহাদের উক্ত ধারার অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাস দেওয়া যাইতে পারে।

রাষ্টপক্ষ তাহাদের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা এবং মামলার পারিপাশ্বিকতা হইতে সর্ব আসামী। ১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, এ,সি (বরখাস্ত) ২) লেঃ কর্নেল সুলতান সাহরিয়ার রশীদ ই, বি (অব্যাহতি) ৩) মেজর মোঃ বজলুল হুদা, আর্টিলারী (অব্যাহতি) ৪) রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন ওরফে মুসলেম উদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে মুসলেম উদ্দীন খান (পলাতক) ৫) লেঃ কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ, আর্টিলারী (বরখাস্ত) (পলাতক) ৬) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, আর্টিলারী, (অব্যাহতি) (পলাতক) ৭) লেঃ

www.pathagar.com

কর্নেল এস, এইচ, এম, বি, নূর চৌধুরী ই, বি, (অবঃ) (পলাতক) ৮) মেজর এ,কে, এম মহিউদ্দীন আহম্মদ এ, সি (অব) (পলাতক) ৯) লেঃ কর্নেল এম, এ, রাশেদ চৌধুরী ই, বি, (অব্যাহতি) (পলাতক) ১০) মেজর আহমদ শরিফুল হোসেন ওরফে শরিফুল ইসলাম এ,সি, (অব্যাহতি) (পলাতক) ১১) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, অর্ডিন্যান্স (অবঃ) (পলাতক) ১২) ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হোসেন এ, সি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৩) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার এ,সি (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৪) দফাদার সারফত আলী শাহ (বরখাস্ত) (পলাতক) (১৫) এল, ডি, (দফাদার) মোঃ আবুল হাশেম মৃধা (বরখাস্ত) (পলাতক)-এর বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হওয়ায় উক্ত ধারায় তাহারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তবে অত্র মামলার পারিপার্শ্বিকতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় তাহাদেরকে উক্ত ধারায় বর্ণিত সর্ব্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ জরিমানার আদেশ প্রদান সমীচীন হইবে বলিয়া আদালত মনে করেন।

সর্ব আসামী ১) মেজর মোঃ খায়েরুজ্জামান, ২) তাহের উদ্দীন ঠাকুর, ৩) শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৪) কে, এম ওবায়দুর রহমান এবং ৫) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এর বিরুদ্ধে আনীত দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের দণ্ড বিধির ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাসের আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপক্ষ তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সর্ব আসামী ১) রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন ওরফে মুসলেমউদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে মুসলেম উদ্দীন খান (পলাতক) ২) দফাদার মারফত আলী শাহ্ (পলাতক) এবং ৩) এল, ডি, দফাদার মোঃ আবুল হাসেম মৃধা (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হওযায় তাহারা উক্ত ধারার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। উপরোক্ত তিন আসামী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তা হেফাজতে আটক জাতীয় চার নেতাকে নৃশংস, পৈশাচিক, ও বর্বরোচিতভবে গুলি করিয়া হত্যা করত: ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করায় তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত ধারায় বর্ণিত সর্ব্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দণ্ড সহ জরিমানার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

www.pathagar.com

অতএব,

আদেশ হইল যে, সর্ব আসামী (১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, এ,সি (বরখাস্ত) ২) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, ই, বি, (অব্যাহতি) ৩) মেজর মোঃ খায়রুজ্জামান, এ, সি, (অবঃ) (৪) তাহের উদ্দীন ঠাকুর (প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী) (৫) শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, (৬) কে, এম ওবায়দুর রহমান এম,পি (৭) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (৮) মেজর মোঃ বজলুল হুদা আর্টিলারী (অব্যাহতি) (৯) রিসালদার মোসলেমউদ্দীন ওরফে মুসলেম উদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে মোসলেমউদ্দীন খান (পলাতক), (১০) লেঃ কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ, আর্টিলারী (বরখাস্ত) (১১) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, আর্টিলারী (অব্যাহতি) (পলাতক) (১২) লেঃ কর্নেল এস, এইচ, এম, বি নূর চৌধুরী ই,বি (অবঃ) (পলাতক) (১৩) মেজর এ, কে, এম মহিউদ্দীন আহমদ, এ, সি (অব) (পলাতক), (১৪) লেঃ কর্নেল এম, রাশেদ চৌধুরী, ই, বি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৫) মেজর আহম্মদ শারফুল হোসেন ওরফে শারফুল ইসলাম, এ, সি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৬) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, অর্ডিন্যান্স (অবঃ) (পলাতক), (১৭) ক্যাপ্টেন মোঃ কেসমত হাসেম, এ, সি (অব্যাহতি) (পলাতক), (১৮) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, এ, সি, (অব্যাহতি) (পলাতক) (১৯) দফাদার মারফত আলী শাহ (বরখাস্ত) (পলাতক), (২০) দফাদার মোঃ আবুল হাশেম মৃধা (বরখাস্ত) (পলাতক)-কে দণ্ড বিধি ১৮৬০ সালের ১২০ বি ধারায় অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ গণ্যে তাহাদের প্রত্যেককে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল।

সর্ব আসামী ১) মেজর মোঃ খায়রুজ্জামান, এ, সি, (অবঃ), ২) কে, এম ওবাযদূর রহমান, ৩) শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৪) নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং ৫) তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের ৩০২/১০৯ ধারার অভিযোগ হইতে সম্পূর্ন নির্দোষ গণ্যে তাহাদের প্রত্যেককে বেকসুর খালাস দেওয়া হইল।

সর্ব আসামী ১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, এ,সি, (বরখাস্ত) ২) লেঃ কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, ই,বি, (অব্যাহতি) ৩) মেজর মোঃ বজলুল হুদা আর্টিলারী (অব্যাহতি), ৪) রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন ওরফে মুসলেম উদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে

www.pathagar.com

মুসলেম উদ্দীন খান (পলাতক), ৫) লেঃ কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ, আর্টিলারী (বরখাস্ত) (পলাতক), ৬) লেঃ কর্নেল শরিফুল হক ডালিম। আর্টিলারী (অব্যাহতি) (পলাতক) ৭) লেঃ কর্নেল এস, এইচ, এম, বি, নূর চৌধুররী ই,বি, (অবঃ) (পলাতক), ৮) মেজর এ, কে, এম মহিউদ্দীন আহমদ এ,সি (অব) (পলাতক), ৯) লেঃ কর্নেল এ, এম রাশেদ চৌধুরী ই, বি (অব্যাহতি) (পলাতক) ১০) মেজর আহম্মদ শারফুল হোসেন ওরফে শারফুল ইসলাম এ, সি, (অব্যাহতি) (পলাতক), ১১) ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ অর্ডিন্যান্স (অবঃ) (পলাতক), ১২) ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হোসেন, এ, সি, (অব্যহতি) (পলাতক) ১৩) ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, এ,সি, (অব্যাহতি) (পলাতক), ১৪) দফাদার মারফত আলী শাহ (বরখাস্ত) (পলাতক) এবং ১৫) এল, ডি, (দফাদার) মোঃ আবুল হাশেম মৃধা (বরখাস্ত) (পলাতক)-কে দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের ৩০২/১০৯ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তে তাহাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

সর্ব আসামী ১) রিসালাদার মোসলেম উদ্দীন ওরফে মুসলেম উদ্দীন (অবঃ) ওরফে হিরণ খান ওরফে মুসলেমউদ্দীন খান (পলাতক), ২) দফাদার মারফত আলী শাহ (পলাতক) এবং ৩) এল, ডি, (দফাদার) মোঃ আবুল হাসেম মৃধা (পলাতক) কে দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের ৩০২/৩৪ ধারায় অপরাধ দোষী সাব্যস্তে তাহাদের প্রত্যেককে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত এবং তাহাদের প্রত্যেককে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা করা হইল।

সম্মানিত বিচারকের বিজ্ঞ রায় কৃতজ্ঞ চিত্তে শিরোধার্য্য করেও হৃদয়াভ্যন্তরে প্রশ্ন জাগে, এই বিচার অবসানে কী পেলাম বা কী প্রত্যাশা ছিল? বিশ্বব্যাপী নিন্দিত, বহুল আলোচিত এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বিলম্বিত জেল হত্যা মামলার বিচারে বাস্তবে কী প্রাপ্তি ঘটল?

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার আমরা তিন তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রিসহ পাচ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

পনেরজন অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়।

www.pathagar.com

ক্ষেত্র বিশেষে কেউ কেউ হয়ত তৎকালীন পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার শিকার।

তিন অভিযুক্তকে জরিমানাসহ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। নয়জন ঘাতকের মধ্যে মাত্র একজনই অভিযুক্ত এবং তার ফাঁসির আদেশ হয়। বাকী আটজন ঘাতককে অজ্ঞাত কারণে অভিযুক্ত করা হয় নাই।

দুঃখ এই,

সকল প্রকৃত ঘাতকদেরকে বিচারে সোপর্দ করা হল না। এত বড় নিষ্ঠুরতম ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের যথাযথ বিচার হল না বলে খেদ্ রয়ে গেল;

ঘাতকদের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা কারী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের তৎকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অজ্ঞাত কারণে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করানো হল না;

আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতে গিয়ে প্রতারনা ও জালিয়াতিসহ অসংখ্য অপকর্মের নায়ক এবং পুলিশ বিভাগের সদস্যদের পেশায় কালিমা লেপনকারী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যাবস্থা গৃহীত হল না

এবং

দোষদৃষ্টিপরায়ন ক্ষমতাসীনরা সম্পূর্ন নিরপরাধীদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই মামলায় সম্পৃক্ত করে সরকারী ক্ষমতার যে নগ্ন অপব্যাবহার করেছে এবং আমাদের মত নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে চার বৎসর হাজতবাসসহ মোট ছয় বৎসর বিনা দোষে চরম ভোগান্তি করিয়েছে তার প্রতিকারার্থে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হল না। ক্ষমতার অন্ধ দাপটে ভবিষ্যতে এ ধরনের হীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দৃষ্টান্তমূলক ও বিধিবদ্ধ রক্ষাকবচ তৈরী হল না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

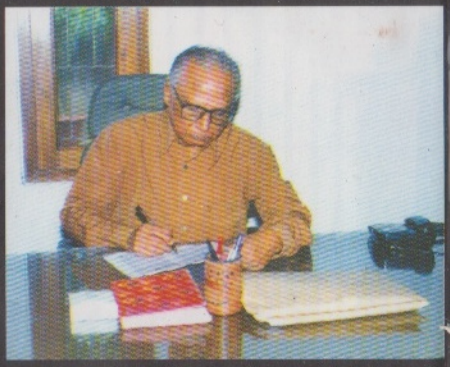

১৯৭২ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চিফ হুইফ নির্বাচিত হন। পরের বছর পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দেশের চিফ হুইফ হন। ১৯৭৫ সালে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন।

দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালে তিনি ডেমোক্রটিক লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি অন্যতম সংগঠকরূপে জনদল গঠন করেন এবং ১৯৮৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠন করে দলের ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য এবং সেই বছরই তিনি জাতীয় পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে ১৯৮৮ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে রংপুরের পীরগঞ্জের উপ-নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের বহু জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত। স্কুল-কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন। ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। তিনি বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের একজন আইনজীবী, সুদক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। সুসাহিত্যিক ও কবি সালেহা হোসেন তাঁর স্ত্রী।

www.pathagar.com

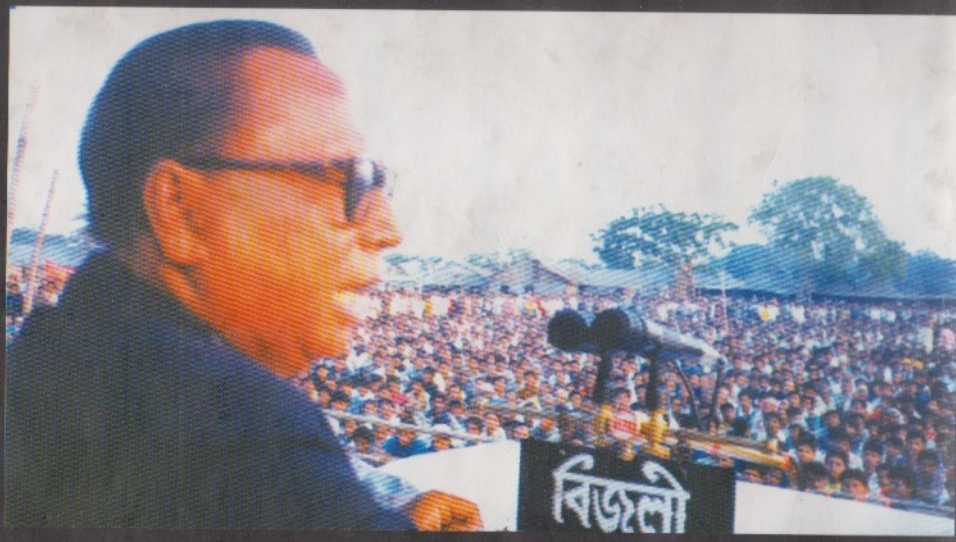

ISBN 984 8685 77-4
9 789848 685778